মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা

অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ: এক



সেলিম রেজা নিউটন

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য

এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়নতা প্রসঙ্গে

মানুষ নেটওয়ার্ক

একটা কথা বলে রাখি। সেটা সত্যি কথা। সেটা হচ্ছে যে নিউটন খুব পড়াশোনা করা মানুষ।
প্রচুর পড়াশোনা করা মানুষ। নানান বিষয় নিয়ে। সেটার প্রমাণ আমরা সর্বত্রই পাই।
বিশেষ করে এই লেখার ক্ষেত্রে তিনি যে পরিশ্রম এবং পড়াশোনা করেছেন সেটা কিন্তু অকল্পনীয়।
হাসান আজিজুল হক, কথাসাহিত্যিক ও বঙ্গবন্ধু প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

কবি-গবেষক-দার্শনিক-পণ্ডিত প্রফেসর সেলিম রেজা নিউটন আমাকে নাড়া দিয়েছেন– প্রচণ্ডভাবে।
এবং তাঁর যেটা বৈশিষ্ট্য: উস্কে দেওয়া, সব কিছু একটু খোঁচা মেরে একটু ভিন্নভাবে দেখা।
এই সমাজের মানুষের ভেতরের যে একটা আগুন আছে ...তাকে জাগাবার জন্যে,
খোঁচা দেবার জন্য, মাঝে মাঝে এরকম নিউটনের মতো লোকদের দরকার আছে সবারই।
কবি আসাদ মান্নান, বিভাগীয় কমিশনার, রাজশাহী

এই বইটি অত্যন্ত ইউজফুল, ইন্টারেস্টিং এবং চিন্তা-উদ্দীপক। এখানে দর্শন আছে,
ইতিহাস আছে, ভূগোল আছে, সমাজবিজ্ঞান আছে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান আছে, এবং অর্থনীতি আছে। ...
আমি এ ধরনের বই লিখতে পারি নি। ... তবে আমি যদি সুযোগ পাই,
এই বই আমি ইংরেজি ভাষায় নকল করব, করে আমার নামে প্রচার করব।
এম. ওয়াজেদ আলী, প্রফেসর, ইতিহাস বিভাগ, এবং প্রাক্তন উপ-উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

একটা নূতন, বলা যায় যে প্রায় অনালোচিত, এবং একেবারে কবরে যাওয়ার মতো একটা যে বিষয় –
এম. এন. রায়কে যে আমরা প্রায় ভুলতে বসেছিলাম – এরকম একজন মানুষের ওপরে
নিউটন যেভাবে পরিশ্রম করেছে, বা যেভাবে জিনিসটা আমাদের সামনে নিয়ে এসেছে,
এ জন্য আমি তাঁকে ধন্যবাদ জানাই এবং আমাদের কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করছি।
কবি জুলফিকার মতিন, প্রফেসর বাংলা বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

সেলিম রেজা নিউটন অক্লান্ত পরিশ্রম করে যে [গ্রন্থটি] লিখেছেন, তাতে সত্যি সত্যি –
তার ভাষা, উপস্থাপনা, এবং কাঠামো, গাঁথুনি, যুক্তি – তাঁকে প্রশংসা করতে হয়।
এস. এম. আবু বকর, অধ্যাপক ও সভাপতি, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

9 789840 415465



এম. এন. রায় (১৮৮৭-১৯৫৪)

কর্মপরিসর ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিশাল আয়তনের ব্যক্তিত্ব এম. এন. রায়। তিন তিনটা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ডজন খানেক দেশ ক্যানভাস রচনা করেছে তাঁর বহুবর্ণিল ক্যারিয়ারের। জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম এবং হিউম্যানিজমের মতো তিন তিনটা বিশাল সামাজিক আন্দোলনের একেবারে কেন্দ্রস্থলে ছিলেন তিনি অবলীলায়। ভারত, মেক্সিকো, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনসমূহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন। গড়ে তুলেছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি। অনর্গল লিখে গেছেন স্প্যানিশ, রুশ, জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজিতে।

কিন্তু ইতিহাসের কফিনে আটকে পড়া একজন মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বিশেষ প্ল্যানচেটের মাধ্যমে 'বিস্মৃতির কবর' থেকে তুলে নিয়ে এসে তাঁকে একজন 'নৈরাজ্যবাদী' প্রতিপন্ন করার মতো অকিঞ্চিতকর কার্যে রত হওয়া এই বইয়ের উদ্দেশ্য নয়। খোদ মানবসত্তার এবং প্রকৃতিসত্তার স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ হিসেবে নৈরাজ্যকে দেখাই আসলে এই গ্রন্থের প্রচ্ছন্ন-অথচ-প্রধান মর্ম।

ISBN 978 984 04 1546 5



আলোকচিত্র: মানিক হাসান

সেলিম রেজা নিউটন

জন্ম ১৯৬৮। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক; প্রাক্তন সভাপতি। শিক্ষকতায় ১৯৯৪ থেকে।

সম্পাদনা: ছোটকাগজ *মানুষ* এবং সামাজিক বিজ্ঞানের adcomso journal। কবিতা, কলাম, প্রবন্ধ লেখেন। অনুবাদ করেন।

প্রকাশিত গ্রন্থ: গণমাধ্যম পরিবীক্ষণের সহজ পুস্তক, ঢাকা: বাংলা একাডেমী ২০০৯; বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা: যেহেতু বর্ষা ২০১০; জুলফিকার মতিন: চিন্তা সৃজন সংগ্রাম (সম্পা), রাবি: সাম্যবাদী চিন্তা ও চর্চা কেন্দ্র ১৯৯৮।

আশি'তে ছিলেন সামরিক স্বৈরতন্ত্রবিরোধী আন্দোলনে। নব্বই-এ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে *সাইনে ডাই*-এর বিরুদ্ধে করেছেন হল না ছাড়ার আন্দোলন। ১/১১-র আমলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে সেনাক্যাম্প স্থাপন ও সেনা-নির্যাতনের বিরুদ্ধে, এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বাধীনতা রক্ষায়, জরুরি অবস্থা লঙ্ঘন করে মৌন মিছিলের দায়ে জেল খেটেছেন।

স্ত্রী সুস্মিতা চক্রবর্তী রাবি ফোকলোর বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। কন্যা লালন সুস্মিতা রাবি-স্কুলে।

প্রচ্ছদ: সেলিম রেজা নিউটন
প্রচ্ছদের মূল শিল্পকর্ম: জন-মিশেল বাসকিয়্যাত

সেলিম রেজা নিউটন

নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য

এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়নতা প্রসঙ্গে

মুখবন্ধ
প্রফেসর শহীদ ইকবাল

আগামী প্রকাশনী

মানুষ নেটওয়ার্ক



সেলিম রেজা নিউটন
নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়নতা প্রসঙ্গে
(শহীদ হবিবুর রহমান স্মারক রচনা ২০১২)
প্রথম সংস্করণ: ফাল্গুন ১৪১৯ ফেব্রুয়ারি ২০১৩
প্রকাশক: ওসমান গনি, আগামী প্রকাশনী, ৩৬ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০:
ফোন ৭১১১৩৩২, ৭১১০০২১।
মুদ্রণ: স্বরবর্ণ প্রিন্টার্স, ১৮/২৬/৪ শুকলাল দাস লেন, ঢাকা।
প্রচ্ছদ: সেলিম রেজা নিউটন
প্রচ্ছদের মূল শিল্পকর্ম: 'লা আনিমালাদা', জন-মিশেল বাস্কিয়াত (১৯৬০-১৯৮৮)
মূল্য: ৩৮০ টাকা

Salim Reza Newton
New Humanism and Anarchy:
On the Libertarianism of M. N. Roy
(Shahid Habibur Rahman Commemoration Volume 2012)
First Edition: February 2013
Published by: Osman Gani, Agamee Prakashani, 36 Bangla Bazar, Dhaka 1100, Phone 7111332, 7110021.
Cover and page makeup: Salim Reza Newton
Original art-work in the cover: 'La Animalada', oil painting on canvas by Jean-Michel Basquiat (1960–1988).
Price: Tk 380. US$ 5.

ISBN: 978 984 04 1546 5

রাষ্ট্রের হাতে আহত-নিহত-নির্যাতিত সকল মানুষের প্রতি

সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আত্মাবিহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না— কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই তো সহিংসতার কাছে ঋণী।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী

১৯৩৪-ক: ৩১৮

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা: অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ

খসড়া পুস্তক-তালিকা

সেলিম রেজা নিউটন
নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য: এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়নতা প্রসঙ্গে
নৈরাজ্যের নিত্যতা ও বঙ্গভারতীয় অরাজপন্থা সম্পর্কিত আলোচনা
প্রথম সংস্করণ: আগামী প্রকাশনী

সেলিম রেজা নিউটন
বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়
মার্কিন দূতাবাসের উইকিলিকস-তারবার্তা, সরকারী-বেসরকারী তদন্ত-রিপোর্ট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টসহ আরো নানান পরিশিষ্ট সংযুক্ত
পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ: আগামী প্রকাশনী

ডেভিড গ্রেইবার
অকুপাই ও অ্যানার্কি
সম্পাদনা: বখতিয়ার আহমেদ
প্রথম সংস্করণ: আগামী প্রকাশনী

নোম চমস্কি
অকুপাই
অনুবাদ: বদরে মুনীর
প্রথম সংস্করণ: আগামী প্রকাশনী

অরুন্ধতী রায়
অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট
অনুবাদ ও সম্পাদনা: সুস্মিতা চক্রবর্তী
প্রথম সংস্করণ: আগামী প্রকাশনী

জুলিয়ান আসাঞ্জ
সাইফারপাঙ্কস: সমাজ স্বাধীনতা ইন্টারনেট
অনুবাদ ও সম্পাদনা: সেলিম রেজা নিউটন
প্রথম সংস্করণ: আগামী প্রকাশনী

সেলিম রেজা নিউটন
নৈরাজ্য-সংহিতা
নৈরাজ্য বিষয়ক রচনা ও অনুবাদের প্রাথমিক সংকলন



পাঠ-সূচি

ষষ্ঠ পাঠ

সপ্তম পাঠ



মুখবন্ধ

মানবেন্দ্র রায়ের দর্শনটি নিয়ে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হবিবুর রহমান কিছু চর্চা করেছিলেন। তাঁর কাজ করবার ইচ্ছা থাকলেও সময় পান নি। পরে এ দর্শনের ব্যাপারে অনেক বুদ্ধিজীবীর আগ্রহ থাকলেও আনুষ্ঠানিক কোনো লেখাজোখা চোখে পড়ে নি। এর পেছনে কারণ যাই থাক, আমাদের মনে হয় র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম বা এম. এন. রায় প্রাত্যহিক জ্ঞানচর্চার প্রয়োজনেই এখন খুব বেশি দরকার। বিশেষ করে, বিশ্ববিদ্যালয়ে— জ্ঞানের তাবৎ জিজ্ঞাসার আকর এই পাদপীঠে এর অনিবার্যতা কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। জিজ্ঞাসু সত্তায় এম. এন. রায়ের দর্শন চলমান সমাজ বা প্রথাগত জীবন-ধর্মকে কীভাবে 'অ্যানার্কিস্ট' ভাবে উদ্বুদ্ধ করে বা ব্যবস্থার দ্বন্দ্বকে সম্মুখে এগিয়ে দেয়— তা বলার অপেক্ষা রাখে না। একাত্তরে শহীদ হবিবুর রহমান এক প্রকার বিবর্তিত সমাজদ্বন্দ্বের বিশ্বাস এবং বস্তুবিশ্বের পরিণতি সম্পর্কে ক্রম-উদ্ভাবনী চিন্তায় এ দর্শনের সত্যে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন। এটি একজন শিক্ষিত মানুষের এক প্রকার প্যাশনও ছিল। অসংকুচিত নিঃশ্বাসে আমরাও এক্ষুণি এর প্রবণতাটুকু চিনে নিতে পারি। এক ধরনের আত্মস্বার্থও বুঝি এতে রক্ষিত হয়। বক্ষ্যমান সেলিম রেজা নিউটনের কর্মযোগ সে সূত্রেই।

খুব সুনির্দিষ্ট বা স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে বা সকলেই এ চিন্তার সাথে একমত হবেন এমন নয় এ রচনা। কার্যত কোনো রচনার মৌলবস্তুও তা হয় না। নিউটনের এ প্রস্তাবনা তীব্র জিজ্ঞাসাসূচক এবং দূরচিন্তাসঞ্চারী। বস্তুত মানুষ, সমাজ ও রাষ্ট্র এখনকার পুঁজিবাদী কাঠামোয় কীভাবে নিষ্ঠুর-প্লাবিত, অমানবিক ক্রিয়াকাণ্ডে উদ্ভূত ও উৎসারিত এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে 'নৈরাজ্য' তীব্র ও যুক্তিসঙ্গতভাবে কেন কার্যকর, এক্ষেত্রে নয়া-মানবতাবাদী তত্ত্বটি কীভাবে নিরপেক্ষ স্ফটিকস্বচ্ছ রূপ পাচ্ছে তা দ্রুতলয়ে গড়ে উঠেছে এ পাঠে। খুব চকিত, তৃষিত, আকর্ষণীয় পাঠ। অনেকেই দার্শনিক, বিপ্লবী ও তাত্ত্বিক এম. এন. রায়ের চেতনাকে আবিষ্করণে সচেষ্ট হয়েছেন। কিন্তু নয়া-মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য-এর সামাজিক আচরণ এবং রাষ্ট্রিক বীক্ষণটুকু উদারচেতনায় অবমুক্তকরণে গণতান্ত্রিক পরিচর্যা ও প্রতিশ্রুতি বহাল রেখেছেন

নিউটন। "প্রারম্ভিকা", "আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে মার্কসীয় কর্তৃত্বপরায়ণ ও নৈরাজ্যবাদী মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্য", "নৈরাজ্যবাদ এবং আলোকায়নের মুক্তিমুখীন চিন্তাধারা", "র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম: মানবপ্রকৃতি ও ব্যক্তির স্বাধীনতা", "যুক্তিবোধ, নীতিবোধ, শ্রেয়োবোধ ও স্বাধীনতা", "মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, উদারনীতিবাদ এবং সমাজের নতুন বিন্যাস", "এম.এন. রায়: নৈরাজ্যের স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ"— ইত্যাদি শিরোনামে একটি স্বতন্ত্র রচনা তিনি হাজির করেছেন। যথার্থরূপে প্রতিটি অধ্যায়-শিরোনামই র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম তথা মানবপ্রকৃতি-নির্ধারিত, যার আধার শ্রেয়োবোধ-নীতিবোধ বা মুক্তির চিন্তামুখ। নিউটন এ প্রকল্পনায় 'নৈরাজ্য'কে সৃজন প্রক্রিয়ায় এনেছেন। সৃজনবুদ্ধিতে নৈরাজ্যের ইমেজ-রূপকে বেঁধেছেন। কর্তৃত্ব-কার্যকে ভেঙেছেন নীতি ও মূল্যবোধ দিয়ে। এক্ষেত্রে নয়া-মানবতাবাদ তত্ত্বটি পাঠ সৃষ্টি করে।

'মানুষ সারসত্তাগতভাবেই একটি যুক্তিবাদী প্রাণী। মানুষের ভেতরকার যুক্তিবোধ বিশ্বজগতের ঐকতানেরই প্রতিধ্বনি।'— তথ্য ও তত্ত্বে নয় শুধু প্রশ্ন ও যুক্তিতে নিউটন ন্যায়ভিত্তিক সমাজের কথায় পৌছান। কীসের ন্যায় ও বিধৃত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সে ন্যায় কতটা প্রতিষ্ঠিত? ব্যক্তি-স্বাধীনতা কিংবা ব্যক্তি-বিবেচ্য সমাজে গণতন্ত্র বা উদারনীতির উপচার কীভাবে রক্ষিত? আদৌ রাষ্ট্র কি তা করে? করার মতো যোগ্যতা বা সামর্থ কি তাদের আছে— বিশেষ করে রাষ্ট্র-ক্ষমতা যখন রক্ষককে ক্ষমতার প্রতিভূতে পরিণত করে তখন ওই রাষ্ট্রের মানুষ নখদন্তহীন জন্তুতে পরিণত হয়, ভীতু-অসারত্বের দ্বারা এক ধরনের দাসত্বকে বরণ করে— এসব তো কর্তৃত্বেরই উৎস! যিনি রাষ্ট্র পরিচালনা করেন তিনি 'শাসক' ছাড়া কী? ব্যবস্থার ভেতরে যে ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের ঐতিহ্য প্রতিষ্ঠিত তাতে তা-ই তার মনস্তত্ত্ব! এতেই নৈরাজ্যের দর্শন, তার সাংগঠনিক মূল্য পুনর্গঠিত; নিউটন এ কল্পে ব্যক্তির নীতিবোধ, শ্রেয়োবোধের সমাজ-ভিত্তি- কাঠামোটি বুঝিয়ে দিতে চান, হয়তো প্রচলিত মূল্যবোধে তা অনধিকার মনে হয় কিন্তু সমস্ত লেজুড়বৃত্তির বাইরে সার্বভৌম চিন্তায় নিউটনের এ তত্ত্ব-সমুদয় জিজ্ঞাসু দৃষ্টির ফসল। কর্মে ও বিশ্বাসে তা অমূলক নয়। র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমও তাই।

শহীদ হবিবুর রহমান আচরণে ও চরিত্রে একটি ঠিকানার মানুষ ছিলেন— তা স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণ পার্থিব মানুষ। এই মানুষটি ন্যায় ও শ্রেয়োবোধে পরিপূর্ণ। সে চেতনায় এম. এন. রায় তাঁর কাছে প্রতিষ্ঠা পায়, গুরুত্ব অর্জন করে। তার এক প্রকার আধুনিক ও সার্বজনীন রূপও আছে। কোনো বিশেষ স্বার্থে, ভীরুতায়, অন্যায়ে, অপমানে তার গুরুত্ব নেই। নিউটনের এই প্রস্তাবনা সেই সত্যটিই আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

বস্তুত গ্রন্থটির সার্বিক অবকাঠামোয় মিলবে নৈরাজ্য – এম. এন. রায়, গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের এবং আমাদের আবহমান কালের মনীষাচিন্তা। তার ভেতরে পাওয়া যাবে রাষ্ট্র ও তার কর্মক্ষমতার অভিপ্রায় – সে অভিপ্রায়ের অন্ধি-সন্ধি। রাষ্ট্রের জন্মলগ্নেই বা রাষ্ট্র-ধারণার ভেতরেই থাকে কর্তৃত্ব – অ্যান্টি ব্যক্তি-গণতন্ত্র-সমাজ-সংস্কৃতির মূল্যবোধ। তথাপি বিদ্যমান এই রাষ্ট্র-ধারণার র‍্যাডিক্যাল রূপান্তরও সম্ভব এবং দরকারি। পণ্ডিতদের 'নৈরাজ্য' তথা কর্তৃত্ব-বিরোধিতা সেখানেই পুনর্গঠিত। সেই সক্রেটিসের কাল থেকে অদ্যাবধি এরূপ বস্তু-ধারণার নিহিতার্থ প্রবলভাবে চিন্তকগণের মধ্যে ভেতর-কাঠামোতে প্রবহমান ছিল। সেটির একটি পর্যায় মাত্র এম. এন. রায়ের চিন্তাসমূহ। নিউটন ওপর থেকে কিছু বলেন নি – তাঁর এন্তার পাঠ ভেতর-কাঠামোর এবং কর্পোরেট এ বিশ্বের তাবৎ অপচিত উদাহরণের নিরিখে, যা সবসময় ঘটেছে, ঘটে চলছে আমাদের চতুষ্পার্শ্বে। বিশেষত সপ্তম পাঠে ৭.৭, ৭.৮, ৭.৯ ... ৭.১২ অংশগুলোতে তার প্রমাণ মিলে যায়।

ভূমিকা বাড়িয়ে লাভ নেই। আসুন জ্ঞান সৃজনের পথে এই চলকগুলো এগিয়ে নিই আমরা এবং আমাদের নয়া মানবতাবাদ ও নৈরাজ্য কীরূপে পারস্পরিক তা জেনে নিই। আর, সঙ্গত রূপে এম. এন. রায় এবং আমাদের এই জমিনের সাহসী শহীদ হবিবুর রহমানকে মুক্তিমান চিন্তক হিসেবে আবিষ্কার করি। এতে আমরা যুক্ত হতে পারি একটি বিবর্তনমুখী সামষ্টিক চিন্তার সঙ্গে। তাতে কেউ পেছায় না, বরং এগিয়েই যায় – অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে।

শহীদ ইকবাল
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ ও
প্রাধ্যক্ষ, শহীদ হবিবুর রহমান হল, রাবি
৭ই ডিসেম্বর ২০১২



কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতা

০.১ অবতরণের উপলক্ষ

একাত্তরের শহীদ অধ্যাপক হবিবুর রহমানের ৪২তম অন্তর্ধান দিবস (১৫ই এপ্রিল ২০১২) উপলক্ষে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদ হবিবুর রহমান হল কর্তৃক উক্ত তারিখে যে সভা আয়োজনের কথা ছিল সেই সভায় 'শহীদ হবিবুর রহমান স্মারক প্রবন্ধ' হিসেবে পাঠের জন্য আদিতে এই রচনাটি লিখিত হয়েছিল হল-প্রাধ্যক্ষ, কথাসাহিত্যিক, ছোটকাগজের সম্পাদক-প্রকাশক-সংগঠক, এবং আমার একান্ত বন্ধুভাজন প্রফেসর শহীদ ইকবালের প্রস্তাবে। সেই মোতাবেক এই রচনাকর্মটির আদিতম সংক্ষিপ্ত পাঠটির লিখনযজ্ঞ সমাপ্ত হয় ১৫ই এপ্রিল ২০১২ তারিখের বিকেলেই।

কিন্তু তার সপ্তাহ খানেক আগে আমার সাথে প্রফেসর ইকবালের ফোনালাপজনিত সামান্য ভুল-বোঝাবুঝির কারণে অনুষ্ঠানটি সেই দিন আর আয়োজিত হয় নি। ইকবাল চাচ্ছিলেন ঐ তারিখের বেশ খানিকটা আগেই রচনাটি হাতে পেতে, যেন সেটি আগেভাগেই ছাপানো যায়। আমি তাঁকে বলি যে আমার লেখা শেষ হতে হতে ১৫ তারিখ দুপুর-বিকাল হয়ে যাবে। স্বল্পভাষী, মৃদুভাষী ইকবাল তখন বলেন (ফোনে অবশ্যই), 'তাহলে থাক'।

এই 'তাহলে থাক' বলতে ইকবাল আসলে বুঝিয়েছিলেন, ১৫ই এপ্রিলের অনুষ্ঠান-তারিখ তাহলে তখন আর বহাল রাখা যাচ্ছে না, কেননা রচনাটি তার আগে ছাপানো সম্ভব হচ্ছে না। আর, ঐ 'তাহলে থাক' বলতে আমি বুঝেছিলাম, ছাপানোর ব্যাপারটুকুই শুধু আপাতত বাদ যাচ্ছে, তবে অনুষ্ঠানটি ঐ তারিখেই হবে কেননা আমি উক্ত অনুষ্ঠানের আগেই আমার রচনাটির কম্পিউটার-বিন্যস্ত কপি নিয়ে অনুষ্ঠান-স্থলে হাজির থাকতে পারব বলেছি।

এই ভুল-বোঝাবুঝির অবসান ঘটে ১৫ই এপ্রিলের বিকেল পাঁচটায়— যখন আমি তাঁকে ফোন করে জানতে চাই, "অনুষ্ঠানের খবর কী? আমি কম্পিউটার-মুদ্রিত রচনা নিয়ে হবিবুর রহমান হলের দিকে রওনা হচ্ছি।"

যা-ই হোক, সেই অনুষ্ঠানের পরবর্তী তারিখ তখনই নির্ধারিত হয় ১৪ই

ডিসেম্বর ২০১২— ৪১তম শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে। সেই মোতাবেক উক্ত রচনাটিকে বিস্তারিত ঘষামাজা করে এবং রীতিমতো একটি পুস্তক আকারে তার সাজসজ্জা সম্পন্ন করে আজ এখানে আপনাদের সামনে পেশ করছি।

০.২ স্বাধীন অ-প্রফেসর হবিবুর রহমান ও শিক্ষক-রাজনীতি

আমি হই নি, বরং আশ্বস্তই হয়েছি— কিন্তু আপনারা অবাক কিংবা লজ্জিত হবেন কিনা জানি না, শত শত প্রফেসরে ভরা আমাদের এই প্রিয় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় সেই পঞ্চাশের দশকে কেম্ব্রিজ থেকে গণিত শাস্ত্রে 'ট্রাইপস' ডিগ্রি অর্জন করা হবিবুর রহমানকে পূর্ণাঙ্গ প্রফেসর করে নি— তৎকালে তো নয়ই, আজও নয়। তিনি ছিলেন 'রিডার'— 'পাঠক' নন, 'সহযোগী অধ্যাপক' পদমর্যাদার একজন শিক্ষক। কারণ ছিল তাঁর স্বাধীন স্বভাব, এমনকি উপাচার্যের মুখের উপরে উচিত কথা বলার নিঃসঙ্কোচ স্বভাব। তিনি ছিলেন এ ব্যাপারে 'কিংবদন্তী' (আমানুল্লাহ আহমদ, "শহীদ হবিবুর রহমান: স্মৃতিকথা", শহীদ ইকবাল, ২০১১: ২৫)।

তাঁর এই স্বভাবের (এবং তৎকালীন উপাচার্য ডক্টর ইতরাৎ হোসেন জুবেরী সাহেবের সাথে তাঁর টক্করের) কথা সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন আমানুল্লাহ আহমদ ("শহীদ হবিবুর রহমান: স্মৃতিকথা", শহীদ ইকবাল, ২০১১: ১৭-২০) এবং সালাহউদ্দীন আহমদ ("আমার বন্ধু মুহাম্মদ হবিবুর রহমান", শহীদ ইকবাল, ২০১১: ১৯-২০)। আর, শহীদ হবিবুরের কন্যা রোকসানা রাজ্জাক (রুনু) তো তাঁর বাল্যকালের স্মৃতি থেকে সুস্পষ্টই উদ্ধার করেছেন: "ক্ষমতা আর পদমর্যাদার লোভ আব্বার কোনোদিনই ছিল না" (রোকসানা রাজ্জাক, "আব্বার স্মৃতি"; শহীদ ইকবাল, ২০১১: ৩৫)।

ভয়াবহ যুদ্ধের আগুনে মোড়ানো সময়ে, সেই তখনই কিংবদন্তী হয়ে ওঠা, মুক্তিযুদ্ধের অদৃশ্য রাজশাহী-বিশ্ববিদ্যালয়-ইউনিটের অঘোষিত অধিনায়ক-পিতাকে আচমকা-হারিয়ে-ফেলা বালিকার বাল্যস্মৃতি মিথ্যা কথা বলতে পারে বলে আমি বিশ্বাস করি না। এবং বিব্রতকর এই কথা না তুলে আমি পারি না: ইদানীংকালের যেসব উপাচার্য প্রশ্ন তোলা এবং আত্মমর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টাকে বেয়াদবি বলে গণ্য করেন, তাঁরা কি ভুলে গেছেন দোর্দণ্ড প্রতাপশালী মুঘল বাদশাহ জাঁহাপনা জুবেরীর সাথে অধ্যাপক হবিবুর রহমানের সেই ক্লাসিকাল এনকাউন্টার?

অধ্যাপক হবিবুর রহমান তাঁর জ্ঞান, সততা ও বিদ্রোহের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। নিষ্ঠাবানের জ্ঞান তাঁকে সৎ এবং বিদ্রোহী করে তুলেছিল। নিষ্ঠাহীন জ্ঞান মানুষকে করে তোলে অনুগত— উপাচার্য বা কেরাণি। এই জন্যই

বোধহয়, সামনের মেলায় প্রকাশিতব্য আমার অপর একটি গ্রন্থের (*বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়* এর পরিবর্ধিত ২য় সংস্করণের) 'ভূমিকা' রচনা করতে গিয়ে, কথাসাহিত্যিক মামুন হুসাইনের মনে পড়ে গিয়েছিল যে "খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হ্যারল্ড লাস্কি বলতেন— বিশ্ববিদ্যালয় সব সময় চায় নিরাপদ শিক্ষকের সমাহার— 'ইউনিভার্সিটিজ সার্চ ফর সেফ প্রফেসরস্' (দ্রষ্টব্য: Harold J. Laski, *The Dangers of Obedience & Other Essays*, 1930)"।

ইউনিভার্সিটি বলতে কিন্তু আইনত উপাচার্য এবং তাঁর আমলাদেরকেই বোঝায়— শহীদ হবিবুর রহমানের মতো শিক্ষকদেরকে বোঝায় না। অন্তত ১৯৭৩ এর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন সেটা লিখিতভাবেই জানিয়ে রেখেছে।

তো, জনাব হবিবুর রহমানকে প্রফেসর না করার মূল কারণ ছিল তৎকালীন শিক্ষক-রাজনীতির মধ্যে নিহিত। ক্ষমতা যেখানে কেন্দ্রীভূত আমলাতন্ত্র তথা কর্তৃত্বক্রমতন্ত্রের কাছে গচ্ছিত থাকে, সেখানে তার কাছ থেকে ন্যূনতম ন্যায্য আচরণ প্রত্যাশা বা দাবি করাটাও একটা রাজনৈতিক ঘটনায় পরিণত হয়, কেননা কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিন্যাস-বন্দোবস্ত-বিতরণ সংক্রান্ত আর্ট এবং সায়েন্সকেই বলে রাজনীতি (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১০ এর অন্তর্ভুক্ত রাজনীতি সংক্রান্ত আলোচনা)। আজকের সম্পূর্ণ রঙিন (বেনীআসহকলা) শিক্ষক-রাজনীতির মতোই তা ছিল ভিসি-র ক্ষমতাকেন্দ্রিক। প্রফেসর এ.বি.এম. হোসেন তার বিবরণ দিয়েছেন "রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধিজীবী হত্যা: শহীদ হবিবুর রহমানের স্মৃতি" রচনায় (শহীদ ইকবাল, ২০১১: ৪৭-৪৮)। এই অ্যামারিটাস অধ্যাপক সুস্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন: "অসাধারণ মেধা সত্ত্বেও ... বিশ্ববিদ্যালয়ের দলীয় রাজনীতির কারণে তিনি প্রফেসর পদে আসীন হতে পারেন নি বলে শুনেছি।"

এই জন্যই আমি আশ্বস্ত হয়েছি: আজকের চেয়ে অনেক বেশি কেন্দ্রীভূত একটা আমলাতান্ত্রিক কাঠামোয় এটাই হওয়ার কথা। পরবর্তী উপাচার্যগণ (কেউ কম কেউ বেশি) ঐ জুবেরী সাহেবেরই[১] উত্তরাধিকারী বটেন, কেননা

---

[১] "জুবেরী সাহেব ইংরেজি সাহিত্যে সুপণ্ডিত ছিলেন কিন্তু প্রশাসক হিসেবে তাঁর যথেষ্ট দুর্বলতা ছিল। অনেক ক্ষেত্রে তাঁর আচরণ ছিল স্বেচ্ছাচারপূর্ণ ও উদ্ধত। তিনি নিজে অবাঙালী ছিলেন এবং সব সময় কয়েক জন অবাঙালী শিক্ষকের মোসাহেবীর ফলে বাঙালী শিক্ষকদের সঙ্গে তাঁর ভালোভাবে মেলামেশা সম্ভবপর হতো না। তার ফলে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল।" (সালাহউদ্দীন আহমদ, "আমার বন্ধু মুহাম্মদ হবিবুর রহমান"; শহীদ ইকবাল, ২০১১: ১৯।) অথচ এই ভদ্রলোকের

ভালো বাদশাহরাও কিন্তু বাদশাহ-ই। সাধে কি আমি বলি 'বাদশাহী বিশ্ববিদ্যালয়' (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৪)!

আজকের শিক্ষক-রাজনীতির অধঃপতনের বীজ যে বহু পুরোনো এবং প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোগত— তা বেশ বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে। আর, সেই বীজ আজ আমাদের খোদ বিশ্ববিদ্যালয়টাকেই মূর্তিমান বিষবৃক্ষে পরিণত করতে চলেছে। তো, এরকম একটি বিষবৃক্ষের ডালে বসে যে শিক্ষার্থীদের একটি হল তার প্রাধ্যক্ষের উদ্যোগে জ্ঞানচর্চার বাসা বাঁধতে চায়, তা আশ্চর্যেরই বটে, তবে অস্বাভাবিক তো নয়ই, কাঙ্ক্ষিতই বরং। শুরুতেই তাই শহীদ হবিবুর রহমান হলকে অভিনন্দন জানিয়ে যাঁর নামে হল, সেই পুণ্যবানের মহিমাময় স্মৃতির প্রতি খোদ নিজেকে নিবেদন করে আজকের আলোচনায় ঢুকছি।

০.৩ বস্তুনির্দেশ[২]

বর্তমান রচনাটি বলতে গেলে রাষ্ট্রতন্ত্রের তথা কেন্দ্রীভূত ও কর্তৃত্বক্রমতান্ত্রিক ক্ষমতার বিপদ সম্পর্কিত। রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে মনোযোগ দিয়েছে এই বই প্রধানত এম. এন. রায়ের দোহাই দিয়ে। দীর্ঘকাঙ্ক্ষিত সমাজতন্ত্রের নামে প্রতিষ্ঠিত মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-স্তালিনবাদী রুশ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক শাখার সর্বোচ্চ পর্যায়ে কাজ করার পরও সেই রাষ্ট্রের ধাওয়া খেয়ে পালিয়ে বাঁচা এম. এন. রায়কে নিয়ে এই বই। (অধ্যাপক হবিবুর রহমানরাও কিন্তু নিহত হয়েছিলেন একটা রাষ্ট্রেরই হাতে। আজকের স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রও একটি রাষ্ট্রই বটে যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ হাতে শত শত মানুষ নিহত হচ্ছেন অবলীলায়।)

তথাপি, শুধু ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র-প্রশ্নে সীমাবদ্ধ নয় এই বই। মানবপ্রকৃতির বৈশিষ্ট্যাবলী উপলব্ধি করা, মানুষের ন্যায়-নীতি-যুক্তিবোধের ব্যাপারগুলোকে তার স্বাধীনতা-সহযোগিতা-সৃজনশীলতার অন্তর্জাত/স্বভাব-

---

নামেই আমরা একাধারে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির অফিস, শিক্ষক-অফিসারদের ক্লাব, তরুণ শিক্ষকদের ডরমিটরি তথা বিশ্ববিদ্যালয়-অতিথি-ভবনের নামকরণ করেছি 'জুবেরী ভবন' নামে। উপাচার্যরা উপাচার্যদের গুণের কদর জানেন বৈকি।

[২] 'বস্তুনির্দেশ' শব্দটা বৈষ্ণবসাহিত্য থেকে নেওয়া। গ্রন্থের বিষয়বস্তু কী তা যে অংশে বলা হয়, সেই অংশটাকে বলে 'বস্তুনির্দেশ'। বিশেষত *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থের রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছ থেকে আমি এই শব্দের ব্যবহার শিখেছি (কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ০০০০: ১৮৯, ১৯৯)।

জাত বৈশিষ্ট্যসমূহের সাথে মিলিয়ে বোঝা, রেনেসাঁ তথা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার প্রকৃত (তথা পুঁজিবাদবিরোধী) বৈশিষ্ট্যটিকে শনাক্ত করা, এবং স্বাধীন ব্যক্তিদেরকে নিয়ে স্বাধীন-সহযোগিতাপূর্ণ একটি সমাজবিন্যাস অর্জনের প্রশ্নও এই গ্রন্থের আরাধ্য বিষয়।

যেহেতু আদিতে এটি আসলে একটি লিখিত 'বক্তৃতা' যেটি একটি সভায় আমার পাঠ করার কথা, তাই এই গ্রন্থের অধ্যায়গুলোকে আমি 'পাঠ' হিসেবে উপস্থাপন করেছি। 'প্রথম পাঠ'-এ খুবই অল্প ইশারায় তুলে ধরার চেষ্টা করেছি এম. এন. রায়ের রূপকথার মতো খ্যাতি-পরিচিতি ও কর্মপরিমণ্ডল। সেই সাথে দেখানোর চেষ্টা করেছি, অম্লান দত্তের দোহাই দিয়ে, কেন 'কর্তৃত্বপরায়ন ঐতিহ্যের বিপরীতে' তাঁকে 'মুক্তিপরায়ন' ধারায় বিবেচনা করা দরকার।

এম. এন. রায়ের বিশেষ বিখ্যাত ভাবশিষ্যদের একজন অম্লান দত্তের সিদ্ধান্ত স্পষ্ট: "কমিউনিজমের সাথে" রায়ের "চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এসে হাজির হয়েছিল তাঁর কর্তৃত্বপরায়নতা-বিরোধিতার আবশ্যিক পরিণাম হিসেবে"।

'দ্বিতীয় পাঠ'-এ তাই আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক পরিসরে কর্তৃত্বপরায়ন (তথা মার্কসবাদী-লেনিনবাদী) ও মুক্তিপরায়ন (তথা নৈরাজ্যবাদী) দুই ধারা বলতে কী বোঝায় সেই প্রসঙ্গ তুলেছি।

তারপর 'তৃতীয় পাঠ'-এ প্রধানত ভিলহেম ফন হোমবল্ট, নোম চমস্কি এবং রুডল্ফ রুকারের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করেছি: নৈরাজ্যবাদের উৎস খোদ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ তথা আলোকায়নের মুক্তিপথু চিন্তাকর্ম-পরিমণ্ডলের ভেতরেই, এবং আলোকায়নের এই ধারাটি আসলে র‍্যাডিকালভাবে পুঁজিবাদবিরোধী, সেই অর্থে মুক্তিপরায়ন। এই পাঠে আরো দেখাতে চেয়েছি যে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে আমাদের ধারণা কী তা-ই আসলে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিনিচয়ের মূল পার্থক্য-বিন্দু— রায়ের ভাষায় 'পয়েন্ট অফ ডিপারচার' (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৯৩)।

'চতুর্থ পাঠ'-এ তুলেছি রায়ের র‍্যাডিকাল হিউম্যানিজমে এই মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত বিশ্লেষণ এবং ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা কী রকম সে বিষয়ক কথা। নৈরাজ্যবাদীদের সাথে রায়ের চিন্তার মিল-অমিলের প্রসঙ্গটি তো সবসময়ই জারি থেকেছে।

'পঞ্চম পাঠ'-এ আছে যুক্তিবোধ, নীতিবোধ, শ্রেয়োবোধ ও স্বাধীনতা সম্পর্কে এবং 'ষষ্ঠ পাঠ'-এ আছে মার্কসবাদ ও উদারনীতিবাদ নৈরাজ্যবাদ ও রায়ের বিশ্লেষণের বিস্ময়কর মিলের জায়গাগুলো।

'সপ্তম পাঠ'টি উপসংহারপর্ব। এখানে আমার অন্যতম সিদ্ধান্ত হচ্ছে: এম. এন. রায় নৈরাজ্যচিন্তনের একটি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অভিপ্রকাশ এবং রায়ের

মতো আরো অজস্র উদাহরণ-ইশারা খোদ বঙ্গ-ভারতেই আছে। আর, সেসব ইশারা নিয়ে খানিক খানিক উস্কানিমূলক কথাবার্তা এই পাঠ'-এ পেশও করেছি।

বর্তমান রচনাটি আসলে একটি খসড়া রচনা। একে আরো যতটা 'পূর্ণাঙ্গ' রূপ দেওয়া আমার পক্ষে ইতোমধ্যেই সম্ভব ছিল তা আমি পেরে উঠি নি নিতান্তই সময়াভাবে এবং নিজের কর্মদোষে। পরে একটা পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ তৈরি করার চেষ্টা করব নিশ্চয়ই। মূলত এম. এন. রায়ের শেষ জীবনের সমাজপরিবর্তন সংক্রান্ত রূপকল্প এবং তার আগে তাঁর রচিত (ভারতের) সংবিধান নিয়ে আলাপ বাকি থাকল, যদিও এসবের মোদ্দা বৈশিষ্ট্যসমূহের ইশারা এই বইয়ে বাদ পড়ে নি।

এ ছাড়া ভবিষ্যতে এ বইয়ের দ্বিতীয় সংস্করণে আরো কিছু ব্যাপার যোগ করতে হবে। এই বইটিকে মূল প্রবন্ধ ধরে নিয়ে গত ১৪ই ডিসেম্বর ২০১২ তারিখে রাবি-র শহীদ হবিবুর রহমান হলের মুক্তমঞ্চে ঘণ্টা পাঁচেক ধরে একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে। সেখানে বিখ্যাত কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক, কবি ও প্রফেসর জুলফিকার মতিন, রাবি'র প্রাক্তন উপ-উপাচার্য প্রফেসর এম. ওয়াজেদ আলী, রাজশাহী বিভাগের বিভাগীয় কমিশনার ও কবি আসাদ মান্নান, এবং রাবি'র দর্শন বিভাগের সভাপতি ও অধ্যাপক এস. এম. আবু বকর আলোচনা করেছেন। তাঁদের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমাকেও মোটামুটি দীর্ঘ একটি স্বতঃস্ফূর্ত আলোচনা করতে হয়েছে।

তো, এই সেমিনারের সম্পূর্ণ অনুলিপি পরবর্তী সংস্করণের পরিশিষ্টে যোগ করার কর্তব্য থেকে গেল। এই মুহূর্তে এই পাঁচ ঘণ্টার সেমিনারের অনুলিপি তৈরি করা যে সম্ভব না সে কথা আশা করি সকলেই বুঝবেন।

আপাতত এই বইয়ের মলাটের দুই ভাঁজে তাঁদের কিছু প্রশংসাসূচক বাক্য ঢুকে দেওয়া গেল এই বইয়ের মার্কেটিঙের স্বার্থে এবং পরবর্তী সংস্করণের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে। 'অপ্রশংসাসূচক' বিষয়াদি পরের সংস্করণের জন্য তোলা থাকল।

সেই সাথে, এখানে এ-ও জানিয়ে রাখি যে হল-কর্তৃপক্ষ এবং 'মানুষ নেটওয়ার্ক' যৌথভাবে পুরো অনুষ্ঠানটির অডিওভিজুয়াল ডকুমেন্টেশন করেছেন। অচিরেই আমরা পেশাদারভাবে নির্মিত/পরিবেশিত একটি ডিভিডি-রমে পুরো অনুষ্ঠানটির 'আনকাট' শ্রুতি-দৃশ্য পেয়ে যাব। সুতরাং, প্রশংসা-অপ্রশংসা-সীমাবদ্ধতা-সম্ভাবনা-সহিষ্ণুতা-উদারতার কোনোকিছুই উবে যাবে না।

০.৪ প্রচ্ছদ ও পুস্তকসজ্জা

পুস্তকের অঙ্গসজ্জার বাতিক আমার পুরোনো। এই কাজে যা কিছু ছবি ব্যবহার করেছি তার সবই ইন্টারনেট থেকে নামানো এবং রায়ের প্রায় সবগুলো ছবিই এই সাইট থেকে নেওয়া: mnroyhumanist.tripod.com/photogallery /index.htm।

দুটো ছবি এম. এন. রায় সম্পর্কিত দুটো বইয়ের মলাট থেকে নেওয়া। তার মধ্যে প্রিন্টার্স লাইন এবং 'পাঠ-সূচি' ইত্যাদিতে ব্যবহৃত ছবিটা ক্রিস ম্যানজাপারা'র লেখা *এম. এন. রায়: মার্কসিজম অ্যান্ড কলোনিয়াল কসমোপলিটানিজম* নামক বইয়ের মলাটে ছিল (ক্রিস ম্যানজাপারা, ২০১০)। অপর বইটার মলাট-অংশ সেঁটে দিয়েছি শেষ অধ্যায়ের মুখচ্ছবিতে। সেটির হদিস ছবির নিচেই দেওয়া আছে (পৃষ্ঠা ৮১)।

আর, প্রচ্ছদ প্রসঙ্গে এই বইয়ের শেষে, ১৯৭ পৃষ্ঠায় দেওয়া "মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা: অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ প্রসঙ্গে" অংশটি দ্রষ্টব্য।

০.৫ কৃতজ্ঞতা

এই স্মারক রচনাটি লেখার কথা যেদিন আমাকে প্রফেসর ইকবাল বলেন সেদিন পর্যন্ত এম. এন. রায়ের একটি মাত্র বই আমার পড়া ছিল (*ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা*), তা-ও আবার ইন্টারনেট থেকে নামিয়ে। পরে দেখি সেই বইটির বাংলা অনুবাদও আছে (এম. এন. রায়, ২০০৬-ক)। তো, ইকবালের প্রস্তাবে রাজি হওয়ার আগে আমি তাঁকে এই মর্মে শর্ত দিই যে যদি নেটে রায়ের যথেষ্ট সংখ্যক মূল বই পাই কেবল তবেই আমি দায়িত্বটি গ্রহণ করব।

শহীদ হবিবুর রহমান স্মরণে তাঁর গুরু এম.এন. রায়কে নিয়ে আমার আগে, সেই ১৯৭৪ সালে, নানা অর্থে দুর্দান্ত একটি প্রবন্ধ (আলী আনোয়ার, ১৯৭৪) লেখা হয়েছিল এই বিশ্ববিদ্যালয়েই। নিশ্চয়ই পুস্তকাভাবে— রায়ের নিজের কোনো বইয়ের হদিস ছাড়াই সেটি লিখিত হয়েছিল। আমি সেই দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে পড়তে রাজি ছিলাম না। পরে, সময় নিয়ে, ইন্টারনেটের নানা দুর্গম স্থান খানা-তল্লাশি করে বিস্ময়করভাবে, মহানন্দে, রায়ের আমি বেশ কিছু বই নামিয়ে ফেলতে সক্ষম হই। এই রচনার শেষে তার তালিকা দেখতে পাওয়া যাবে। এই জন্য তো বটেই, উপরন্তু নিত্যদিনের লেখাপড়ার কাজে প্রতি মুহূর্তে যে ইন্টারনেটের দ্বারস্থ হই তার জন্য, অসংখ্য মানুষের তৈরি করা অবাধ জ্ঞানচর্চার মহাসমুদ্র খোদ ইন্টারনেট-প্রযুক্তির কাছে সাধারণভাবে, এবং রাবি-কম্পিউটার-কেন্দ্রের কাছে বিশেষভাবে, কৃতজ্ঞতা

জানাই।

বেশ কিছুদিন হলো ইন্টারনেটের দুর্দান্ত এন্তেজাম করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সেন্টার। সম্ভবত বাংলাদেশের দীর্ঘতম, ৩২ কিমি দীর্ঘ কেবলওয়ালা, একটি 'লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক' এর মাধ্যমে তাঁরা হাতেগোনা কয়েকজন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়ে নামমাত্র মূল্যে/বিনামূল্যে যথাক্রমে আমাদের আবাসিক কোয়ার্টার্সে এবং নিজ নিজ অফিস-কক্ষে ইন্টারনেট-সেবা দিয়ে চলেছেন। দিন দিন এর মান উন্নত হচ্ছে।

অন্য দিকে, কম্পিউটার-প্রযুক্তির এই সুযোগ গ্রহণ করে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার সারা পৃথিবীর বেশিরভাগ শিক্ষায়তনিক জার্নাল আমাদের হাতের মুঠোয় এনে দিয়ে তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো যে বিপ্লব ঘটিয়েছেন তার কোনো তুলনা নাই। এই না হলে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়! ভালো লাগে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে নতজানু শুকরিয়া জানাই।

শুকরিয়া 'গুগল ট্রান্সলেট' (http://translate.google.com) এর কাছেও। এই বইয়ের বেশির ভাগ ইঙ্গ-ইউরোপীয়-আরবীয়-ল্যাটিনীয় নামের উচ্চারণের জন্য তাঁদের কাছ থেকে অবারিত সাহায্য নিয়েছি।

প্রফেসর শহীদ ইকবাল নিজে এবং কথাসাহিত্যিক-মনোচিকিৎসক-শিক্ষক জনাব মামুন হুসাইন এবং চিত্রশিল্পী মকলেসুর রহমান অরুণ রচনাটি পড়ে আমাকে বিভিন্ন মতামত ও পরামর্শ দিয়েছেন। শহীদ ইকবাল এই বইটির একটি 'মুখবন্ধ'ও লিখে দিয়েছেন।

এ লেখা নিয়ে আমার দিশাহারা দৌড়ের মধ্যে সদাসঙ্গী সুস্মিতা চক্রবর্তী বইয়ের গাদার মধ্যে নিখোঁজ অথচ মহাদরকারি বইগুলো খুঁজে দিয়েছেন। উপরন্তু, ভীষণ হুড়াহুড়ির মধ্যেও শহীদ ইকবালের লেখা 'মুখবন্ধ'টা কম্পোজ করে দিয়েছেন সুস্মিতা। এ ছাড়া বন্ধু বদরে মুনীর, স্নেহভাজন সজীব সরকার ও আতোয়ারের পাশাপাশি তিনি অত্যন্ত যত্ন করে এ বইয়ের প্রুফও দেখে দিয়েছেন। বদরে মুনীরের পরামর্শে এ বইয়ের দুই-এক জায়গায় আমি পরিবর্তন করেছি। তাতে করে বইটির জন্য ভালো হয়েছে।

আর, বাবা বই লিখছে, এবং বই লিখে টাকা পাওয়া না গেলেও সেটাই বিশ্ববিদ্যালয়-শিক্ষকের সবচে বড় কাজ, এ কথা শুনে অবাক চোখে ও মলিন হাসিমাখা মুখে আমার দৈনিক ১২-১৪ ঘণ্টার অনুপস্থিতি মেনে নিয়েছে ছোট্ট মেয়ে লালন সুস্মিতা। এঁদের সাথে আমার সম্পর্ক কৃতজ্ঞতার নয়, নিতান্তই ভালোবাসার।

আবারও কৃতজ্ঞতা জানাই শহীদ হবিবুর রহমান হলের সাথে সংশ্লিষ্ট সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের। যে মমত্ববোধ ও ভালোবাসা তাঁরা দেখিয়েছেন শহীদ

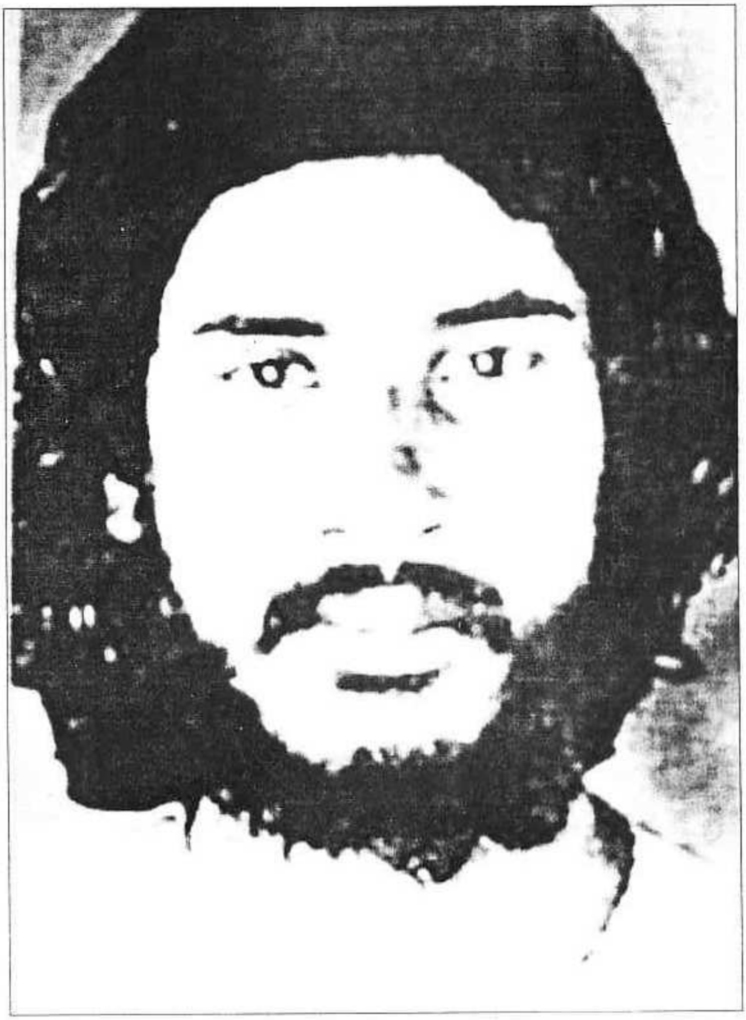
অধ্যাপক হবিবুর রহমানের প্রতি, এবং যে বুদ্ধিবৃত্তিক উদারতা তাঁরা দেখিয়েছেন আমার মতো অপ্রচল মানুষের প্রতি, তা শুধু মুক্ত-স্বাধীন-স্বায়ত্তশাসিত একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথেই মানায়।

বেঁচে থাকলে আমরা এক দিন আমাদের অতি প্রিয় এই বিশ্ববিদ্যালয়কে উদ্দেশ্য-প্রণোদিত 'পাবলিকেশন'-তাড়নার জায়গা থেকে আনন্দ-প্রণোদিত জ্ঞান-সাধনার আশ্রমে রূপ দিতে পারব নিশ্চয়ই।

সেলিম রেজা নিউটন
রবি: ২৫শে ডিসেম্বর ২০১২

প্রথম পাঠ

প্রারম্ভিকা অথবা রায়চন্দ্রিকা



২৩ বছর বয়সের জাতীয়তাবাদী বিপ্লবী যোদ্ধা নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ওরফে এম. এন. রায়। এ যাবত প্রাপ্ত তাঁর আদিতম ছবি। ১৯১০।



প্রথম পাঠ
প্রারম্ভিকা অথবা রায়চন্দ্রিকা

আর কোনো সার্বজনিক মানুষকে আমি চিনি না, সে তিনি প্রায়োগিক রাজনীতিবিদই হোন বা স্রেফ পর্যবেক্ষকই হোন, যিনি এম. এন. রায়ের চেয়ে অধিকতর সুসঙ্গত রকমের সঠিক নবী। (ফিলিপ স্প্র্যাট, "প্রাক্‌কথন", এম. এন. রায়, ১৯৪৬-ক)

১.১ দাদাদের যুগ, নবীর ধারণা, অ-রাজতন্ত্রী বুদ্ধিজীবী

জীবন চলার পথে যেসব স্বনামধন্য মানুষের সাথে এম. এন. রায়ের পরিচয় ও ঘনিষ্টতার অবকাশ ঘটেছে তাঁদের তালিকা বিস্ময়কর; অনেকের জন্য ঈর্ষণীয়ও বটে। এঁদেরই সাথে তাঁর কাজকর্মের ও অভিজ্ঞতা বৃত্তান্ত নিয়ে আস্ত, মোটাসোটা একটি বইও লিখেছেন তিনি: *যাঁদের সাথে দেখা হয়েছিল* (এম. এন. রায়, ১৯৬৮: ১)। এইসব মানুষের মধ্যে সবার প্রথমেই যাঁর কথা রায় বলতে শুরু করেন, তিনি হচ্ছেন বৃটিশবিরোধী আন্দোলনের, অগ্নিযুগের, অন্যতম কিংবদন্তী অগ্রপথিক শহীদ যতীন মুখার্জি। বইটার শুরুই হয়েছে তাঁর প্রথম যৌবনের সন্ত্রাসবাদের গুরু যতীন মুখার্জিকে সম্পর্কে এ উদ্ধৃতিটা দিয়ে:

> আমরা তাঁকে স্রেফ "দাদা" বলে ডাকতাম; কেননা, "দাদাদের" দেশে এবং "দাদাদের" যুগে, তিনি ছিলেন তুলনারহিত, তাঁর মতোন ছিল না কেউ আর। আধুনিক শিল্পকলায় যেমন, আমাদের শিশুসুলভ রাজনীতিতেও তেমনি, "দাদাবাদ" ছিল যুক্তিবোধ-বিবর্জিত একটা তরিকা। তখন ছিল তোষামোদির ভেজালে মেশানো ভালোবাসা, সন্তগিরির চিনি দিয়ে তৈরি আস্তরণে মোড়ানো হিংসা, বীরপূজার অবিমৃষ্য আদরে পাকাপোক্ত করে তোলা আনুগত্য। কিন্তু দাদাবাদের তরিকায় যতীনদা কোনো নবী ছিলেন না। (এম. এন. রায়, ১৯৬৮: ১)

পরম শ্রদ্ধাভাজন যতীন মুখার্জিকে এম. এন. রায় নিজে "নবী" হিসেবে না দেখলেও খোদ রায়ের ঘনিষ্ট শিষ্য-সহকর্মীরা মানবেন্দ্রনাথ রায়কে "নবী"

হিসেবে দেখতে ছাড়েন নি (ভি. এম. তারকুন্ডে, "নতুন ব্যবস্থার নবী", শিবনারায়ন রায়, ১৯৯৫: ২১৭-২২৩)।

শুধু ভি. এম. তারকুন্ডে-ই নন, রায়ের *নয়া অভিমুখ* গ্রন্থের "প্রাক্কথন" লিখতে গিয়ে তাঁর আরেক ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ও সহলেখক (এম. এন. রায় এবং ফিলিপ স্প্র্যাট, ১৯৪৭) ফিলিপ স্প্র্যাট শুরুই করেছেন এই বাক্য দিয়ে,

> আর কোনো সার্বজনিক মানুষকে আমি চিনি না, সে তিনি প্রায়োগিক রাজনীতিবিদই হোন বা স্রেফ পর্যবেক্ষকই হোন, যিনি এম. এন. রায়ের চেয়ে অধিকতর সুসঙ্গত রকমের সঠিক নবী। (ফিলিপ স্প্র্যাট, "প্রাক্কথন", এম. এন. রায়, ১৯৪৬-ক)

আর এই বাক্যটি খোদ প্রকাশকেরও এতটাই পছন্দ হয়েছে যে প্রকাশক জনাব এস. বলবন্ত সেটিকে বইটির শুরুতে অতি সংক্ষিপ্ত, দু অনুচ্ছেদের, "প্রকাশকের কথা"র শেষ বাক্য হিসেবে জুড়ে দিয়েছিলেন।[৩] এঁরা হয়ত শ্রদ্ধা-ভক্তি-ভালোবাসা-ভারে ভেবেছিলেন এইভাবে তুলে ধরতে পারলেই মানবেন্দ্রের ওপর যথাযথ গুরুত্ব আরোপ করা যাবে। রায়কে নিয়ে কথা বলার সময় এইসব ভক্তি-ভালোবাসা উপেক্ষণীয় নয়।

আমি এখানে 'নবী' শব্দটাকে বা 'নবী'র ধারণাটাকে কটাক্ষ করছি না আদৌ। রাষ্ট্রের শাসকদের বিপরীতে আমি সাধারণভাবে নবীদেরই পক্ষে। এ ব্যাপারে আমি আমার একটি রচনায় কিছু কথাও বলেছি। আগে-পরে আরো নানা কিছু বলার মাধ্যমে যা আমি সেখানে বলার চেষ্টা করেছি তা এ রকম:

> ধর্ম আর শাস্ত্র ... এক জিনিস না। ধর্ম হচ্ছে সমাজের তৈরি করা একটা জিনিস। শাস্ত্র হচ্ছে রাজনীতিওয়ালাদের, নিয়ন্ত্রকদের, পরিচালকদের, কর্তৃত্বের, কর্তৃপক্ষের তৈরি করা বিধিবিধান। আর, আল্লার সঙ্গে, চিরায়ত সত্তার সঙ্গে, সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে, ভগবানের সঙ্গে, মানুষের সম্পর্ক, প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক–এইটা খোলা ...। এখানে কোনো কর্তৃত্ব নাই। আল্লা-ভগবান নিজে এসেও কর্তৃত্ব করেন না। নবী-অবতাররা কেউ কর্তৃত্ব করার জন্য বিখ্যাত না। নবী-অবতাররা সবাই জনগণের অংশ হয়ে ওঠার জন্য বিখ্যাত, জনগণের সাথে স্বাভাবিক, সহজ, সুন্দর সম্পর্ক থাকার জন্য বিখ্যাত। [তাঁরা রাজা নন, শাসক নন–হেদায়েতকারী, সুপথপ্রদর্শনকারী, সত্যপ্রচারকারী।] তাঁরা জনগণেরই সাধারণ মেম্বার হিসেবে গড়ে উঠেছেন, গড়ে ওঠেন। তাঁরা কিন্তু জনগণকে কর্তৃত্ব করে,

[৩] এঁরাই কিন্তু এম. এন. রায়ের প্রায় সব পুনর্মুদ্রণের প্রকাশক। এই অজন্তা প্রকাশনী সম্ভবত রায়ের নয়া মানবতাবাদের ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ মানুষজনেরই প্রতিষ্ঠান।

হুকুম করে এবং সেই হুকুম না-মানলে বলপ্রয়োগ করার মাধ্যমে পরিচালনা করেন নাই। ফলে, গোটা ধর্মের এলাকা, নবী-রসুলের এলাকা, আল্লার-খোদার এলাকা, ভগবান-অবতারের এলাকা–এই এলাকার নেচার এক রকম। এইটা স্বাধীন একটা জায়গা। এখানে মানুষ স্বাধীনভাবে নিজের খেয়াল খুশি নীতি রীতি চিন্তা বিবেক বুদ্ধি যুক্তি বিশ্লেষণ এগুলোর মাধ্যমে প্রকৃতি, মানুষ এবং পরম মানুষ (পরম আত্মা বা পরম ভাব) বা পরম সৃষ্টিকর্তা–এরকম কোনো একটা শক্তির সঙ্গে, বা অনুমানের সঙ্গে, বা ধারণার সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। এর নাম হচ্ছে ধর্ম। [ডুর্খেইম তাঁর এলিমেন্টারি ফর্মস অফ রিলিজিয়াস লাইফ বইয়ে যে আলোচনা হাজির করেছিলেন তার অর্থ প্রকারান্তরে এই-ই দাঁড়ায় যে ধর্মই সমাজ (এমিল ডুর্খেইম, ১৯৬৪)।]" (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১০: ১০)

কী অর্থে আমি সাধারণভাবে নবীদের পক্ষে, এখানে বরং নোম চমস্কির দোহাই দিয়ে সেই কথা আরো একটু স্পষ্ট করে তোলার সুযোগ নিতে চাই। এক সাক্ষাৎকারে চমস্কি বলছিলেন,

অস্পষ্ট একটা হিব্রু শব্দ "নবী"র বেশ খারাপ অনুবাদ হচ্ছে "প্রফেট"। কেউ জানে না এর অর্থ কী। কিন্তু আজকের দিনে হলে তাঁদেরকে হয়ত ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবী বলা হতো। তাঁরা ভূ-রাজনৈতিক বিশ্লেষণ হাজির করতেন, এই মর্মে তর্ক করতেন যে শাসকরা সমাজকে ধ্বংস করে ফেলতে যাচ্ছে। এবং তাঁরা বদমাশ রাজাদের নিন্দা করতেন। তাঁরা ন্যায়বিচারের কথা বলতেন এবং [নিপীড়িত জনসাধারণ–(নোম চমস্কি, ২০০৬)], এতিম, এবং বিধবাদের প্রতি দয়া দেখাতে বলতেন এবং ইতি আদি।

আমি বলতে চাচ্ছি না যে তাঁদের সবকিছুই সুন্দর ছিল। ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীরা সর্বাঙ্গ সুন্দর হন না। আপনি শাখারভ পড়ুন। কখনো কখনো তিনি মর্মাহত করার মতো। অথবা সলঝেনিৎসিন। আর, নবীদের সাথে সেই ব্যবহারই করা হতো, আজকের দিনে ভিন্নমতাবলম্বী বুদ্ধিজীবীদের সাথে যে রকম ব্যবহার করা হয়। তাঁরা প্রশংসিত হতেন না। তাঁদেরকে সম্মান করা হতো না। জেরেমিয়ার মতো তাঁদেরকে জেলে দেওয়া হতো। তাঁদের মরুভূমিতে তাড়িয়ে দেওয়া হতো। তাঁরা ঘৃণিত হতেন। আর, একই কালে, সেখানে বুদ্ধিজীবীরাও ছিলেন, "প্রফেট" যাঁরা, যাঁদের সাথে সদাচরণ করা হতো। তাঁরা ছিলেন রাজদরবারের বিদূষক। শত শত বছর পরে তাঁদেরকে বলা হতো "ভণ্ড প্রফেট"। (নোম চমস্কি, ২০১০)

পরের প্রশ্নের উত্তরে চমস্কি বলেন, শৈশবে এবং এখনও, নবীদের মধ্যে তাঁর প্রিয় ছিলেন আমোস:

> বিশেষ করে আমি পছন্দ করতাম তাঁর [নবী আমোসের] এই কথা যে তিনি বুদ্ধিজীবী ছিলেন না। হিব্রুটা আমার মনে নাই ... "আমি প্রফেট নই, আমি কোনো প্রফেটের সন্তান নই, আমি স্রেফ একজন রাখাল।" তো, তিনি "প্রফেট"-এর সঠিক অনুবাদ করেছিলেন। তিনি বলছেন, "আমি কোনো বুদ্ধিজীবী নই"। তিনি ছিলেন স্রেফ একজন কৃষক এবং তিনি চেয়েছিলেন শুধু সত্যটা বলতে ... (নোম চমস্কি ২০১০)

চমস্কির সূত্র ধরে *লংম্যান ডিকশনারি অফ কনটেম্পোরারি ইংলিশ ডিভিডি-রম* ঘেঁটে দেখলাম, 'প্রফেট' শব্দটা ইংরেজিতে এসেছে আদিতে গ্রীক ও ল্যাটিন হয়ে পুরোনো ফরাসি ভাষা থেকে, ১১০০-১২০০ খ্রিস্টাব্দের দিকে। আদি গ্রীকে এর অর্থ "বলা" শব্দটার সাথে সম্পর্কিত— "টু স্পিক"। এই অর্থে, চমস্কি যেমনটা ইশারা দিলেন, আদিতে, নবী বলতে সত্য কথা যাঁরা বলেন তাঁদেরকেই বোঝাত বলে মনে হয়।

কিন্তু, শিষ্য-সহকর্মী-ভক্তরা যখন মার্কস বা বাকুনিন বা এম. এন. রায়কে 'প্রফেট' বলেন তখন খটকা লাগে, ব্যক্তিপূজার ধূপের গন্ধ পাওয়া যায়। তাই, শুরুতেই প্রসঙ্গটা তুলছি এই মর্মে সতর্ক হওয়ার জন্য যে লিখিত ইতিহাসের অন্তর্গত বড় বড় মানুষদেরকে নিয়ে কথা বলার সময় প্রাণ-সঞ্চারী বিশল্যকরণীর কাছে পৌছানোর চেষ্টা করতে গিয়ে আমাদেরকে তাঁদের নামে নির্মিত নানারকম প্রাণহীন ইমেজের আস্ত একেকটা গন্ধমাদন পর্বত মোকাবেলা করতে হয়।

১.২ এম. এন. রায়: খ্যাতি-পরিচিতি ও কর্মপরিমণ্ডল

অনেকের কাছে অনেক কারণে গুরুত্বপূর্ণ এম. এন. রায়। আমার কাছে তিনি গুরুত্বপূর্ণ মূলত এই কারণে নয় যে তিনি ছিলেন "অনন্য ব্যক্তি" বা "বুদ্ধিবৃত্তিক দৈত্য" বা "মৌলিক আইডিয়ার বিরামহীন উৎস"[৪], কিংবা তিনি "আধুনিক ভারতের প্রথম দার্শনিক"[৫]; কিংবা এই কারণে নয় যে "সমকালীন

[৪] দ্রষ্টব্য: ভি. এম. তারকুন্ডে, "ইনট্রোডাকশান টু দ্য অথর", এম. এন. রায়, ১৯৬০; এম. এন. রায়, ১৯৪৬-ক; এম. এন. রায়, ১৯৪৬-খ; এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক; এম. এন. রায়, ১৯৪৭-খ; এম. এন. রায়, ১৯৪৮; এম. এন. রায়, ১৯৬৮।

[৫] দ্রষ্টব্য: তর্কতীর্থ লক্ষ্মণ শাস্ত্রী যোশী, "আধুনিক ভারতের প্রথম দার্শনিক", শিবনারায়ন রায়, ১৯৯৫: ২০৬-২০৭।

ভারতীয়দের মধ্যে কেউই তার সমকক্ষ ছিলেন না" বা সারা "প্রাচ্যে তার সাথে তুলনীয় কোনো ব্যক্তিত্ব নাই" বা তাঁর ছিল "বিরল বুদ্ধিবৃত্তিক" অবদান বা তিনি "সমকালীন ইতিহাসের বিশালতম কিছু ব্যক্তিত্বের কাঁধে কাঁধ ঘষেছিলেন"[৬]; অথবা এ কারণেও নয় যে তাঁর জীবন ছিল "অনন্য রকমের সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ"[৭]; কিংবা এ জন্যও নয় যে তাঁর ছিল "অগাধ পাণ্ডিত্য ও সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি" অথবা তিনি ছিলেন "আমাদের সময়ের সবচাইতে মৌলিক চিন্তকদের অন্যতম"[৮]; এবং এমন কি এই জন্যও নয় যে ১৯২০ সালে *কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল* পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশিত সেই "ঐতিহাসিক আলোকচিত্রে" কমিন্টার্ন-নেতাদের ঠিক মাঝখানে একদম "খাড়া ও উঁচু হয়ে" দাঁড়িয়েছিলেন এম. এন. রায় এবং "তার ঠিক পরেই ছিলেন জিনোভিয়েভ, গোর্কি ও লেনিন, আর বুখারিন ও রাদেকের মতো অন্যসব নেতৃস্থানীয়রা পেছন থেকে দেখছিলেন", কিংবা এ জন্য নয় যে "কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের ইতিহাসে আর কোনো দিন কোনো অ-ইউরোপীয় লোক এরকম সম্মান ও গুরুত্বের জায়গা পাবেন না"[৯]।

কিন্তু এ কথা তো নির্জলা সত্য— কর্মপরিসর ও অভিজ্ঞতার দিক থেকে বিশাল আয়তনের ব্যক্তিত্ব ছিলেন এম. এন. রায়। তিন তিনটা মহাদেশ জুড়ে বিস্তৃত ডজন খানেক দেশ পটভূমি রচনা করেছে তাঁর বহুবর্ণিল ক্যারিয়ারের: জাতীয়তাবাদ, কমিউনিজম এবং হিউম্যানিজমের মতো তিন তিনটা বিশাল সামাজিক আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় জায়গায় ছিলেন তিনি অবলীলায়, জীবনের বিভিন্ন কালপর্বে (জি. ডি. পারিখ, "ভূমিকা", এম. এন. রায়, ১৯৬৪)। ভারত, মেক্সিকো, চীন, মধ্যপ্রাচ্য, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং পশ্চিম ইউরোপের বিভিন্ন দেশের বিপ্লবী আন্দোলনসমূহে নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রেখেছেন তিনি; গড়ে তুলেছেন ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি এবং মেক্সিকোর কমিউনিস্ট পার্টি; অনর্গল লিখে গেছেন স্প্যানিশ, রুশ, জার্মান, ফরাসি ও ইংরেজি ভাষায় (শিবনারায়ন রায়, "ভূমিকা", এম. এন. রায়, ২০০০)।

রায়ের বিপ্লবী জীবনের সূত্রপাত ঘটে তাঁর ১৮ বছর বয়েসে। ঐ বয়েসে তিনি বাংলার আন্ডারগ্রাউন্ড সন্ত্রাসবাদী দলগুলোর সাথে কাজ শুরু করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় তিনি সমমনা তরুণদের সাথে নিয়ে ভারতের বৃটিশ সরকারকে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করার পরিকল্পনা করেন।

---

[৬] দ্রষ্টব্য: জি. ডি. পারিখ, "ভূমিকা", এম. এন. রায়, ১৯৬৪।
[৭] দ্রষ্টব্য: ভি. বি. বার্নিক, '"প্রিফেস", এম. এন. রায়, ১৯৬৮।
[৮] দ্রষ্টব্য: শিবনারায়ন রায়, "প্রাক্কথন", এম. এন. রায়, ১৯৯৯।
[৯] শিবনারায়ন রায়, "ভূমিকা", এম. এন. রায়, ২০০০।

অভ্যুত্থানটা ব্যর্থ হয় ঠিকই কিন্তু সেই উপলক্ষে তিনি জার্মান অস্ত্রের খোঁজে প্রথমে যান ব্যাটাভিয়া'য় এবং তারপর জাপান, কোরিয়া, চীন, ফিলিপাইন হয়ে পৌঁছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই তিনি ছদ্মনাম গ্রহণ করে 'নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য' থেকে 'মানবেন্দ্রনাথ রায়' হন। পুলিশের হাত থেকে বাঁচার জন্য সারা জীবনে তিনি অন্তত ১২ বার নিজের নাম ও চেহারা বদলেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রেই তাঁর সাথে ইভিলিন ট্রেন্ট-এর সাথে পরিচিত হন এবং বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। যুক্তরাষ্ট্র থেকে তিনি জামিন ভেঙে ইভিলিন সহকারে পালিয়ে যান মেক্সিকোতে। এখানে তিনি স্প্যানিশ শেখেন। স্প্যানিশে লেখালিখি করেন এবং মেক্সিকো প্রেসিডেন্টের সখ্য অর্জন করেন। এখানেই বলতে গেলে তাঁর মার্কসবাদ-অধ্যয়ন গাঢ় হয়ে ওঠে, যার সূত্রপাত ঘটেছিল যুক্তরাষ্ট্রে। এখানেই রুশ দূতাবাসের কর্মকর্তা মিখাইল বরোদিনের সাথে তাঁর যোগাযোগ ঘটে। মেক্সিকোতে কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন রায়। এবং বরোদিনের মাধ্যমে যোগাযোগ হয় তাঁর লেনিনের সাথে।

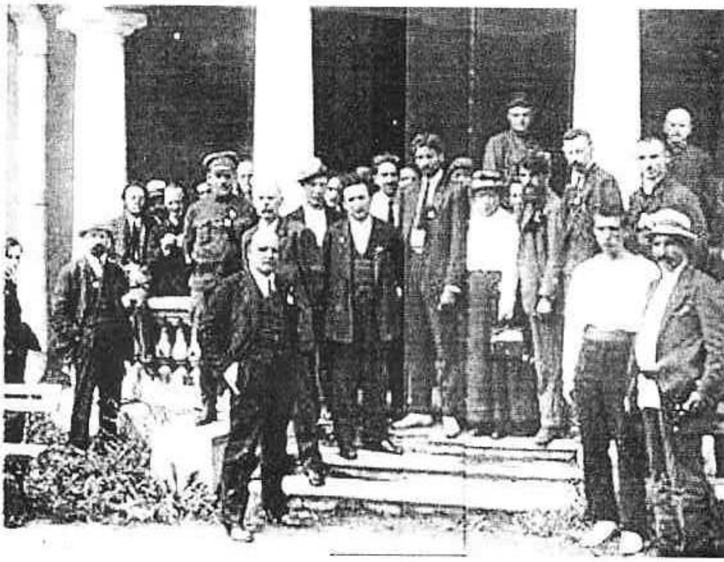
লেনিনের দাঁড় করানো কমিন্টার্ন বা কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের নেতৃত্বে পরিচালিত বিশ্ব বলশেভিক-তরঙ্গের খোদ কেন্দ্রের মানুষ ছিলেন এম. এন. রায়। ১৯২০ থেকে ১৯২৮ কালপর্বে পৌঁছেছিলেন কমিন্টার্ন-হায়ারার্কির সর্বোচ্চ স্তরে। এই পর্বের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাই আমরা শিবনারায়ন রায়ের ("ভূমিকা", এম. এন. রায়, ২০০০) কাছ থেকে। কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসের পরে তুর্কিস্তান ব্যুরোর সেক্রেটারি-ইন-চার্জ করে পাঠানো হয় তাসখন্দে। সেখানে তিনি গঠন করেন ভারতীয় সামরিক স্কুল। এখানেই তিনি প্রশিক্ষণ দেন মোহাজিরদের, গঠন করেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি। তাঁর বিপুল যোগাযোগের ফলে বিরাট ভৌগোলিক দূরত্ব সত্ত্বেও পরবর্তী দুই বছরে তিনি ছোট ছোট কমিউনিস্ট গ্রুপ গড়ে তোলেন কলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, যুক্ত প্রদেশ এবং পাঞ্জাবে। কমিন্টার্ন-প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসেবে তাঁকে পাঠানো হয় চীনের আসন্ন বিপ্লবের কাজে। সেখানকার পরিস্থিতি নিয়ে পরে প্রকাশিত হয় তাঁর বিখ্যাত বই *রেভলিউশন অ্যান্ড কাউন্টার-রেভলিউশন ইন চায়না* (এম. এন. রায়, ১৯৪৬)। ইঙ্গ-মার্কিন-ফরাসী-ডাচ সাম্রাজ্যবাদের উপনিবেশভুক্ত দেশগুলোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রশ্নে এরই মধ্যে কমিন্টার্নের দ্বিতীয় কংগ্রেসে লেনিনের থিসিসের পাশাপাশি গৃহীত ও মুদ্রিত হয়েছে তাঁর রচিত থিসিস: "অরিজিনাল ড্রাফট অফ 'সাপ্লিমেন্টারি থিসিস অন দ্য ন্যাশনাল অ্যান্ড কলোনিয়াল কোশ্চেন' (১৯২০)" (শিবনারায়ন রায়, ১৯৯৫: ৪৩-৪৯)। লেনিনেরই উৎসাহে ১৯২২ সালে প্রকাশিত ও বেশ কটি ভাষায় অনূদিত হয় তাঁর গ্রন্থ *ইন্ডিয়া ইন ট্রানজিশন* (এম. এন. রায়, ১৯২২)। ১৯২৬ সালে কমিন্টার্নের কার্যকরী কমিটির ৬ষ্ঠ প্লেনামে বুখারিন,

জিনোভিয়েভ, স্ট্যালিনের পাশাপাশি তিনি কমিন্টার্ন-প্রেসিডিয়ামের পূর্ণ সদস্য নির্বাচিত হন। নির্বাচিত হন কমিন্টার্ন-সেক্রেটারিয়েট এবং সাংগঠনিক ব্যুরোর সদস্য, ইস্টার্ন কমিশনের চেয়ারম্যান, এবং *কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল* পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য।

এই সুযোগে অল্পকথায় আরো কিছু সাধারণ তথ্যও এখানে টুকে রাখা যেতে পারে। ইতোমধ্যে, ১৯২৬ পরবর্তী সময়ে, রুশ কমিউনিস্ট পার্টিতে স্ট্যালিনের বিভিষীকাপূর্ণ উত্থান শুরু হয়। ১৯২৭ সালে পঞ্চদশ পার্টি-কংগ্রেসের আগে আগে পার্টি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় ট্রটস্কি এবং জিনোভিয়েভকে। তার আগেই জিনোভিয়েভকে কমিন্টার্নের সভাপতি পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই পার্টি-কংগ্রেসেই বহিষ্কার করা হয় লেনিনের সাথে কাজ করা আদি বলশেভিক নেতৃত্বের ৭০ জন নেতাকে, যার মধ্যে ছিলেন রাদেক, কামেনেভ প্রমুখ। তার ক দিন পরই রাশিয়া থেকে বের করে দেওয়া হয় ট্রটস্কিকে। ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত হয় কমিন্টার্নের ষষ্ঠ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে স্ট্যালিনের সাথে দূরত্ব তৈরি হয় রায়েরও। স্ট্যালিন-নীতির বিরোধিতা করায় রায়কে এক প্রকার অন্তরীণ করে ফেলা হয় স্ট্যালিনের নির্দেশে। এ সময় আরো ক্ষমতাশূন্য করা হয় বুখারিনের মতো নেতাকে। তারই মধ্যে, বুখারিনেরই সহায়তায় বলতে গেলে রাশিয়া থেকে এক প্রকার পালিয়ে বাঁচেন এম. এন. রায়। গিয়ে ওঠেন তিনি জার্মানিতে তাঁর কমিউনিস্ট বন্ধুদের কাছে। ততদিনে সেখানে তাঁর বন্ধুরা গড়ে তুলেছেন 'কমিউনিস্ট অপোজিশন'। এঁদের পত্রিকায় রায় জার্মান ভাষায় লিখতে শুরু করেন এই সব পরিস্থিতি নিয়ে। অনেক অনেক পরে এই রচনাগুলো জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে *রাশান রেভলিউশন অ্যান্ড দ্য ট্র্যাজেডি অফ কমিউনিজম* নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশ করেন শিবনারায়ন রায় (এম. এন. রায়, ২০০০)। শৃঙ্খলা ভঙ্গ করে এই রচনাগুলো প্রকাশের অজুহাতেই তাঁকে শেষ পর্যন্ত বহিষ্কার করা হয় কমিন্টার্ন থেকে, ১৯২৯ সালে (শিবনারায়ন রায়, "ভূমিকা", এম. এন. রায়, ২০০০)।

রায় এরপর ভারতে ফিরে আসেন ১৯৩০ সালের শেষ দিকে। মাস ছয়েকের মাথায় গ্রেপ্তার হন ১৯২৪ সালের কানপুর ষড়যন্ত্র মামলায়। জেল খাটেন ছয় বছর। বের হয়ে যোগ দেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে। পরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের ভূমিকার প্রশ্নে মতপার্থক্যের কারণে কংগ্রেস ছেড়ে বের হয়ে আসেন ১৯৪০ সালে। গঠন করেন র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি। ১৯৪৩ সালে রচনা করেন "ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নে জনগণের পরিকল্পনা"। ১৯৪৪ সালে প্রণয়ন করেন ভবিষ্যতের "স্বাধীন ভারতের খসড়া সংবিধান"। যুদ্ধের শেষে তিনি মার্কসবাদ ও কমিউনিজম সম্পর্কে তাঁর

পর্যালোচনা প্রণয়নে এবং নিজের রাজনৈতিক-দার্শনিক ধ্যানধারণা গুছিয়ে আনার কাজে মন দেন। নিজেদের পার্টি-কংগ্রেসে অনুমোদিত হয়ে "র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির নীতিমালা" হিসেবে "২২টি থিসিস" প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালে। এই নীতিমালারই বিস্তারিত বিকাশ ঘটে তাঁর নয়া মানবতাবাদের ইশতেহার নামক রচনায় ১৯৪৭ সালে (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক)। এটিও তাঁর পার্টির দলিল হিসেবে অনুমোদিত হয়েই প্রণীত ও প্রকাশিত হয়। ১৯৪৮ সালের পার্টি-কংগ্রেস এই উপলব্ধিতে পৌছায় যে গণতন্ত্রের ধারণার সাথে পার্টি-রাজনীতি সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এ থেকে আসে খোদ র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টি বিলুপ্ত করার সিদ্ধান্ত। সেই সাথে সূচনা র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট মুভমেন্টের। (ভি. এম. তারকুন্ডে, "ইনট্রোডাকশান টু দ্য অথর", এম. এন. রায়, ১৯৪৬-ক)



মস্কোতে ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনালের দ্বিতীয় কংগ্রেসে এম. এন. রায়। ১৯২০ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল পত্রিকার তৃতীয় বর্ষের ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রকাশিত এই সেই "ঐতিহাসিক আলোকচিত্র"। কমিন্টার্ন-নেতাদের ঠিক মাঝখানে একদম "খাড়া ও উঁচু হয়ে" দাঁড়িয়ে আছেন এম. এন. রায় এবং "তার ঠিক পরেই দাঁড়ানো জিনোভিয়েভ, গোর্কি ও লেনিন; আর বুখারিন ও রাদেকের মতো অন্যসব নেতৃস্থানীয়রা পেছন থেকে দেখছিলেন"। (শিবনারায়ন রায়, "ভূমিকা", এম. এন. রায়, ২০০০।) [ছবি: mnroyhumanist.tri pod.com/photogallery/index.htm থেকে সংগৃহীত]

১.৩ এম. এন. রায়ের অপরিচিতি ও জনমত-নিয়ন্ত্রণ-প্রকৌশল

বিশাল এই আন্তর্জাতিক প্রোফাইল সত্ত্বেও, রায়ের ভক্তকূল যেভাবে তাঁকে 'প্রফেট' হিসেবে বিবেচনা করেন, আমি তা করি না। তাঁকে আমি স্রেফ একটা মানুষ হিসেবে দেখি। আমারই মতো, আপনাদের মতো, মানুষ। বিশেষত তার জায়গায় আমাকে, আমার জায়গায় তাঁকে বসিয়ে যদি মেলাতে না পারি, তাহলে তো তাঁকে আমি বুঝব না। কেউ যদি সত্যি 'মহাপুরুষ' হয়ে থাকেন, তাহলে আমার-আপনার মতো আম-পাবলিক, আম-নারীপুরুষ, তাঁকে কোনো দিনই বুঝবে না। বোধগম্যতার ঊর্ধ্বে থেকে যাবেন তিনি। এমন কি মহাপুরুষেরাও আদতে আপনার-আমার মতো মানুষ বলেই চাইলে মানুষ তাঁদেরকে ঠিকই উপলব্ধি করতে পারে। পরবর্তী সময়ে তাঁদের যে মহাপ্রতিমা বানিয়ে তোলা হয় (সত্যজিতের হীরক রাজার 'অতিকায় মূর্তি নির্মাণ' বা ভাবমূর্তি নির্মাণ করার মতো করে), কিংবা কাউকে কাউকে যে এম. এন. রায়ের মতোই প্রতিদিনের ইতিহাস থেকে গায়েব করে দিয়ে ইতিহাসের আর্কাইভে পাঠিয়ে দেওয়া হয়— তার রাজনীতি, তথা "দীক্ষায়ন-প্রকৌশল" আলাদা। ("দীক্ষায়ন-প্রকৌশল" নামক ধারণাটির জন্য দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৩-খ)

হ্যাঁ, আজকের পরিপ্রেক্ষিতে এম. এন. রায় আমাদের এতটাই 'দূরবর্তী', এতটাই 'অপরিচিত' হয়ে পড়েছেন যে এখন তাঁর 'পরিচয়' তুলে ধরার অবকাশ ঘটছে। তাঁকে নিয়ে কোনো চর্চা এখন আর একেবারেই আমাদের চোখে পড়ে না। অনেক কাল ধরেই তিনি যেন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেন আমাদের দেশের পুরো বিদ্বৎসভা থেকেই। আমরা যারা লেখাপড়া সম্পর্কে সামান্য টুকটাক খোঁজখবর রাখি তারাও রায় সম্পর্কে, বলতে গেলে, ভাসা ভাসা কিছু শোনা কথা ছাড়া কিছুই জানি না। শুনতে যেমনই লাগুক, বাস্তবতা এটাই। তাঁর সম্পর্কে আজ এখানে প্রবন্ধ উপস্থাপন করতে আমি রাজিই হয়েছি এই লোভে যে এই সুযোগে তাঁর সাথে আমার এক প্রকার প্রাথমিক পরিচয়ের সুযোগ ঘটবে, অল্প খানিকটা হলেও পরিতৃপ্তি ঘটবে তাঁর সম্পর্কে জানার দীর্ঘদিনের কৌতূহলের। (এমনই আমাদের দুরবস্থা।) কিন্তু, এম. এন. রায় আমাদের এতটা দূরবর্তী, এতটা অপরিচিত হয়ে উঠলেন কেমন করে? এ কথা অস্বীকার করার কোনো উপায় তো নেই যে আমাদের চিন্তার এবং পরিবর্তন-তৎপরতার ইতিহাসে রায় একটা বিরাট ঘটনা, রীতিমতো একটা ফেনোমেনন। ১৯৫৪ সালে রায়ের মৃত্যুর পর খুবই বেশি সময় কি পার হয়ে গেছে? সমকালীন রাজনৈতিক বাক্‌ধারায় তিনি প্রায় 'নিশ্চিহ্ন' হয়ে গেলেন কীভাবে?

আসলে আমাদের আজকের সমাজে কর্তৃত্বপরায়নতার এমনই রমরমা, এমন কি ভাবনাচিন্তা, বুদ্ধিবৃত্তি ও সংস্কৃতিচর্চার ক্ষেত্রেও দলীয় আনুগত্য-বিনিময়ী পুরস্কার-প্রথার এমনই বাড়, বৈষয়িক লাভালাভ ও নগদ প্রাপ্তির প্রণোদনা এমনই প্রখর, এবং স্বাধীন চিন্তা-জিজ্ঞাসা-অনুসন্ধিৎসা এমনই অপ্রচল যে এ রকম একটা সমাজের সুযোগসন্ধানী, পুরস্কারগন্ধী লেখক-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীবৃন্দের কাছে এম. এন. রায় নিতান্তই অপ্রাসঙ্গিক। আজকের সিংহভাগ সভা-সমিতি-অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের পরিচালকদের, সেসবের নানা খেতাবধারী-ডিগ্রিধারী-ডিলিটধারী প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, সভাপতিদের চেহারা স্মরণ করলে বুঝতে মোটেই অসুবিধা হয় না, কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার এই সব সেবায়েতদের পক্ষে কেন এম. এন. রায়ের কাছে পৌঁছানোটা ব্যক্তিগত কারণেই মুশকিলের। যাবতীয় রঙ্গমঞ্চে তাই তিনি 'অদৃশ্য'। উপরন্তু, তাঁকে নিয়ে রাজনীতি করার তো উপায়ই নেই, কারণ তিনি যাবতীয় কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত একজন ব্যক্তি, ব্যক্তির প্রশ্নাতীত স্বাধীনতা যার সারাজীবনের আরাধ্য। গৃহপালিত গবাদিপশুর মতো পাল বেঁধে চলা সমূহের কাছে তাই তিনি অপরিচিত।

আর, এ কথাও খেয়াল না করার তো রাস্তা নেই যে এই যে এত গাদা গাদা কথা-বাক্য-কাগজ উৎপাদিত হয়ে চলেছে প্রতিদিন, দশকের পর দশক জুড়ে, তার মধ্যে ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ে, বলতে গেলে, কোনো কথাই নেই। মিথ্যা-মিথ্যা করে, লোক দেখানোর লোক শোনানোর জন্য হলেও, কেউ ব্যক্তির স্বাধীনতা নিয়ে কোনো বস্তু রচনা করেন না। 'ব্যক্তির স্বাধীনতা' এতটাই সত্য একটা ধারণা যে এ নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে কথা বলা যায় না। যে প্রকারেই হোক, ব্যক্তির স্বাধীনতার কথা উঠে এলে হয় কথক নয়ত শ্রোতা রীতিমতো বিড়ম্বনায় পড়ে যান, উশখুশ করতে থাকেন। ফলে, ব্যক্তির স্বাধীনতা যে নিতান্তই একটা বিপজ্জনক ধারণা, কর্তৃত্ববিরোধিতা যে স্রেফ একটা বাজে কথা, তর্কাতীত দায়দায়িত্ব-নিয়মকানুন-আনুগত্যই যে সামাজিক শান্তির শেকড়, সে কথাটাই যেন প্রশ্নাতীত একটা পাঁকুড় গাছ, শতবর্ষ ধরে রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে তারই শুধু টিকে থাকার কথা।

এমনই গোলামির গণতন্ত্র আজকাল প্রতিষ্ঠা পেয়েছে যে স্রেফ 'কথা' হিসেবেও ব্যক্তির স্বাধীনতা যেন একটা অতিশয় ভয়ঙ্কর ঘটনা। এমনিতে বাংলাদেশের মুক্তি-যুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিয়ে বাক্যফুলঝুরির শেষ নেই— এ মরার দেশে আজ স্বাধীনতা বলতে বুদ্ধিজীবীরা সমষ্টির স্বাধীনতাই বোঝেন। সুতরাং, ব্যক্তিগত অনুভবে স্বাধীনতা-স্পৃহাসম্পন্ন কবি-লেখক-সাহিত্যিক এ বঙ্গে আজ বিরল। সুতরাং, এখানে ডজন ডজন লোক বছর বছর স্বাধীনতা-পদক পাবেন, কিন্তু প্রতিষ্ঠিত প্রাণীদের মধ্যে কোথাও কোনো স্বাধীনতাপিপাসু

পণ্ডিতকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। এমন কি এম. এন. রায়ের অন্যতম সহযোগী শিবনারায়ন রায়ের 'জিজ্ঞাসা' পত্রিকার বিতরণকারীরাও মূর্খ মার্কসবাদের চর্চা করেছেন জিজ্ঞাসারহিত পদ্ধতিতে।

আসলে, যতদিন এ দেশে লিবারাল-পুঁজিবাদী প্রেস-পত্রিকা-প্রকাশনা-পদক-পুরস্কার-সংস্কৃতি ছিল না, যত দিন এ দেশে সুধীসমাজ বলতে কেবল বলশেভিক-বামপন্থাকে বোঝাতো, প্রায় যাবতীয় সভা-সাহিত্য-সেমিনার-বাক্যগিরির চর্চা বামপন্থীদের হাতে ছিল, ততদিন এঁরা সকলেই 'মার্কসবাদ জিন্দাবাদ' করেছেন; তারপর ক্ষমতার গণেশ উল্টে 'লিবারাল' চেহারায় আবির্ভূত হওয়ার পর এঁরাও সব লিবারাল হয়ে গেছেন। সত্যিকার অর্থে এঁরা কেউ মার্কসবাদীও নন, লিবারালও নন, র‍্যাডিক্যালও নন— এঁরা স্রেফ অভিনেতা, পরিস্থিতি মোতাবেক রোল প্লে করেন। এঁরা সব 'জাতীয়তাবাদ' 'গণতন্ত্র' 'সমাজতন্ত্র' 'প্রগতি' 'বিজ্ঞান' 'যুক্তিবাদ' 'আধুনিকতা' ইত্যাদি নাম-বুলি আউড়ে চলেন। স্রেফ খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিষ্ঠাই এঁদের অভিনয়-প্রতিভার, কথা-সাহিত্যের মূল বিকাশ-প্রেরণা। এই হচ্ছে আরেক কারণ, যে-কারণে এম. এন. রায় এই যুগের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। নিজের গগণচুম্বী আন্তর্জাতিক খ্যাতি-ক্ষমতা-প্রতিপত্তির পায়ে নিজের হাতে কুড়াল মারার নাম এম. এন. রায়। চিন্তাহীন গতানুগতিকতার নামতাপড়া নামবাগিশদের প্রতিনিধিরা রায়কে এমন কি ক্ষুদ্রস্বার্থেও ব্যবহার করতে সক্ষম হবেন কীভাবে? রায় তো একাধারে পুঁজি-লিবারাল এবং মার্কসীয় লিবারাল চিন্তা-চর্চার ধারাসমূহকে খারিজ করে দিয়েই র‍্যাডিক্যাল রায় হয়েছেন। এই দুই প্রকার পুরনো লিবারাল এবং তার সাথে ইদানিংকার নিওলিবারালদেরই জয়জয়কার এখনকার শাসক-এলিট-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। সুতরাং, এম. এন. রায়কে এঁরা পাঠ করবেন কোন প্রসঙ্গে? যুগবিরুদ্ধ সত্য অনুসন্ধান, উপলব্ধি ও উচ্চারণের অপর নাম এম. এন. রায়। কাজেই, ঘরের বাইরে ক্ষমতা-প্রতিকূল সত্য উচ্চারণের রেকর্ড যাঁদের শূন্য থেকে শুরু করে নিচের দিকে, রায়কে তাঁরা রক্ষা করবেন কোন রাস্তায়? সুযোগসুবিধা অনুসারে এঁরা স্নান করেন জাতীয়তাবাদের জলে, পানাহার করেন মার্কসীয় লিবারালদের রেস্তোরাঁয়, ঘুমান লিবারাল-নিওলিবারালদের সরাইখানায়।

কিন্তু কোনো এক একাত্তরে কোনো একজন অধ্যাপক হবিবুর রহমান পৃথিবীর এক কোনার এই রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাটিতে এম. এন. রায়ের যে চিন্তাবীজ বপন করে নিজের রক্তেই সিক্ত করে রেখে গিয়েছিলেন, তুমুল প্রতিকূল আবহাওয়ায় আজ তা অঙ্কুরিত হতে শুরু করেছে। বলার আজ দিন এসেছে: এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি গর্বিত, কারণ একজন হবিবুর রহমানও এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ছিলেন। একই সাথে এই

বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হিসেবে আমি লজ্জিতও বটে, কেননা হবিবুর রহমানের নামে এই বিশ্ববিদ্যালয় আজ পরিচিত নয়। যাঁদের নামে এটা আজ পরিচিত, মহাবিখ্যাত সেইসব লেখক-বুদ্ধিজীবী-প্রফেসর-প্রশাসকগণ নিরন্তর নানাবিধ পুরস্কার পাওয়ার অধ্যয়নে জর্জরিত। রাষ্ট্রীয় আমলাতন্ত্র এবং নিওলিবারাল বাজারের কাছ থেকে এক দিকে এঁরা এত এত পদক-পুরস্কার পান, অন্য দিকে সমকালীন পটভূমি থেকে আপাত অর্থে মুছে যেতে থাকেন মহাকালের পুরস্কারপ্রাপ্ত এম. এন. রায়।

রায়ের অদৃশ্য হয়ে যেতে থাকার এই প্রক্রিয়াটি সেই ১৯৪৬ সালেই খেয়াল করেছিলেন তাঁর অন্যতম ঘনিষ্ঠ সহকর্মী, কমিন্টার্নের পক্ষ থেকে ১৯২৬ সালে ভারতে প্রেরিত কমিউনিস্ট সংগঠক, পরবর্তী সময়ে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নেতা, ফিলিপ স্প্র্যাট। ভারতের মতো বীরপূজার একটি দেশে এম. এন. রায়ের মতো একজন বীরের পক্ষে জনপ্রিয় প্রতিমা হয়ে না-ওঠাটা তাঁকে আশ্চর্য করেছিল। "জনজীবনের সামনের ভাগে যাঁর থাকার কথা সে রকম একজন মানুষকে উপেক্ষা করার ষড়যন্ত্রে"র পেছনে তিনি "সুনির্দিষ্টভাবে সেই সমস্ত লোকের" হাত টের পেয়েছিলেন, যাঁরা "ভারতের জনমত নিয়ন্ত্রণ করেন"। (ফিলিপ স্প্র্যাট, "প্রাক্কথন", এম. এন. রায়, ১৯৪৬-ক)

১.৪ রায়-নিউটনের সাদৃশ্য: কর্তৃত্ব-তন্ত্র থেকে মুক্তিপন্থার দিকে

আজকের বাংলাদেশের জনমত-নিয়ন্ত্রণকারীদের সম্পূর্ণ প্রতিকূলে, আদতে রায় সম্পর্কে পরিপূর্ণ অজ্ঞ অবস্থায়, আমি যে তাঁকে নিয়ে এরকম একটা অনুষ্ঠানে কথা বলতে রাজি হয়েছি সেটা কোন আকূল আগ্রহের কারণে? আগ্রহের কারণ ব্যক্তিগত; রায়ের সাথে আমার মিলপ্রসূত। পৃথক পৃথক ঐতিহাসিক পরিস্থিতি-পর্ব, অবস্থানগত ফারাক এবং ব্যক্তিক সক্ষমতার নানান স্তর আমাদের দুজনের মধ্যে অতুলনীয় পার্থক্য রচনা করে রাখলেও বাংলাদেশের একটি বলশেভিক-পরিবারে আমার জন্ম অবধি পরবর্তী বছর তিরিশেকের স্বাধীনতা-স্পৃহাজনিত ঈমান-তৎপরতা-অনুসন্ধানের সরণ-প্রতিসরণগত পরিভ্রমণ-পরিক্রমা রায়ের সাথে আমার অন্তর্গত মিলের একটি জায়গা দাঁড় করায়। মিলটি একজন ব্যক্তির ক্রমাগতভাবে 'বৃন্দ থেকে ব্যক্তি হয়ে ওঠার'[১৩] এবং তারপর ব্যক্তির মধ্যে জগতসত্তাকে ধারণ করার

---

[১৩] উদ্ধৃতিচিহ্নের ভেতরকার শব্দগুলো কথাসাহিত্যিক-ডাক্তার-শিক্ষক জনাব মামুন হুসাইনের মুখ থেকে আত্মসাৎ করা। রাজশাহী মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের আউটডোরে অসুখ-বিসুখের উসিলায় তাঁর সাথে পাওয়া আড্ডার বিরল সুযোগের

প্রক্রিয়াগত জায়গায়। আমার নিজের ক্ষেত্রে সেই পরিভ্রমণের বৃত্তান্ত এখানে নিতান্ত অনুল্লেখযোগ্য এবং অবান্তর, কিন্তু এই প্রশ্ন আমার কাছে মোটেও অপ্রাসঙ্গিক নয় যে যেসমস্ত অভিজ্ঞতা এবং উপলব্ধি থেকে আমি আমার শৈশবের কর্তৃত্বপরায়ন পরিমণ্ডল ছেড়ে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের 'দীক্ষা' গ্রহণ করি, দীর্ঘদিনের টানাপোড়েনে ক্ষতবিক্ষত হতে হতে শেষ পর্যন্ত তাকে পরিত্যাগ করে মুক্তিপরায়ন অনুসন্ধিৎসার অন্ধকার পথে তিল তিল করে হাঁটতে হাঁটতে শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন একটি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গিগত অবস্থানে এসে সামান্য বিশ্রামের অবকাশ পাই, তার সাথে কি এম. এন. রায়ের অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধিসমূহের কোনো সাদৃশ্য আছে? কোন উপলব্ধি থেকে তিনি মার্কসবাদ-লেনিনবাদকে অতিক্রম করে গেলেন? তারপর পৌছালেন কোথায়? এই কৌতূহল থেকে আমার রায়-অভিযাত্রা শুরু করে আমি একটি সুনির্দিষ্ট উপসংহারেও পৌছাতে পারি বৈকি।

মানবেন্দ্রনাথ রায় তাঁর পরিণত যৌবনে ছিলেন বলশেভিক বিপ্লব এবং মার্কসীয় অনুশীলনের — তার মানে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের — রীতিমতো উত্তম প্রতিনিধি। রূপকথার মতো উজ্জ্বল কমিউনিস্ট-ক্যারিয়ার থাকা সত্ত্বেও বাস্তবজীবনের পোড়খাওয়া অভিজ্ঞতার উদ্ভাসনায় তিনি যে গভীর-কঠোর উপলব্ধি ও তপস্যার সাথে মার্কসবাদী-লেনিনবাদী কর্তৃত্বপরায়নতাকে পরিত্যাগ করে আসলেন, এবং সেখান থেকে সুনিশ্চিতভাবে যে তিনি মুক্তিপরায়ন চিন্তাধারার দিকে ধীর পরিক্রমায় অগ্রসর হতে শুরু করলেন, এবং ক্রমাগতভাবে শেষ পর্যন্ত এক দিকে ইউরোপীয় রেনেসাঁ তথা ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ আর অন্য দিকে ইউরোপীয় সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে উৎসারিত মুক্তিপরায়ন-নৈরাজ্যবাদী চিন্তনের অতি-নিকট সাযুজ্য পর্যন্ত পৌছালেন, তার তাৎপর্য নিতান্তই সীমাহীন। এখানেই আমার কাছে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের গুরুত্ব, এবং এই প্রসঙ্গটাই আজকে আমার আলোচনার মূল উপজীব্য।

১.৫ র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমে এম. এন. রায়ের মুক্তিপরায়নতা

একই সাথে বলে রাখা দরকার, ১৯৭৪ সালের *শহীদ হবিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থে* র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের যে পটভূমি তুলে ধরা হয়েছিল তাতে এর মানবতাবাদী পটভূমি বেশ খানিকটা ফুটে উঠেছিল বটে, কিন্তু প্রায় উপেক্ষিত থেকে গেছিল এর র‍্যাডিক্যাল পটভূমিটি (আলী আনোয়ার, ১৯৭৪;

কোনো এক ক্ষণে তাঁর উচ্চারণ করা এইসব শব্দ আমার মাথা থেকে কিছুতেই আর সরে যায় নি।

শহীদ ইকবাল, ২০১১-র অন্তর্ভুক্ত)। র‍্যাডিক্যাল সেই দিকটাতে আমার মতো করে আলোকসম্পাত করাও আজকের এই প্রবন্ধের আনুষঙ্গিক কাজ।

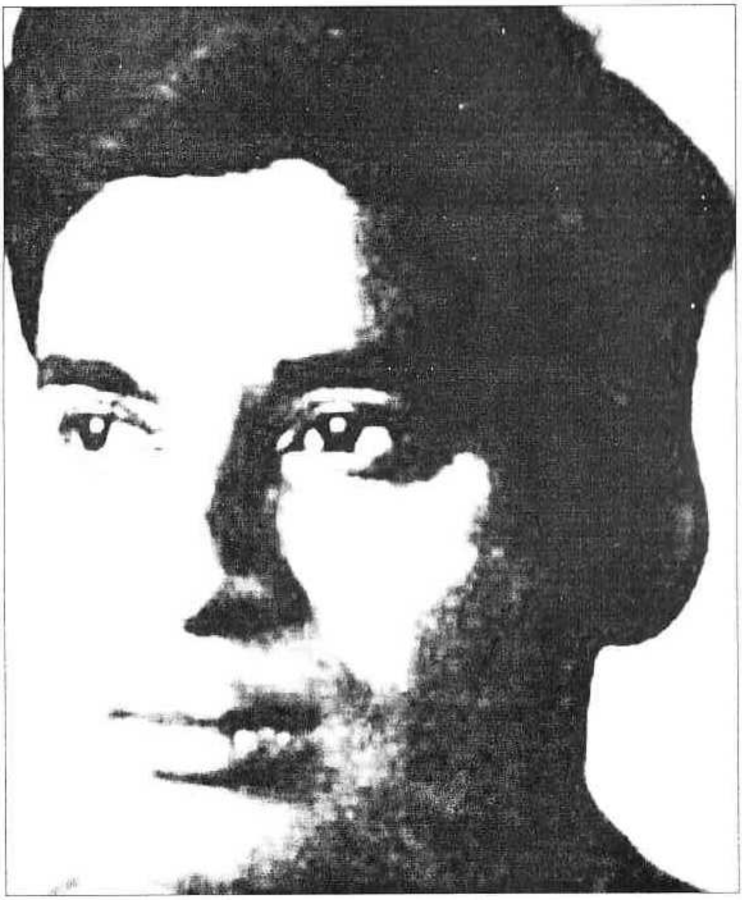
রায়কে নিয়ে কথা বলতে গিয়ে আমার "মুক্তিপরায়ন", "কর্তৃত্বপরায়ন" জাতীয় নৈরাজ্যবাদী শব্দচয়নকে যাঁরা সংকীর্ণ উদ্দেশ্য দ্বারা প্রণোদিত বলে ভাবছেন, অন্তত আত্মপক্ষ সমর্থনের দায়ে হলেও, তাঁদের কাছে আমি দোহাই পাড়ব অধ্যাপক অম্লান দত্তের। অর্থনীতিবিদ ও শিক্ষাবিদ, প্রথমে উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং পরে শান্তিনিকেতনস্থ বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার অন্যতম স্বাধীন অনুসারী, অম্লান দত্তও, আমার বিবেচনায় অত্যন্ত সঠিকভাবে, মানবেন্দ্রনাথকে স্থাপন করেছেন "মুক্তিপরায়ন" ধারায়, এবং সেটা সুনির্দিষ্টভাবে "কর্তৃত্বপরায়ন ঐতিহ্যের বিপরীতে"ই বটে। তাঁর মতে, রায় "তাঁর নিজের দেশে, এমন কি তাঁর তরুণ বয়স থেকেই, জানতেন কর্তৃত্বপরায়ন ঐতিহ্য কাকে বলে"।

অম্লান দত্তের মতে, নিয়তিবাদের কাছে এবং উচ্চবর্ণের লোকজনের কাছে ভারতবর্ষের মানুষের আত্মসমর্পনের যে চিত্র মানবেন্দ্র আজীবন দেখেছেন, তা তাঁর মনে "কর্তৃত্বপরায়নতার প্রতি এক প্রকার বিরোধিতার জন্ম দিয়েছিল, যা সময়-পরিক্রমার সাথে সাথে আরো পরিপক্ক হয়ে ওঠার অপেক্ষায় ছিল মাত্র"; এবং অম্লানের সিদ্ধান্ত: "কমিউনিজমের সাথে তাঁর চূড়ান্ত বিচ্ছেদ এসে হাজির হয়েছিল তাঁর কর্তৃত্বপরায়নতা-বিরোধিতার আবশ্যিক পরিণাম হিসেবে" (অম্লান দত্ত, "এক যুক্তিবাদী মুক্তিপরায়ন", শিবনারায়ন রায়, ১৯৯৫: ২২৫)।

তো, বিশেষত আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নিরিখে "কর্তৃত্বপরায়ন ঐতিহ্যের বিপরীতে" মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্যটিকে প্রথমে খানিক চিনে নেওয়া দরকার। তাহলে আমরা বিশেষত মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্র তথা নৈরাজ্যবাদের চিন্তাধারার প্রেক্ষাপটে এম. এন. রায়ের অবস্থানটিকে একটু ভালো বুঝে নিতে পারব।

দ্বিতীয় পাঠ

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে মার্কসীয় কর্তৃত্বপরায়ন ও নৈরাজ্যবাদী মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্য



চীন থেকে ফিরে মস্কো আসার পর এম. এন. রায়। ১৯২৭। রাশিয়ায় এই দফায় প্রত্যাবর্তনের পর পার্টি-সম্পাদক স্তালিন তাঁকে নানাভাবে ফাঁসানোর চেষ্টা করেন।



দ্বিতীয় পাঠ

আন্তর্জাতিক সমাজতন্ত্রে মার্কসীয় কর্তৃত্বপরায়ন ও নৈরাজ্যবাদী মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্য[১১]

নিপীড়িত ও শোষিত মানুষের নামে, এবং উৎপাদনের হাতিয়ারের ওপরকার ব্যক্তিগত মালিকানা অবসানের নামে, রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করলেই স্বাধীনতা স্রেফ আপনা-আপনি চলে আসে না। (এম. এন. রায় ১৯৪৭-ক: ৫৫)

২.১ প্রথম আন্তর্জাতিকের রাষ্ট্রতর্ক

১৮৬৪ সালে গড়ে ওঠা প্রথম ইন্টারন্যাশনালের ভেতরেই আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, কার্ল মার্ক্সের সঙ্গে মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রীদের ব্যাপক মতাদর্শিক লড়াই-সংগ্রাম হচ্ছে (হুডল্ফ হকার, ১৯৩৮)। ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, স্পেন, বেলজিয়াম, ইতালি, পর্তুগাল প্রভৃতি ল্যাটিন দেশের শ্রমিক-আন্দোলন ছিল প্রথম আন্তর্জাতিকের মূল ঘাঁটি (এর প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় সুইজারল্যান্ডের জেনেভায়)। এসব দেশে মুক্তিপরায়ন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা ও তৎপরতার ধারা ছিল অত্যন্ত প্রবল। এর বাইরে জার্মানি ও ইংল্যান্ডের শ্রমিক-আন্দোলনে ছিল মূলত মার্কস-এঙ্গেলসদের সোশ্যাল ডেমোক্রেসির ধারা। সুইজারল্যান্ডের জেম্‌স্ গুইলম, রাশিয়ার মিখাইল বাকুনিন, বেলজিয়ামের অধ্যাপক ড. ইউজিন হিন্স প্রমুখের মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রী ধ্যান-ধারণা প্রথম আন্তর্জাতিকের ভেতরে মার্কসীয় রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রবল স্রোতোধারা গড়ে তুলেছিল। গুইলম বাকুনিনের সাথে পরিচয়ের আগে থেকেই নৈরাজ্যবাদী হয়ে উঠেছিলেন। সেই আমলে যৌথ-মালিকানা-পন্থী, মিউচুয়ালিস্ট প্রভৃতি নামে

[১১] পরবর্তী অধ্যায়ের প্রথম চারটি অনুচ্ছেদ আমার একটি অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৭-ক) নানান জায়গা থেকে প্রায় হুবহু ব্যবহার করেছি উদ্ধৃতিচিহ্ন ব্যতিরেকেই।

পরিচিত মুক্তিপরায়ন নৈরাজ্যবাদী ধারাটি শুরু থেকেই কথা তুলেছিল রাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে।

তো, প্রথম আন্তর্জাতিকে রাষ্ট্র-তর্কটা ছিল কী নিয়ে? মার্ক্স-এঙ্গেলসরা বলছিলেন, বিপ্লবের পরেও রাষ্ট্র থাকতে হবে নির্দিষ্ট একটা সময় পর্যন্ত— "যেসব সামাজিক শর্ত-পরিস্থিতি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে সেইসব শর্ত-পরিস্থিতিকে ধ্বংস" না করা পর্যন্ত। বিপ্লবের পর প্রথম ধাক্কাতেই রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করে দেওয়ার নৈরাজ্যিক দাবিতে তাঁরা এতই বিরক্ত হয়েছিলেন যে এমন কথা পর্যন্ত বলেছিলেন: "এইসব ভদ্রলোকেরা কি আদৌ কোনোদিন বিপ্লব দেখেছেন?" আচ্ছা, এর চেয়ে বরং খোদ এঙ্গেলসকেই এখানে একটু উদ্ধার করে রাখি:

> কেন কর্তৃত্ববিরোধীরা রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তথা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে চিল্লানোর মধ্যে নিজেদেরকে পরিসীমিত করে রাখেন? সমস্ত সমাজতন্ত্রীরাই একমত যে রাজনৈতিক রাষ্ট্র, আর তার সাথে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সামনের সামাজিক বিপ্লবের পরিণামে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। অর্থাৎ, ঐ সমস্ত জনকর্ম তাদের রাজনৈতিক চরিত্র হারাবে এবং রূপান্তরিত হবে স্রেফ সমাজের সত্যিকারের স্বার্থ দেখাশোনা করার পরিচালনা-ব্যবস্থাপনাগত কার্যক্রমে। কিন্তু কর্তৃত্ববিরোধীরা দাবি করেন যে রাজনৈতিক রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করতে হবে এক ধাক্কায়— এমনকি যেসব সামাজিক শর্ত-পরিস্থিতি থেকে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে সেইসব শর্ত-পরিস্থিতিকে ধ্বংস করারও আগে। তাঁদের দাবি হলো, সামাজিক বিপ্লবের একেবারে প্রথম কাজটাই হবে কর্তৃত্বের বিলুপ্তি। এইসব ভদ্রলোকেরা কি আদৌ কোনোদিন বিপ্লব দেখেছেন? যা কিছু আছে, তার মধ্যে সবচাইতে সুনিশ্চিত রকমের কর্তৃত্বপরায়ন জিনিসটাই হচ্ছে বিপ্লব ... (ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, ১৮৭২)।

ভেবে দেখুন মার্কসবাদীদের বিপ্লব সংক্রান্ত ধারণাটা— খোদ বিপ্লবটাই নাকি "সবচাইতে সুনিশ্চিত রকমের কর্তৃত্বপরায়ন" একটা কাজ! এবং সেই "কর্তৃত্বপরায়ন জিনিসটাই" নাকি পরে আপনাআপনি ভালো হয়ে যাবে, মুক্তিপরায়ন হয়ে যাবে। ওম শান্তি। কর্তৃত্ব-তন্ত্রের রাক্ষস একদিন নিজে নিজেই নাকি তাঁর দাঁত-নখ খুলে রাখবেন; ভালো হয়ে যাবেন; আর পরবেন না ওসব। এই তো পার্থক্য: অ্যানার্কিস্টদের সাথে মার্কসিস্টদের বিপ্লব-ধারণার। এই মুহূর্তে পৃথিবীতে যে বিশ্ববিপ্লব ঘটে চলেছে (মার্কসবাদীরা যার সামান্যই খবর রাখেন, অংশ নেওয়া তো দূরের কথা), এবং ভূমধ্যসাগর থেকে শুরু করে উত্তর-আফ্রিকা আরব-জাহান দক্ষিণ-ইউরোপ হয়ে আটলান্টিক পাড়ি দিয়ে এসে পৌঁছেছে খোদ নিউ ইয়র্কে, সেই 'অকুপাই

ওয়াল স্ট্রিট' এর স্বভাবচরিত্র সম্পর্কে ধারণা নেওয়ার জন্য এবং এর আগের সব বিশ্ববিপ্লবের সাথে এর তুলনার জন্য, অর্থাৎ খোদ নৈরাজ্যবাদীদের বিপ্লব-ধারণার নমুনা পেশ করার জন্য, আপাতত শুধু একটা লেখার হদিস দিয়ে রাখি: ডেভিড গ্রেইবার ২০১১-খ।

তো, যা-ই হোক, এঙ্গেলস-মার্ক্সরা বলছিলেন, আমরা যে বুর্জোয়াদের উৎখাত করব, বুর্জোয়ারা তো অত্যন্ত শক্তিশালী; তাদেরকে উৎখাত করে আমরা যে অন্যরকম একটা সমাজ কায়েম করতে চাইব, ওরা তো ভয়ঙ্কর প্রতিরোধ তৈরি করবে। ওই প্রতিরোধকে আমি গুঁড়া করব কী দিয়ে? ধ্বংস করব কী দিয়ে? তার জন্য আমারও, কিছুদিনের জন্য, রাষ্ট্র-ক্ষমতা হাতে নিতে হবে। আমি যদি বুর্জোয়াদেরকে উৎখাত করে, খোদ রাষ্ট্রটাকেও উৎখাত করে ফেলি, তাহলে পরে তো আমি বুর্জোয়াদের সম্মিলিত শক্তির সঙ্গে পেরে উঠব না। (দ্রষ্টব্য: ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, ১৮৭২।) কারণ, তার তো অলরেডি ঐরকম একটা সংহত ক্ষমতা আছে দীর্ঘদিনের। ফলে কিছুদিনের জন্য রাষ্ট্রক্ষমতা আমি চর্চা করব। মার্কসের ভাষায়, এটা হবে শ্রমিক-রাষ্ট্র, "জনগণের রাষ্ট্র" (বাকুনিন, ১৯৫০)। নতুন সৃষ্ট সমাজ থেকে বুর্জোয়াদের পুরোপুরি উৎখাত করে দেয়া পর্যন্ত এটা থাকবে। তারপর, শেষ বিচারে, রাষ্ট্রের আর প্রয়োজন থাকবে না। ব্যক্তি-মালিকানা উচ্ছেদ করে সমস্ত উৎপাদন-যন্ত্র, উৎপাদনের যত রকম উপায়-উপকরণ আছে, সেগুলোকে সব সামাজিক মালিকানায় নিয়ে আসব। তত দিনে উৎপাদন সুপ্রচুর বৃদ্ধি পাবে, সবাই সচ্ছল হয়ে উঠবে। বড়লোক-গরিব বলে আলাদা আলাদা শ্রেণীর বৈষম্য আর থাকবে না। শ্রেণী বিলুপ্ত হবে। তখন, আমরা সমাজতন্ত্র নামের এই রাষ্ট্র-পর্বটা পার করে সাম্যবাদে গিয়ে পৌছাব। তখন আর রাষ্ট্রেরও প্রয়োজন থাকবে না। রাষ্ট্র তখন আস্তে আস্তে আপনা-আপনিই শুকিয়ে যাবে। এটা উবে যাবে। কর্পূরের মতো এটা শুকিয়ে উবে যাবে। আর এটা থাকবে না।

এখানে বলে রাখলে বাহুল্য হবে না, মার্কস-এঙ্গেলসের সাহচর্যে-তত্ত্বাবধানে পরিচালিত জার্মান সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্রের নামই ছিল *জনগণের রাষ্ট্র* (জার্মান ভাষায় 'Der Volksstaat'; আর ইংরেজিতে বললে 'The People's State')। ভিলহেল্ম লিবনেখ্ট-এর সম্পাদনায় লিপজিগ শহর থেকে এটি বের হতো ১৮৬৯ থেকে ১৮৭৬ কালপর্বে। মার্কস এবং এঙ্গেলস এই পত্রিকায় প্রচুর লিখেছেন। মার্কসের "প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব" বিষয়ক তত্ত্ব এই "জনগণের রাষ্ট্র" ধারণারই যৌক্তিক পরিণাম। অনেক পরে, ১৯১৭ সালের ব্যাপক সংখ্যক শ্রমজীবী জনসাধারণের অজস্র ধারার অজস্র কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা রুশবিপ্লবকে একটি রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে লেনিন-ট্রটস্কি-

স্ট্যালিনরা যে রাশিয়ায় সত্যি সত্যি "প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব" নামক একটি সর্বাত্মক-স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করলেন (হুডস্ক হকার, ১৯২০), সেটাও কিন্তু মার্কসের এই "জনগণের রাষ্ট্র" তত্ত্বেরই অনিবার্য পরিণাম। এই রাষ্ট্র সম্পর্কে এম. এন. রায়ের বিলম্বিত পর্যালোচনামূলক উপলব্ধি আমরা পরে দেখব।

তো, তখন থেকেই কিন্তু বাকুনিন-গুইলম-ইউজিনরা এই মর্মে বলছেন, লিখিত থিসিস হাজির করছেন যে ন্যূনতম কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করলেই বোঝা যাবে, এটা অবাস্তব একটা চিন্তা (বাকুনিন, ১৯৫০)। কারণ, বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক ক্ষমতা উৎখাত করে একবার যখন আমি রাষ্ট্র বানাব, সেই রাষ্ট্র কে চালাবে? শ্রমিক-শ্রেণী। কিন্তু, গোটা শ্রেণী তো আর রাষ্ট্র চালাতে পারবে না। কারণ রাষ্ট্র জিনিসটারই স্বভাব এরকম যে অল্প কিছু লোককেই ঐটা চালাতে হবে। এ ছাড়া তো ঐটাকে চালানো সম্ভব না। কারণ, ওটাতে একটাই স্টিয়ারিং এবং সিট খুব বেশি না। ওখানে খুব বেশি লোক ড্রাইভার হতে পারেন না। অল্প কিছু লোকের পক্ষেই ওখানে ড্রাইভার-হেলপার-টিকিট-কন্ডাক্টর ইত্যাদি হওয়া সম্ভব। তাহলে, ঐ অল্প কিছু লোক কারা? তাঁরা হচ্ছেন পার্টির লোক। কোন পার্টি? শ্রমিক-শ্রেণীর পার্টি। এই পার্টি, না-হয় ঐ পার্টি, না-হয় দুই-তিন পার্টি মিলে একসঙ্গে, খুব বেশি হলে। এই পার্টিগুলোই যখন রাষ্ট্রের মালিক হয়ে যাবেন, রাষ্ট্র পরিচালনা করা যখন তাঁরা শুরু করবেন, তখন দু-দিন পরে ওঁরাই নতুন শাসক-শ্রেণী হয়ে যাবেন। একবার উঠতে পারলে ওখান থেকে ওঁরা স্বেচ্ছায় আর নামবেন না। সামাজিক মালিকানার নামে, শ্রমিক-রাষ্ট্রের নামে, শ্রমিক-শ্রেণীর নামে ওঁরাই তো তখন সমস্ত উৎপাদনের উপায়-উপকরণের মালিক।

সামাজিক মালিকানা বলতে মার্কসীয় সমাজতন্ত্রীদের মতে তাহলে রাষ্ট্রীয় মালিকানাই দাঁড়ায়। সামাজিক মালিকানা বলতে মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রীরা বোঝেন সরাসরি উৎপাদকদের নিজেদের মালিকানা। বাকুনিন-গুইলম-হিন্সরা রাষ্ট্র-প্রশ্নে মার্কসীয় ধারাটিকে "কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্রী" ধারা, "রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রী" ধারা, বা "রাষ্ট্রতন্ত্র" প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছিলেন। প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ-কংগ্রেসের (১৮৭২) পরিপ্রেক্ষিতে মার্কস সম্পর্কে বাকুনিন লিখেছিলেন: "সরকার জিনিসটা উনি এতটাই ভালোবাসেন যে এমনকি শ্রমজীবী মানুষদের আন্তর্জাতিক সমিতির মধ্যে পর্যন্ত উনি একটা সরকার গঠন করতে চেয়েছিলেন" (বাকুনিন, ১৯৫০)। আসলে, কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্রের এই ধারাটির কাছে রাষ্ট্রই সব। রাষ্ট্রই সমাজ, রাষ্ট্রই সমাজতন্ত্র। আর, এই রাষ্ট্রের মালিক হচ্ছে ঐ কয়েকটা লোক, যাঁরা রাষ্ট্রের নেতা, রাষ্ট্রের অফিসার, কমিশার।

এই কাঠামোর সাথে তাহলে বুর্জোয়া-রাষ্ট্রের কাঠামোগত তেমন কোনো তফাৎ থাকছে না। উভয় ক্ষেত্রেই উৎপাদনের উপায়াদি গুটিকয় লোকের হাতে থাকে: পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে থাকে পুঁজিপতিদের হাতে, আর রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রে থাকে গুটিকয় পার্টিনেতা বা রাষ্ট্রকর্তাদের হাতে। এটা খুবই বিপদজনক একটা জায়গা। পুঁজিপতিদের বিরুদ্ধে রক্তক্ষয়ী বিপ্লবের পর যখন মনে হচ্ছে দেশের মালিক শ্রমজীবীরা, আদতে তখন শ্রমজীবী সমস্ত মানুষ আরেক বার নতুন আরেকটা শাসক শ্রেণীর অধীনে পড়তে যাচ্ছেন।

তাহলে ঘটনাটা দাঁড়াচ্ছে কী? আগে ছিল একটা শাসক শ্রেণী— বুর্জোয়া-শ্রেণী। তাঁরা যাবতীয় ধনসম্পদের মালিক ছিল, উৎপাদনের যাবতীয় উপায়-উপকরণের মালিক ছিল। এবার এসে নতুন আরেকটা শাসক শ্রেণী চূড়ান্ত অর্থে সমস্ত কিছুর, জীবন-সম্পদ-যন্ত্রপাতি-ভূপ্রকৃতি সবকিছুর, মালিক হয়ে উঠল প্রলেতারিয়েতের নামে, শ্রমজীবী-শ্রেণীর নামে। তাহলে এখানে কী হচ্ছে? আরেকটা পুঁজিবাদই হচ্ছে। রাষ্ট্রের অধীনে পুঁজিবাদ। এই তো? ফলে, নৈরাজ্যবাদীদের কথা হলো: ওখানে যাওয়াই যাবে না! শ্রমজীবী জনসাধারণ যদি পুরোনো সমাজ ব্যবস্থার মালিকদেরকে এবং পরিচালকদেরকে উৎখাত করার সুযোগ পায়, যদি ঐ শক্তি অর্জন করে, তাহলে প্রথম সুযোগেই খোদ রাষ্ট্রটাকে সমূলে উচ্ছেদ করে দিতে হবে।

এই তর্ক শেষ পর্যন্ত গিয়ে গড়ায় হেগ-কংগ্রেসে মার্কস-এঙ্গেলস কর্তৃক নিতান্তই কর্তৃত্বপরায়ন কায়দায়, রীতিমতো ষড়যন্ত্রমূলক পদ্ধতিতে বাকুনিন-গুইলমদের বহিষ্কারে, এবং পরিণামে, প্রথম আন্তর্জাতিকের প্রথমে নিষ্ক্রিয়তা, পরে একেবারে বিলুপ্তিতে। সেই বেদনাদায়ক ইতিহাস এখানে নয়।

২.২ নৈরাজ্য বনাম মাৎসন্যায় এবং বলপ্রয়োগের অবৈধতা

আসলে, "সমস্ত নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে যে-জিনিসটা সাধারণ, সেটা হলো সকল জবরদস্তিমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠান থেকে মুক্ত একটা সমাজের আকাঙ্ক্ষা" (হুডল্ফ হকার, ২০১১)। কিন্তু, এক দিকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এক-দেড় দশকের অন্ধকার কাল-পর্বে সন্ত্রাসবাদ, এবং অন্য দিকে বিপুলতম নৈরাজ্যবিরোধী প্রচারণার কারণে সারা বিশ্বে এমন বিভ্রান্তি তৈরী হয়েছে যে আজও লোকে নৈরাজ্য বলতে বিশৃঙ্খলা বোঝে। অন্ধকার ঐ কাল-পর্বে নৈরাজ্যবাদীদের সামান্যতম আইনী তৎপরতার সুযোগও রাখে নি ইউরোপের সরকারগুলো। ফলে, গভীর হতাশায়, নির্মম অত্যাচারে বিগড়ে গিয়ে সন্ত্রাসের জনবিচ্ছিন্ন পথ বেছে নেন নৈরাজ্যবাদীদের একটা অংশ। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়াতেই শুধরে নিয়ে তাঁরা ফিরে আসেন পথে।

আর, আজকের একুশ শতকের নৈরাজ্যবাদীদের 'অকুপাই ওয়ালস্ট্রিট আন্দোলন' তো প্রবলভাবে গান্ধীর অহিংস প্রতিরোধের পথই বেছে নিয়েছে (ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-ক; ডেভিড গ্রেইবার, ২০১১-খ; ডেভিড গ্রেইবার, ২০১২)। নৈরাজ্যবাদকে বুঝতে গেলে বিশৃঙ্খলার বিভ্রান্তি থেকে বেরিয়ে আসা দরকার:

> উঠতে-বসতে যাঁরা অনিয়ম, হৈ-হট্টগোল, গ্যাঞ্জাম, মারামারি-কাটাকটি, গণ্ডগোল, এলোমেলো দশা, "জোর যার মল্লুক তার" নীতি (তথা মাৎসন্যায়) ইত্যাদিকে "নৈরাজ্য" বলে গালাগালি করেন তাঁরা তো আছেনই, "নৈরাজ্য" শব্দ দিয়ে অনেকে এমনকি পুঁজিবাদকেও বুঝিয়ে থাকেন। আস্ত একটা ধারাই আছে 'অ্যানার্কো-ক্যাপিটালিজম' বা অরাজক-পুঁজিবাদ নামে। তার মানে, কর্তৃপক্ষীয় কমনসেন্স দিয়ে নৈরাজ্যকে বুঝে ফেলাটা অন্ধ হয়ে প্রলয় বন্ধ করারই শামিল। নৈরাজ্যকে আন্তরিকভাবে বুঝতে হলে তার সুদীর্ঘ ইতিহাসে ঢুকতে হবে। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-ঙ)

এখানে তার অবকাশ নাই, বলা বাহুল্য। তবু কতকগুলো কথা না বললে বোঝা যাবে না, কেন আমি এম. এন. রায়ের র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমকে বোঝার জন্য নৈরাজ্যবাদের দ্বারস্থ হয়েছি। আসলে,

> মাৎস্যন্যায় আর নৈরাজ্যর পার্থক্য প্রণিধানযোগ্য, কেননা কথায়-লেখায়-মিডিয়ায় ডান-বাম নির্বিশেষে প্রায় সমস্ত মহল স্রেফ অজ্ঞতাজনিত কারণে আলোচ্য মাৎস্যন্যায়-পর্বকে নৈরাজ্য, অরাজকতা প্রভৃতি নামে আখ্যায়িত করেছে। নৈরাজ্য কিন্তু অতিশয় উন্নত নীতিবোধসমৃদ্ধ উন্নত মানবিক একটা সমাজ গঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত একটা বিষয়। সর্বজনগ্রাহ্য কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে পৃথক পৃথক রাজশক্তি বা রাজনৈতিক দলসমূহের 'জোর যার মুল্লুক তার' নীতির সশস্ত্র অভিপ্রকাশজনিত ভয়ঙ্কর বিশৃঙ্খলা হলো মাৎস্যন্যায়। "রাজা নাই, অথচ সকলেই রাষ্ট্রীয় প্রভুত্বের দাবিদার। বাহুবলই একমাত্র বল, সমস্ত দেশময় উচ্ছৃঙ্খল বিশৃঙ্খল শক্তির উন্মত্ততা; এমন যখন হয় দেশের অবস্থা, প্রাচীন অর্থশাস্ত্রে তাহাকেই বলে মাৎস্যন্যায়, অর্থাৎ বৃহৎ মৎস্য কর্তৃক ক্ষুদ্র মৎস্য গ্রাসের যে ন্যায় বা যুক্তি সেই ন্যায়ের অপ্রতিহত রাজত্ব!" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ৩৮০।) ২০০৬ সালের ২৮শে অক্টোবরকে ঘিরে ঠিক এরকম অবস্থারই সৃষ্টি হয়েছিল। আমাদের দেশের ইতিহাসে আরও একবার, পাল আমলের আগে আগে, ৬৫০–৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এরকম মাৎস্যন্যায়-পরিস্থিতি বিরাজ করেছিল। সে-সময় সর্বসম্মতভাবে

গণেশদেবকে রাজা নির্বাচনের মাধ্যমে সেই অবস্থার নিরসন ঘটে। অন্যদিকে, নৈরাজ্য তথা নৈরাজ্যবাদের নামে মেলা ভালোমন্দ-হাবিজাবি জিনিসের চল এখানে-সেখানে থাকলেও এর মূল সামাজিক আন্দোলনের ধারাটি ইউরোপে দীর্ঘকাল যাবৎ 'মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্র' 'মুক্তিমুখিন সাম্যবাদ' প্রভৃতি নামে পরিচিত। আমাদের দেশের বলশেভিক-ঘরানার কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্রীরা স্বাধীন সমাজতন্ত্রের ঐ দুর্দান্ত ধারাটির ইতিহাস ও সাহিত্যের সাথে পরিচিত নয় বললেই চলে। কেননা, ১৯১৭ সালে রুশ জনগণের মহান অক্টোবর বিপ্লবের পর স্বৈরতন্ত্রী বলশেভিকরা জনগণের ওপর রক্তাক্ত দমনপীড়ণ চালানোর মাধ্যমে নিরঙ্কুশ হুকুমদারির রাষ্ট্রব্যবস্থা কায়েম করার পর থেকে রুশ সাম্রাজ্যবাদ এবং মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের জগৎজোড়া প্রচারণা ব্যবস্থা সমাজতন্ত্রী অর্থে বলশেভিকদেরকেই তুলে ধরেছে। যেমন ধরুন, ১৯৩৬ সালে স্পেনের সমাজতন্ত্রীদের অসাধারণ মুক্তিপরায়ন বিপ্লবের কথা বলতে গেলে আমাদের কানেও আসে নি। খুব বেশি লোক জানেন না, ১৯৬৮ সালের 'প্যারিস-বসন্তের' ছাত্র-শ্রমিক-বিক্ষোভের পেছনেও ছিল মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রীদের নানান ধারার মুক্ত-স্বাধীন তৎপরতা। এটাও আমাদের জানা আছে কিনা সন্দেহ যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবাদী তৎপরতার সবচেয়ে বলিষ্ঠ ও ধারালো বুদ্ধিবৃত্তিক কণ্ঠস্বর, অতুলনীয় ভাষাতত্ত্ববিদ নোম চমস্কি আজকের দুনিয়ায় মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের প্রধানতম প্রচারকদের একজন। তো, প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদ হচ্ছে স্বাধীন সমাজতন্ত্র: যাবতীয় রাজা-রাজড়া-রাজতন্ত্র তথা সমস্ত প্রকার শাসকগোষ্ঠীকে বিদায় করে দিয়ে সুসংগঠিত জনগণের সত্যিকারের গণতান্ত্রিক প্রতিনিধিত্ব কায়েমের পথে অত্যন্ত সুবিন্যস্ত পরিচালন-ব্যবস্থার মাধ্যমে গোটা দেশকে অবাধ-মুক্ত-সৃজনশীল আত্মকর্তৃত্বের সুসংগঠিত কাঠামোসমূহের অধীনে নিয়ে আসা। কিন্তু সেই শিল্প-বিপ্লবের সময়কাল থেকেই, যখন থেকে শ্রমিকদের স্বাধীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনগুলো গড়ে উঠছে তখন থেকে এখন পর্যন্ত, নৈরাজ্যকে বিশৃঙ্খল, গণ্ডগোল, মাৎস্যন্যায় প্রভৃতি অর্থে চালানোর লাগাতার প্রচারণা-প্রচেষ্টা শাসকশ্রেণীগুলোর তরফে চলে আসছে। এজন্যই নৈরাজ্যবাদের অন্যতম আদি প্রবক্তা প্রুঁধো বলতেন, 'নৈরাজ্য মানে নিয়ম, আর শাসক-সরকার মানে গণ্ডগোল'। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৮)

অর্থাৎ, অ্যানার্কিজমের প্রধান অর্থই হচ্ছে যে, রাষ্ট্র এবং অন্য যাবতীয় কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করা। অথরিটি মানেই বলপ্রয়োগ। সকল অথরিটিই অবৈধ। সকল বলপ্রয়োগ অবৈধ। নিজেকে বৈধ

প্রমাণ করার দায় অথরিটিরই, নইলে তা আপনাতেই অবৈধ (নোম চমস্কি, ২০০৫: ১৭৪, ১৭৮)। মানুষ নিজেই নিজের অথরিটি হয়ে উঠবে, 'অথর্' হয়ে উঠবে, তার জন্য যাবতীয় কেন্দ্রীভূত অথরিটির বিলয় প্রয়োজন।

২.৩ নৈরাজ্যের দুই বাধা: অসমতা ও কর্তৃত্ব-তন্ত্র

উচ্চনীচ-কর্তৃত্বক্রমতন্ত্রের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার বৈধতাকে অস্বীকার করে নৈরাজ্যবাদ। যাবতীয় কর্তৃত্বক্রমতন্ত্রকে যথাসম্ভব তীব্রভাবে আক্রমণ করে তার অবৈধতা প্রতিপন্ন করার কাজটাই নৈরাজ্যবাদের কাজ। নৈরাজ্যবাদীরা মনে করেন, স্বাধীনতার স্পৃহা এবং বিদ্রোহের বাসনা মানুষের চিরন্তন জৈবিক বৈশিষ্ট্য। এই বৈশিষ্ট্যের অনুকূল সমাজ গঠনের পথে বাধা হচ্ছে পুঁজিবাদী মালিকানা-কাঠামো এবং তার বলপ্রয়োগের রাষ্ট্রীয়-আইনগত-কর্তৃত্ব-সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানগুলো। অর্থাৎ, অসমতা ও কর্তৃত্ব। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৯-খ)

অথরিটি টিকে থাকে অর্থনৈতিক শোষণের ওপর। শোষণের অবস্থাটাকে আবার পাহারা দিয়ে টিকিয়ে রাখতে হয়। এই পাহারার নাম রাজনৈতিক ক্ষমতা: সৈন্যবাহিনী-আইন-আদালত-রাষ্ট্র-মিডিয়া। ফলে, মানুষের মুক্তির পথে বাধা দুই প্রকার। মানুষের পরাধীনতার দুই রূপ। একটা অর্থনৈতিক, আরেকটা রাজনৈতিক। একটায় একজনের শ্রম অন্যের মালিকানার ও তথা পুঁজির অধীন, আরেকটায় একজনের করণীয়-অকরণীয় অন্যের হুকুমের তথা ক্ষমতার অধীন। এই উভয় প্রকার মালিকের দাসত্ব থেকে মুক্তি না-পেলে মানুষ মানুষ হয়ে উঠবে না, গোলাম থেকে যাবে। এই দুই গোলামি থেকে স্বাধীনতা লাভ করার রূপকল্পই হচ্ছে নৈরাজ্যবাদীদের সমাজতন্ত্র। এই জন্য বাকুনিন বলতেন যে, স্বাধীনতা ছাড়া সমাজতন্ত্র হচ্ছে দাসত্ব, আর সমাজতন্ত্র ছাড়া স্বাধীনতা হচ্ছে গুটিকয় বিত্তবান ও ক্ষমতাবানদের জন্য নতুন একটা বিশেষাধিকার-তন্ত্র (বাকুনিন, ১৮৬৭)। সমাজতন্ত্র হবে কিন্তু ব্যক্তির স্বাধীনতা থাকবে না, এটা হতে পারে না।

২.৪ নৈরাজ্যে প্রত্যক্ষ তৎপরতা এবং 'ডু ইট ইওরসেল্ফ' এর ধারণা

ইউরোপ, ল্যাটিন আমেরিকা, আফ্রিকায় শিক্ষার্থী-শ্রমিক-জনতার গণ-সামাজিক আন্দোলনের পথে বিকশিত এবং প্রথম আন্তর্জাতিক বেয়ে আসা মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্র অর্থে নৈরাজ্য সংক্রান্ত বিশাল লেখালেখি-সাহিত্য খোঁজখবর করলে দেখা যাবে, "নৈরাজ্য" কথাটার একটা মানে হলো: ডু ইট ইওরসেল্ফ (DIY)। কোনো গুরু হুজুর পুরুতঠাকুর এমপি সেক্রেটারি লেনিন

লাদেন পীর মুর্শিদ গোঁসাই না ধরে, নিজেদের কাজ নিজেরা করার নাম নৈরাজ্য। নৈরাজ্যের একটা মূল কথা হলো: মানুষ যখন নিজেদের কাজকর্ম নিজেরা পরিচালনা করতে ব্যর্থ হন, তখনই হুজুর কর্তৃপক্ষ মাতব্বর শ্রেণীর উদ্ভব ঘটে। আর, মানুষ যখন নিজেদের সমস্যাগুলো নিজেরাই সমাধান করতে শুরু করেন, তখন যাবতীয় মাতব্বরি ফালতু হয়ে যায়। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-ঙ)

একমাত্র জনসাধারণই জনসাধারণের ভালোমন্দের দেখভাল করতে পারে। অন্য কেউ না: সংসদ না, বিচারবিভাগ না, থানা-পুলিশ-প্রশাসন-আমলাতন্ত্র না, রাজনৈতিক দল না এটাই মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের (তথা নৈরাজ্যবাদের) মূল একটা কথা। অ্যানার্কিস্টরা একে বলেন 'প্রত্যক্ষ তৎপরতা', যা আবেদন-নিবেদন-দরখাস্তের রাজনীতির বিপরীত একটা ধারা, জনগণের ধারা। এর মানে নিজের কাজ নিজে করা, নিজেদের কাজ নিজেরা করা— কোনো হুজুর না-ধরা। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-ক)

২.৫ নৈরাজ্য এবং স্বাধীন মানবসংঘ

নৈরাজ্যবাদী ইতিহাসবিদ হুডল্ফ হকারের ভাষায় সংজ্ঞার মতো করে বললে,

> আমাদের সময়কার জীবনযাত্রায় নৈরাজ্যবাদ হচ্ছে সুনির্দিষ্ট একটা বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা। এর সমর্থকেরা অর্থনৈতিক একচেটিয়া এবং সমাজের মধ্যকার যাবতীয় জবরদস্তিমূলক রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তির পক্ষে কথা বলেন। বর্তমান পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিধি-বন্দোবস্তের জায়গায় নৈরাজ্যবাদীরা চান সমস্ত উৎপাদিকা শক্তির স্বাধীন একটা সমিতি, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হবে সমাজের প্রত্যেক সদস্যের অবশ্য-প্রয়োজনীয় চাহিদাগুলা পূরণ করা; এবং এরপর থেকে এই সমিতি সমাজ-সভার মধ্যকার বিশেষ-সুবিধাপ্রাপ্ত সংখ্যালঘুদের বিশেষ স্বার্থের কথা আর ভাববে না।
>
> রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহের প্রাণহীন যন্ত্রপাতিওয়ালা বর্তমান রাষ্ট্র-সংগঠনের জায়গায় নৈরাজ্যবাদীরা চান স্বাধীন মানব-সম্প্রদায়সমূহের একটা সংঘ। এই স্বাধীন মানব-সম্প্রদায়গুলা একটা আরেকটার সাথে বাঁধা থাকবে তাদের সাধারণ অর্থনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থের সূত্রে। এবং এরা নিজেদের কাজকারবারের বন্দোবস্ত করবে পারস্পরিক সম্মতি আর স্বাধীন চুক্তির মাধ্যমে। (হুডল্ফ হকার, ২০১১)

তার মানে, নৈরাজ্যবাদীরা চান সমাজ-সম্প্রদায়সমূহের পূর্ণ স্বশাসন, স্বরাজ, এবং তারই ভেতরে ব্যক্তির স্বাধীনতার সর্বোত্তম বিকাশ। তো, এ রকম একটা

সমাজের পরিচালন-কাঠামো কেমন হতে পারে তার একটা ধারণা আমরা পেতে পারি নোম চমস্কির "ভবিষ্যতের সরকার" নামে ১৯৭০ সালের এক বক্তৃতায়:

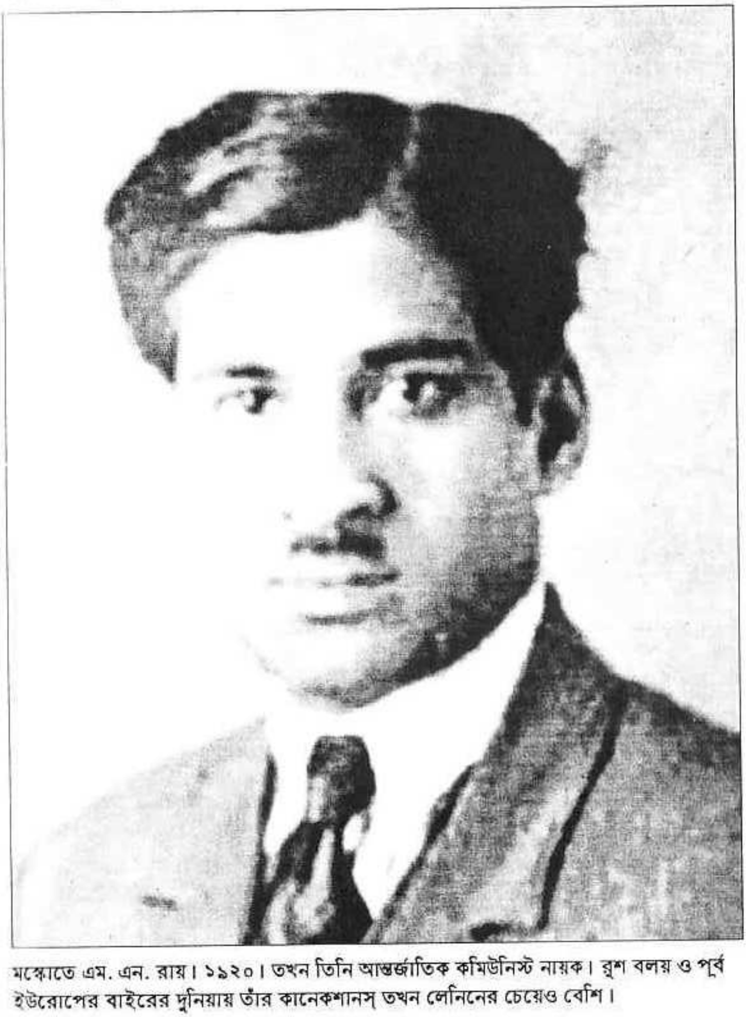
> মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্র ... জোরের সাথে বলতে থাকে, রাষ্ট্রশক্তিকে অবশ্যই উচ্ছেদ করতে হবে শিল্পায়িত সমাজের গণতান্ত্রিক বিন্যাস-বন্দোবস্তের সপক্ষে, যাতে সমস্ত প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রত্যক্ষ সর্বলোকগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণ থাকবে তাঁদের, যাঁরা সেসব প্রতিষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে থাকেন এবং যাঁরা সেসব প্রতিষ্ঠানের কার্যকলাপ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হন। তাহলে হয়ত আপনি শ্রমিক-পরিষদ, গ্রাহক-ভোক্তা-পরিষদ, কমিউন-সভা, আঞ্চলিক ফেডারেশন ইত্যাদি প্রভৃতি নিয়ে গঠিত একটি ব্যবস্থার কথা কল্পনা করতে পারছেন, যে-ব্যবস্থার মধ্যে থাকছে এমন ধরনের প্রতিনিধিত্ব, যা প্রত্যক্ষ ও প্রত্যাহারযোগ্য। প্রত্যক্ষ ও প্রত্যাহারযোগ্য এই অর্থে যে, সুস্পষ্টভাবে সংজ্ঞায়িত ও একাঙ্গীভূত যে-সামাজিক গোষ্ঠীসমূহের পক্ষে এই প্রতিনিধিরা কোনো একটা উচ্চতর সংস্থার কথা বলেন, সেইসব গোষ্ঠীর কাছেই তাঁরা প্রত্যক্ষভাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন, আর এই গোষ্ঠীগুলোর কাছেই তাঁদেরকে প্রত্যক্ষভাবে ফিরে আসতে হয়। আমাদের প্রতিনিধিত্ব-ব্যবস্থার চেয়ে যে অনেক আলাদা জিনিস, সেটা এমনিতেই বোঝা যাচ্ছে। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

২.৬ নৈরাজ্যিক ধ্যানধারণার অন্যতম আদি উৎস আলোকায়ন

নৈরাজ্যবাদী তথা মুক্তিপরায়ন সমাজতান্ত্রিক এই ধারণারাজির আদি উৎস কিন্তু খোদ আলোকায়নের মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্যের ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী চিন্তাপ্রণালীর মধ্যে নিহিত। সেই দিকটা দেখে নিয়ে আমি চলে যাব এম. এন. রায়ের নয়া মানবতাবাদ ওরফে র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজমের দিকে। রায়ের র‍্যাডিক্যাল যুক্তিপরম্পরা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তার মধ্যে নৈরাজ্যবাদী চিন্তনের উপাদানগুলো শনাক্ত করব এবং উভয় চিন্তাধারার তুলনামূলক সাযুজ্য দেখানোর চেষ্টা করব।

তৃতীয় পাঠ

নৈরাজ্যবাদ এবং আলোকায়নের মুক্তিমুখীন চিন্তাধারা



মস্কোতে এম. এন. রায়। ১৯২০। তখন তিনি আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট নায়ক। রুশ বলয় ও পূর্ব ইউরোপের বাইরের দুনিয়ায় তাঁর কানেকশানস্ তখন লেনিনের চেয়েও বেশি।



তৃতীয় পাঠ

নৈরাজ্যবাদ এবং আলোকায়নের মুক্তিমুখীন চিন্তাধারা

মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হলো ... একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গতিপূর্ণ সমগ্র হয়ে ওঠার অভিমুখে তার নিজের ক্ষমতা-সমূহের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক ঐকতানমূলক বিকাশ ঘটানো। স্বাধীনতা হচ্ছে সেই মহাশর্ত, সেই অপরিহার্য শর্ত, যার ওপর নির্ভর করে এই ধরনের বিকাশ। (হোমবল্ট ১৭৯২: ১১)

৩.১ নৈরাজ্য ও নয়া মানবতাবাদের ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী উৎস

এই জমানার নৈরাজ্যবাদ, তথা মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের, প্রবাদপ্রতিম চিন্তক, যিনি তাঁর বিশ্বাসের সপক্ষে তৎপরতার কারণে জেল পর্যন্ত খেটেছেন, সেই মার্কিন দার্শনিক-ভাষাবিদ, এমআইটি-র মতো প্রতিষ্ঠানে অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে প্রফেসর হিসেবে কর্মরত জীবন্ত কিংবদন্তী নোম চমস্কির কাছ থেকে আমরা শিখেছি: স্বাধীনতা যে মানুষের প্রকৃতিপ্রদত্ত স্বভাব, নৈরাজ্যবাদীদের এই বিশ্বাসের অন্যতম উৎস হচ্ছে ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ।

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ যে ব্যক্তির স্বরাজের ওপর রাষ্ট্রের খবরদারির বিরোধিতা করে সেটা আমরা সবাই জানি, কিন্তু এই বিরোধিতা যে বিশ্লেষণ ও উপলব্ধির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, সে সম্পর্কে আমাদের ধারণা নাই বললেই চলে। যদি সে সম্পর্কে আমরা সজাগ হই, তাহলে বুঝব ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের সাথে নৈরাজ্যবাদের সম্পর্কটা কোথায়, আর তার সাথে এম. এন. রায়ের নয়া মানবতাবাদের সম্পর্কই বা কোথায়।

যখন দেখি এম. এন. রায়ও, মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভয়াবহ অগ্রহণযোগ্যতা সম্পর্কে তাঁর নিজের উপলব্ধি গঠন করার প্রক্রিয়ায়, স্বাধীনতা-যুক্তিবোধ-নীতিবোধকে মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক অংশ হিসেবে দেখা আরম্ভ করছেন ইউরোপীয় রেনেসাঁ তথা উদারনীতিবাদের বিচারমূলক পাঠ-প্রক্রিয়ার ভেতর দিয়েই বটে, তখন এক প্রকার আশ্চর্যবোধ

দ্বারা তাড়িত তো হই-ই, তার চেয়ে বেশি করে খেয়াল করি রেনেসাঁ-উদার-নীতিবাদ-মানবপ্রকৃতি-স্বাধীনতা-নৈরাজ্যপ্রবণতার চিন্তাপ্রণালীগত ঐতিহাসিক ধারাক্রমটির সাথে এম. এন. রায়ের উপলব্ধির গভীর নৈকট্যকে। এ কারণেই এখানে আমি চিন্তার এই ধারাক্রমটির প্রতি, নোম চমস্কির বরাতে, মনোযোগ নিবদ্ধ করতে চাই।

নিজের নব-উপলব্ধ দার্শনিক চিন্তাপ্রণালীকে যে এম. এন. রায় 'মানবতা'বাদের সাথে সংশ্লিষ্ট করে নামাঙ্কিত করলেন, এ যে স্রেফ মানুষের মহত্ব-শ্রেষ্ঠত্ব সংক্রান্ত কতকগুলি বুলিতে পর্যবসিত হওয়ার মতো দুধভাত-মানবতাবাদ নয়, এ যে রীতিমতো বৈপ্লবিক সমাজ-রূপান্তর-তৎপরতার তাড়না অভিমুখিন এক দুরূহ অভিযাত্রা, তার সত্যিকারের অর্থ বোঝার জন্যেও, আমার ধারণা, চিন্তার এই ধারাক্রমটির প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার আছে।

৩.২ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদে ব্যক্তির প্রতিপক্ষ হিসেবে রাষ্ট্র

১৯৭০ সালে প্রদত্ত সেই বিখ্যাত বক্তৃতায়, প্রফেসর চমস্কি দেখাচ্ছেন,

> ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের সবচেয়ে পরিসীমিত ও ন্যূনতম উপায়-আঙ্গিকগুলো ছাড়া অন্য সকল প্রকার হস্তক্ষেপের বিরোধিতার ঘোষণা দেয় ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ। এ হলো তার প্রধান ভাবধারা। ... এই সিদ্ধান্তটি পরিপূর্ণভাবে পরিচিত ঠিকই, কিন্তু যে যুক্তি-পরম্পরা এই সিদ্ধান্তটিতে পৌঁছানোর উপায় হিসেবে কাজ করে, সেটি অপেক্ষাকৃত কম পরিচিত এবং আমার মনে হয়, খোদ সিদ্ধান্তটির চেয়ে সেটি অনেকখানি বেশি গুরুত্বপূর্ণ। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের 'একেবারে গোড়ার দিকের এবং সবচাইতে দীপ্তিময় ব্যাখ্যাগুলোর একটা' নমুনা হিসেবে চমস্কি হাজির করেন জার্মান দার্শনিক, ভাষাবিদ, শিক্ষাবিদ এবং প্রুশিয়ার এক সময়কার শিক্ষামন্ত্রী ভিলহেম ফন হোমবল্ট কর্তৃক প্রণীত *রাষ্ট্রকর্মের সীমা* (*লিমিট অফ স্টেট অ্যাকশন*) নামক চিরায়ত গ্রন্থখানি (হোমবল্ট, ১৭৯২)।

সরকারের কর্মক্ষেত্র ও দায়িত্বকর্তব্য (*দ্য স্ফিয়ার অ্যান্ড ডিউটিজ অফ গভর্নমেন্ট*) নামেও পরিচিত এই গ্রন্থে হোমবল্টের উপস্থাপিত যুক্তিপ্রণালী ধাপে ধাপে অনুসরণ করলে আমরা বুঝব ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের বিশ্লেষণপ্রণালী কীভাবে আমাদেরকে খোদ পুঁজিবাদের র‍্যাডিক্যাল পর্যালোচনার কাছাকাছি নিয়ে যায়।

তো, হোমবল্ট বলছেন,

রাষ্ট্রের ঝোঁক হচ্ছে মানুষের ব্যক্তিগত চাওয়া-পাওয়াকে উপেক্ষা করে তাকে রাষ্ট্রের একনায়কসুলভ উদ্দেশ্য সাধনের যন্ত্রে পরিণত করা, এবং মৌলিক স্বভাবের দিক থেকে মানুষ যেহেতু স্বাধীন, অনুসন্ধানশীল এবং নিজেকে নিখুঁত করে-তুলতে-থাকা একটি সত্তা, সুতরাং বোঝা-ই যায়, রাষ্ট্র হচ্ছে গভীরভাবে মানবিকতাবিরোধী একটি প্রতিষ্ঠান। (নোম চমস্কি, ১৯৭০ থেকে উদ্ধৃতি)

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের এই মূল ভাবধারার বিশ্লেষণ থেকে চমস্কি এই উপলব্ধিতে আসেন যে

> সমৃদ্ধতম বৈচিত্র্য সহযোগে মানবীয় সুপ্তশক্তির পূর্ণাঙ্গ ঐকতানমূলক বিকাশের সাথে রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও অস্তিত্ব শেষ পর্যন্ত বেমানান। সুতরাং, হোমবল্ট—এবং পরের শতকে [গোড়ার দিককার] মার্কস, বাকুনিন, মিল এবং আরও অনেকে—মানুষের প্রকৃত অভীষ্ট হিসেবে যাকে বিবেচনা করেছেন তার সাথেও রাষ্ট্রের কার্যকলাপ ও অস্তিত্ব মানানসই নয়। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

ব্যক্তি-মানুষ এবং রাষ্ট্রের মধ্যকার স্বভাবগত এই অসঙ্গতির কেন্দ্রে আছে ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা। চমস্কি দেখাচ্ছেন, "রুশোর মতো, বা তাঁর আগে কার্তেসীয়দের মতো, হোমবল্টের অভিমতও এই যে, মানুষের প্রধান ধর্ম তার স্বাধীনতা"। হোমবল্টের ভাষায় বললে,

> অনুসন্ধান করা এবং সৃজন করা—এগুলোই হচ্ছে সেই সব কেন্দ্র, যাদেরকে ঘিরে যাবতীয় মানবীয় কর্মপ্রয়াস কমবেশি প্রত্যক্ষভাবে আবর্তিত হয়। (নোম চমস্কি, ১৯৭০ থেকে উদ্ধৃতি)

হোমবল্টের মূল গ্রন্থের পাতা উল্টে দেখছি সত্যিই চমকে যাওয়ার মতো কথা। বইয়ের "ব্যক্তি-মানুষ এবং তার অস্তিত্বের উচ্চতম উদ্দেশ্য সম্পর্কে" শীর্ষক দ্বিতীয় অধ্যায়ের শুরুতেই হোমবল্ট বলছেন,

> মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হলো ... একটি পূর্ণাঙ্গ ও সুসঙ্গতিপূর্ণ সমগ্র হয়ে ওঠার অভিমুখে তার নিজের ক্ষমতাসমূহের সর্বোচ্চ ও সর্বাধিক ঐকতানমূলক বিকাশ ঘটানো। স্বাধীনতা হচ্ছে সেই মহাশর্ত, সেই অপরিহার্য শর্ত, যার ওপর নির্ভর করে এই ধরনের বিকাশ। (হোমবল্ট ১৭৯২: ১১)

তাঁর মতে,

> স্বাধীনতার জন্য পরিপক্ব ও সক্ষম হয়ে ওঠার ব্যাপারটাকে খোদ

স্বাধীনতা যতখানি এগিয়ে নিতে পারে, আর কিছুই ততখানি পারে না। সক্ষমতার এই অভাবকে উঠতে-বসতে যাঁরা নিপীড়নমূলক প্রভাবপ্রতিপত্তি অব্যাহত রাখার ছুতা হিসেবে ব্যবহার করে চলেন, তাঁরা হয়ত এই সত্যকে স্বীকার নাও করতে পারেন। কিন্তু আমার মনে হয়, এই সত্যটা প্রশ্নাতীতভাবে, একেবারে মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি থেকেই উৎসারিত। নীতিনৈতিকতাগত ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষমতার অভাব থেকেই কেবলমাত্র স্বাধীনতার ক্ষেত্রে অসক্ষমতা দেখা দিতে পারে। এই ক্ষমতাকে বাড়িয়ে তোলাটাই হচ্ছে এই অভাবকে মোকাবেলা করার একমাত্র পথ। কিন্তু তা করতে পারাটা নির্ভর করে সেই ক্ষমতারই অনুশীলনের ওপর, এবং এই অনুশীলন আবার নির্ভর করে স্বাধীনতার ওপর যা জাগিয়ে তোলে স্বতঃস্ফূর্ত কর্মতৎপরতাকে। (হোমবল্ট ১৭৯২: ১৯৭)

৩.৩ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদে পুঁজিবাদ-বিরোধিতার যুক্তিপ্রণালী

চমস্কি দেখাচ্ছেন, "এই সব ধারণা-অনুমান থেকে ... হোমবল্ট এগিয়ে যান শোষণের তত্ত্ব এবং বিচ্ছিন্ন শ্রমের তত্ত্বের অন্তত আদি-সূত্রগুলো দাঁড় করানোর দিকে, যা ... অনেক তাৎপর্যপূর্ণ দিক দিয়েই গোড়ার দিককার মার্কসের কথা মনে করিয়ে দেয়" (নোম চমস্কি, ১৯৭০)। হোমবল্টের নিচের কথাগুলো থেকেও তা বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে:

> যে-জিনিসটা মানুষ নিজে বানায়, সেটাকে সে যতটা নিজের বলে ভাবে, তার তুলনায় যে-জিনিসটার সে মালিক, সেটাকে কখনও ততটা নিজের বলে ভাবে না। এবং যে-ভোগবিলাসীরা বাগানের ফলমূল বেশুমার উপভোগ করেন, তাঁদের তুলনায় যে-শ্রমিক বাগানটার পরিচর্যা করেন, তিনি সম্ভবত অনেক বেশি সত্যিকার অর্থে সেটার মালিক। আর যেহেতু খাঁটি মানবীয় কাজ হলো সেইটা, যা আসে অন্তরের তাগিদ থেকে, তাতে করে মনে হয় যেন সকল কৃষক এবং কারুকুশলীকে উন্নীত করে নেওয়া যেত শিল্পী পর্যায়ে, অর্থাৎ এমনসব মানুষের পর্যায়ে, যাঁরা তাঁদের শ্রমকে ভালোবাসেন শুধু শ্রমেরই খাতিরে, সেই শ্রমের উন্নতি ঘটান নিজস্ব নমনীয় প্রতিভা এবং উদ্ভাবনী দক্ষতার সাহায্যে এবং সেই সূত্রে অনুশীলন করেন নিজেদের মেধার, মর্যাদাবান করে তোলেন নিজেদের চরিত্রকে, আর উল্লসিত ও পরিমার্জিত করে তোলেন নিজেদের আনন্দসুখ। এরকমটা হলে মানবিকতা ঠিক সেই সমস্ত জিনিসের জন্যই মর্যাদাসম্পন্ন হয়ে উঠত, যেসব জিনিস এখন প্রায়ই তার মর্যাদাহানি ঘটায়, যদিও জিনিসগুলো নিজেরা সুন্দরই বটে। (নোম চমস্কি, ১৯৭০

থেকে উদ্ধৃতি)

ব্যক্তির শ্রম ও সৃজনশীলতা, এবং বিশেষ কোনো কর্তৃত্বের প্রতি তার অধীনস্ততার পরিণাম সম্পর্কে হোমবল্ট আরো বলেছিলেন,

> নিঃসন্দেহে স্বাধীনতা হচ্ছে সেই অপরিহার্য শর্ত, যাকে বাদ দিয়ে ব্যক্তিক মানবীয় স্বভাবের পক্ষে অত্যন্ত অনুকূল কর্মপ্রয়াসও কল্যাণকর কোনো প্রভাব উৎপন্ন করতে পারে না। জিনিসটা যা-ই হোক না কেন, সেটা যদি একজন মানুষের স্বাধীন পছন্দ থেকে জন্মলাভ না-করে থাকে, অথবা সেটা যদি শুধু আদেশ-নির্দেশ ও পরিচালনা-নির্দেশনার ফলাফল-মাত্র হয়ে থাকে, তাহলে সেটা তাঁর একান্ত সত্তার ভেতরে প্রবেশ করে না, বরং তাঁর প্রকৃত স্বভাব থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থেকে যায়। তিনি এটা সত্যিকারের মানবীয় কর্মশক্তি সহযোগে সম্পাদন করেন না, সম্পাদন করেন বরং স্রেফ যান্ত্রিক নির্ভুলতা সহযোগে। কিন্তু একজন মানুষ যদি তাঁর নিজের আগ্রহ, কর্মশক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা নির্ধারিত উপায়ের বদলে বহিঃস্থ দাবি ও নির্দেশনা মোতাবেক যান্ত্রিক উপায়ে কাজ করেন, তাহলে আমরা তাঁকে বাহবা দিতে পারি বটে, কিন্তু তিনি যা সম্পাদন করেন তাকে আমরা তুচ্ছ জ্ঞান-ই করি। (নোম চমস্কি, ১৯৭০ থেকে উদ্ধৃতি)

মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে হোমবল্টের ধ্যানধারণার সারকথা প্রসঙ্গে সিদ্ধান্ত টানেন চমস্কি এভাবে,

> হোমবল্টের মতে তাহলে, মানুষের জন্মই হয়েছে অনুসন্ধান এবং সৃজনের জন্য, এবং যখন একজন মানুষ বা একটি শিশু তাঁর নিজের স্বাধীন পছন্দ-অপছন্দ অনুসারে অনুসন্ধান বা সৃজনের সিদ্ধান্ত নেন, তখন তিনি হয়ে ওঠেন, হোমবল্টের নিজের ভাষায়, "একজন শিল্পী—তিনি তখন আর উৎপাদনের যন্ত্র নন, বা সুপ্রশিক্ষিত একটি তোতাপাখি নন"। মানুষের স্বভাব সম্পর্কে তাঁর ধারণার নির্যাস এটাই। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের পুঁজিবাদবিরোধিতা দেখানোর জন্য হোমবল্টের সাথে মার্কসের গোড়ার দিককার পাণ্ডুলিপির, বিশেষত তাঁর "শ্রমের বিচ্ছিন্নতা" সংক্রান্ত নিচের বিবরণের, তুলনা করেন চমস্কি। দেখান মৌলিক একটা বিন্দুতে তাঁদের দু-জনের মধ্যকার দুর্দান্ত মিল। চমস্কির বরাতে পাই কার্ল মার্কসের *পুঁজি* গ্রন্থ থেকে নেওয়া সেই চিরচেনা উদ্ধৃতি:

> শ্রমের বিচ্ছিন্নতা ঘটে তখনই, শ্রমিকের কাছে কাজ যখন বাইরে-থেকে-আসা একটা ব্যাপার, যখন কাজ তাঁর স্বভাবের অংশ নয়। এমন যে,

তিনি তাঁর কাজের মধ্যে নিজেকে পূর্ণ করে তোলেন না, বরং খারিজ করে দেন নিজেকেই, এবং শারিরীকভাবে তিনি হয়ে পড়েন নিঃশেষিত আর মানসিকভাবে অধঃপতিত। এই বিচ্ছিন্ন শ্রম শ্রমিকদের একটা অংশকে নিক্ষেপ করে আবার সেই বর্বর ধরণের কাজের মধ্যে, আর বাকি অংশকে পরিণত করে মেশিনে। এভাবে মানুষকে তা বঞ্চিত করে তাঁর প্রজাতি-ধর্ম থেকে, স্বাধীন সচেতন কর্মতৎপরতা আর উৎপাদনশীল জীবন থেকে। (কার্ল মার্কস, পুঁজি ১ম খণ্ড, ৭ম অংশ, ২৫তম অধ্যায়, ৪র্থ সেকশন: নোম চমস্কি, ১৯৭০ থেকে উদ্ধৃতি)[১২]

এ থেকে চমস্কির সিদ্ধান্ত হচ্ছে:

পুঁজিবাদী উৎপাদন-সম্পর্কের অনেক বেশি র‍্যাডিক্যাল এই পর্যালোচনা প্রায়শই একই ভাষায় প্রবাহিত হয় আলোকায়নের মুক্তিমুখীন চিন্তাধারা থেকেও। এই কারণে আমার মনে হয়, এ-কথা মানতেই হবে যে, নির্যাসের দিক থেকে (অবশ্য যেভাবে তা বিকশিত হয়ে উঠেছিল সেদিক থেকে নয়) ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী ভাবধারা গভীরভাবে পুঁজিবাদবিরোধী। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

---

[১২] মার্কসের প্রকাশভঙ্গীর অনন্যতার স্বাদ নেওয়ার তাড়নায় এখানে আদি ইংরেজি অনুবাদের হদিস খুঁজে বের করে পূর্ণাঙ্গ উদ্ধৃতিটা দেওয়ার লোভ সামলানো গেল না:

> ... within the capitalist system all methods for raising the social productiveness of labour are brought about at the cost of the individual labourer; all means for the development of production transform themselves into means of domination over, and exploitation of, the producers; they mutilate the labourer into a fragment of a man, degrade him to the level of an appendage of a machine, destroy every remnant of charm in his work and turn it into a hated toil; they estrange from him the intellectual potentialities of the labour-process in the same proportion as science is incorporated in it as an independent power; they distort the conditions under which he works, subject him during the labour-process to a despotism the more hateful for its meanness; they transform his life-time into working-time, and drag his wife and child beneath the wheels of the Juggernaut of capital." (কার্ল মার্কস, ১৮৮৭)

৩.৪ ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের নৈরাজ্যমুখীনতা

এ ভাবে, হোমবল্টের সাথে গোড়ার দিককার কার্ল মার্কসের সাযুজ্যের এই সার্বিক বিশ্লেষণ থেকে নোম চমস্কি নিচের যে উপসংহারে পৌছান, তা মনে রাখলে বর্তমান প্রবন্ধের পরিসরে র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদী এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার মুক্তিপরায়ন, তথা নৈরাজ্যবাদী, বৈশিষ্ট্যটিকে বুঝতে আমাদের বিশেষ সুবিধা হবে:

> ... ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিটি মানুষের স্বভাব সংক্রান্ত একটি বিশেষ ধারণা থেকে গড়ে ওঠে। এটা এমন একটা দৃষ্টিভঙ্গি যা বৈচিত্র্য ও স্বাধীন সৃজনের উপর গুরুত্বারোপ করে। আর এই জন্য এই দৃষ্টিভঙ্গিটি শিল্প-পুঁজিবাদ, মজুরি-দাসত্ব, বিচ্ছিন্ন শ্রম এবং এর সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন সংক্রান্ত উঁচু-থেকে-নিচু ক্রমবিন্যাস-কাঠামো ও কর্তৃত্বপরায়ন নীতিমালার সাথে মৌলিকভাবে বিরোধপূর্ণ। উদারনীতিবাদী চিন্তাধারা — অন্তত এর হোমবল্টীয় চেহারায় — মালিকানা-প্রবণ ব্যক্তিতন্ত্রের ধ্যান-ধারণারও বিরোধী, যেসব ধ্যানধারণা পুঁজিবাদী মতাদর্শের সহজাত। ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ তাই সামাজিক শৃঙ্খল উচ্ছেদ করতে চায়, কিন্তু তার জায়গাটা পূরণ করতে চায় সামাজিক বন্ধন দিয়ে— প্রতিযোগিতামূলক লোভ দিয়ে নয়, লুণ্ঠনজীবী ব্যক্তিতন্ত্র দিয়ে নয়, আর কর্পোরেট-সাম্রাজ্য দিয়ে তো অবশ্যই নয় (তা সেটা রাষ্ট্রীয়ই হোক, বা ব্যক্তিখাতেরই হোক)। সুতরাং, ধ্রুপদী মুক্তিপরায়ন চিন্তাধারার সাথে যখন শিল্প-পুঁজিবাদ সংক্রান্ত উপলব্ধি যুক্ত হয় তখন তা, আমার মনে হয়, সরাসরি মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের দিকে, বা আপনি চাইলে বলতে পারেন নৈরাজ্যবাদের দিকে, অগ্রসর হয়। (নোম চমস্কি, ১৯৭০)

চতুর্থ পাঠ

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম: মানবপ্রকৃতি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা



ভারতে কারামুক্তির পর এম. এন. রায়। ১৯৩৬। লেনিন-স্তালিনের রাষ্ট্রতন্ত্রের বিপদ বুঝেছেন, কিন্তু মার্কসবাদ মাথা থেকে তখনও যায় নি। এবার ভারতে শুরু হবে নতুনতর নিরীক্ষা।



চতুর্থ পাঠ

র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম: মানবপ্রকৃতি এবং ব্যক্তির স্বাধীনতা

মানবপ্রকৃতির সারসত্তা কী, সে ব্যাপারে যদি আমরা সুস্পষ্ট না হই, তাহলে আমরা ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে সঠিক বিচারে উপনীত হতে পারব না (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৭)। সত্যের জন্য অনুসন্ধান ... অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা-সন্ধিৎসার সাথে; আর এই স্বাধীনতা-সন্ধিৎসাই মানবপ্রকৃতির সারসত্তা। (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ২৫)

৪.১ নয়া মানবতাবাদের পর্যালোচনামূলক ও পরিগঠনমূলক দিক

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পণ্ডিত রমেন্দ্র নাথ ঠিকই খেয়াল করেছেন যে এম. এন. রায়ের নয়া মানবতাবাদ তথা র‍্যাডিক্যাল বা মৌলিক রূপান্তরমুখিন মানবতাবাদের দুটো দিক আছে। একটা হচ্ছে তার পর্যালোচনামূলক দিক, অন্যটা পরিগঠনমূলক দিক। পর্যালোচনামূলক দিকটা গড়ে উঠেছে এক দিকে মার্কসীয় কমিউনিজমের এবং অন্যদিকে উদারনীতিবাদী গণতন্ত্রের বা আনুষ্ঠানিক সংসদীয় গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা সংক্রান্ত আলোচনা নিয়ে। আর, পরিগঠনমূলক দিকটা গড়ে উঠেছে ব্যক্তির স্বাধীনতার ওপর সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ করার মধ্য দিয়ে, এবং র‍্যাডিক্যাল গণতন্ত্রের রূপরেখা প্রণয়ন ও তা অর্জনের উপায়-পদ্ধতি অনুসন্ধান সংক্রান্ত আলোচনার মধ্য দিয়ে। (রমেন্দ্র নাথ, ২০১১)

রমেন্দ্র নাথের মতোই, আমি এখানে প্রথমে ব্যক্তির স্বাধীনতা সম্পর্কে রায়ের র‍্যাডিক্যাল তথা 'মৌলিক রূপান্তরমুখিন' মানবতাবাদের উপলব্ধির দিকে নজর দেব। সেই সাথে দেখাব, ব্যক্তির স্বাধীনতা বিষয়ক ধ্যানধারণা রায়ের ক্ষেত্রে কীভাবে খোদ মনুষ্যস্বভাব বা মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে তাঁর বিশ্লেষণ ও উপলব্ধি থেকে উৎসারিত হয়েছে। এবং আগেই বলে রাখি, এর পরের অধ্যায়ে দেখানোর চেষ্টা করব, রায়ের চিন্তাধারা মোতাবেক, ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা কীভাবে ব্যক্তি-মানুষের শ্রেয়োবোধ (মরালিটি), নীতিবোধ

(এথিক্স), যুক্তিবোধ (রিজন) ও যুক্তিবাদিতা (র‍্যাশনালিটি) সম্পর্কে রায়ের ধারণারাজির সাথে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট থাকে, এবং উপরন্তু, এইসব ধারণাগুচ্ছ কীভাবে আবার খোদ ঐ মনুষ্যপ্রকৃতি বিষয়ে তাঁর উপলব্ধির সাথেই বিজড়িত হয়ে আছে। আর, রায়ের র‍্যাডিক্যাল গণতন্ত্রের রূপরেখা ও উপায়-পদ্ধতি তথা সমাজের নতুন বিন্যাস বিষয়ক আলোচনা হাজির থাকবে ষষ্ঠ এবং সমাপ্তি-অধ্যায়ে।

৪.২ বর্তমান গ্রন্থে আলোচ্য এম. এন. রায়ের মূল টেক্সটসমূহ

শিবনারায়ণ রায় তাঁর *এম. এন. রায়: দার্শনিক-বিপ্লবী* শীর্ষক গ্রন্থে "ঠাকুর, গান্ধী এবং রায়: বিংশ শতাব্দীর তিন ইউটোপীয়" নামের প্রবন্ধটিতে ভবিষ্যতের সমাজ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ, গান্ধী এবং রায়ের রূপকল্পনাসমূহের মধ্যে একেবারে গোড়ার জায়গায় যেসব মিল রয়েছে (অমিলের প্রসঙ্গগুলো বাদ দিয়ে নয় অবশ্যই) সেগুলোর দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে মানবেন্দ্রনাথের *নয়া মানবতাবাদ: একটি ইশতেহার* (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক), *যুক্তিবোধ, রোমান্টিকতা ও বিপ্লব* (এম. এন. রায়, ১৯৪৮) এবং *রাজনীতি, ক্ষমতা ও পার্টি* (এম. এন. রায়, ১৯৬০) বই তিনটির সাহায্য নিয়েছিলেন। শিবনারায়ণের মতে, জীবনের "শেষ পর্যায়ে" প্রণীত/প্রকাশিত এই রচনাগুলোতে মানবেন্দ্রনাথ "আধুনিক সভ্যতা সম্পর্কে তাঁর একেবারে শ্রেষ্ঠ পর্যালোচনা এবং বিকল্প সামাজিক বন্দোবস্ত সংক্রান্ত তাঁর রূপকল্পনা" উপস্থাপন করেছিলেন (শিবনারায়ণ রায়, ১৯৯৫: ২৫৪)।

সঙ্গত কারণেই শিবনারায়ণকে অনুসরণ করে আমিও আমার এই পর্যায়ের আলোচনার জন্য এই তিনটি গ্রন্থকে বিশেষভাবে বিবেচনায় নিয়েছি। সেই সাথে, অধিকতর নিশ্চিত হওয়ার জন্য, আমি দেখেছি তাঁর *নয়া অভিমুখ* (এম. এন. রায়, ১৯৪৬-ক), *কমিউনিস্ট ইশতেহার থেকে নয়া মানবতাবাদের দিকে* (এম. এন. রায়, ১৯৯৯) এবং *কমিউনিজম ছাড়িয়ে* (এম. এন. রায় এবং ফিলিপ স্প্র্যাট ১৯৪৭) বই তিনটি। এই তিনটি বইয়ের লেখা এবং বক্তৃতাগুলোও রায়ের জীবনের শেষ পর্যায়েরই রচনা। আর, বোম্বেতে অনুষ্ঠিত র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির তৃতীয় নিখিল ভারতীয় সম্মেলনে গৃহীত "র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির ২২টি মূলনীতি" (২২টি থিসিস) তো *নয়া মানবতাবাদ* গ্রন্থেই মুদ্রিত ছিল। (শেষোক্ত এই বইটির বঙ্গানুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য: এম. এন. রায়, ২০০৬-ক। কিন্তু অনুবাদ আমার ভালো লাগে নি।) যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে আমি খুঁটিয়ে দেখেছি, এই সব রচনার মধ্যে বক্তব্যের দিক থেকে প্রকৃত কোনো পার্থক্য নাই। বরং একই মূল বক্তব্য বারবার ঘুরেফিরে

হাজির হয়েছে একই গ্রন্থে ও পৃথক পৃথক গ্রন্থের নানা রচনায়।

আদতে *নয়া অভিমুখ*, *নয়া মানবতাবাদ: একটি ইশতেহার* এবং *রাজনীতি, ক্ষমতা ও পার্টি* গ্রন্থ তিনটিতেই তাঁর কহতব্যের প্রকৃত সারসংক্ষেপ ঘটেছে। এমনকি এসবের মধ্যেও পুনরুক্তি প্রচুর। যেহেতু তিনি প্রচারক ছিলেন, সুতরাং এ সব পুনরাবৃত্তি বোধগম্য। তথাপি ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তির একটি চমকে ওঠার মতো নমুনা দিই। *নয়া মানবতাবাদ: একটি ইশতেহার* এর 'পরিশিষ্ট — গ' এ "বিজ্ঞান ও সমাজ" নামের রচনাটি (পৃষ্ঠা ৮৩-৮৯), দুই-আড়াইটি অনুচ্ছেদ বাদ দিলে, হুবহু ছাপা হয়েছে "রাজনীতি ও নীতিবোধ" শিরোনামে *রাজনীতি, ক্ষমতা ও পার্টি* গ্রন্থে (পৃষ্ঠা ৪১-৪৬)। প্রথমটির আদি উৎস হিসেবে বলা আছে, এটি ১৯৪৯ সালের মে-জুন মাসে ভারতীয় রেনেসাঁ ইন্সটিটিউটের তত্ত্বাবধানে মুসোরিতে অনুষ্ঠিত 'সামার ক্যাম্প ফর হায়ার স্টাডিজ'-এ প্রদত্ত উদ্বোধনী বক্তৃতার সারসংক্ষেপ। অন্য দিকে দ্বিতীয় রচনাটির আদি উৎস হিসেবে বলা আছে, সেটি *দ্য র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট* পত্রিকার ১৯৫২ সালের ২রা মার্চ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। প্রায় একই রচনার এই দুই রকম শিরোনাম হতবুদ্ধিকরই বটে। কোথায় "বিজ্ঞান ও সমাজ", আর কোথায় "রাজনীতি ও নীতিবোধ"!!

অন্য দিকে, তাঁর কহতব্যের সারমর্মে পৌঁছানোর পথে অন্যদের যে বিপুল সব রচনা তাঁকে অধ্যয়ন করতে হয়েছিল সেই অধ্যয়নের বিস্তারিত পর্যালোচনা, গতিপ্রকৃতি ও হদিস পাওয়া যায় ১৯৪৮ সালের *যুক্তিবোধ, রোমান্টিকতা ও বিপ্লব* এর মধ্যে।

আর, এ সবের বাইরে *রুশ বিপ্লব এবং কমিউনিজমের দুর্দশা* (এম. এন. রায়, ২০০০) বইটি আমি হাতের কাছে রেখেছি রায়ের কমিউনিজম-পর্যালোচনার পূর্বাপর গতিপ্রকৃতিকে অনুধাবন করার জন্য।

৪.৩ রায়ের কেন্দ্রীয় প্রশ্ন: মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক স্বাধীনতা

"মানবপ্রকৃতির সারসত্তা হিসেবে স্বাধীনতা"র স্বরূপ সম্পর্কে রায়ের একেবারে গোড়ার কথা হচ্ছে:

> মানবপ্রকৃতির সারসত্তা কী, সে ব্যাপারে যদি আমরা সুস্পষ্ট না হই, তাহলে আমরা ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক বিষয়ে সঠিক বিচারে উপনীত হতে পারব না (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৭)।

মৌলিক রূপান্তরবাদী, তথা নয়া মানবতাবাদী, এম. এন. রায়ের যাবতীয় সামাজিক-রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্রে আছে মানুষের স্বাধীনতা, কিন্তু

কোনোক্রমেই তা জাতি-গোষ্ঠী-শ্রেণী-সম্প্রদায়ের স্বাধীনতা নয়; তাঁর কাছে স্বাধীনতা মানে স্রেফ ব্যক্তির স্বাধীনতা:

> র‍্যাডিক্যালিজম জাতি অথবা শ্রেণী আকারে চিন্তা করে না; এর বিষয় হলো মানুষ; স্বাধীনতাকে তা ধারণ করে ব্যক্তির স্বাধীনতা হিসেবে। ("একটি নতুন রাজনৈতিক দর্শন", এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৩৬)

রায়ের নয়া মানবতাবাদের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, ব্যক্তির স্বাধীনতার প্রশ্নে তা কোনো কিছুর সাথেই আপোস করতে রাজি না। ব্যক্তির বিকাশই তার যাবতীয় চিন্তাভাবনার কেন্দ্র। "র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসির মূলনীতি" হিসেবে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত ২২টি থিসিসের প্রথম থিসিসেই আছে,

> মানুষই সমাজের আদিরূপ। সহযোগিতামূলক সামাজিক সম্পর্করাজি ব্যক্তির সুপ্তশক্তির বিকাশে অবদান রাখে। কিন্তু সমাজপ্রগতির মাপকাঠি হচ্ছে ব্যক্তির বিকাশ। যূথবদ্ধতা নির্ভর করে ব্যক্তির অস্তিত্বের ওপর। স্বাধীনতা ও কল্যাণের সামষ্টিক যোগফল যদি খোদ ব্যক্তিরা উপভোগ না করে, তাহলে সামাজিক মুক্তি আর প্রগতি স্রেফ কাল্পনিক আদর্শ হিসেবেই থেকে যায়, কখনোই অর্জিত হয় না। কল্যাণ, যদি তা বাস্তব কল্যাণ হয়ে থাকে, তবে ব্যক্তিই তা উপভোগ করে। জাতি, শ্রেণী, ইত্যাদি যেকোনো ধরনের মানব সম্প্রদায়ের ওপর যূথবদ্ধতার অহং আরোপ করা ভুল, কেননা এ জাতীয় চর্চা ব্যক্তিকে বলি দিয়ে দেয়। যৌথ কল্যাণ ব্যক্তির কল্যাণের ওপরই নির্ভরশীল। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৫৩)

মানুষের স্বভাবপ্রকৃতি সংক্রান্ত ধারণা এম. এন. রায় গঠন করেন আদিতে মানুষের জৈব বিবর্তনের ইতিহাসের আলোকে। *যুক্তিবোধ, রোমান্টিকতা ও বিপ্লব* গ্রন্থের "মানবপ্রকৃতি" প্রবন্ধে এ নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন তিনি। দু-চার কথার মধ্যে তার সার-সংক্ষেপের চেষ্টা করা যেতে পারে। রায় এখানে দেখিয়েছেন,

> নতুন একটা জীবতাত্ত্বিক প্রজাতির উৎপত্তি ছাড়া পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের আর কোনো কারণ যেহেতু নাই, মানবজাতির বিকাশ সংক্রান্ত নিয়মগুলো সে ক্ষেত্রে জৈব বিবর্তনের সাধারণ নিয়মাবলী থেকে সারসত্তাগতভাবে পৃথক কিছু হতে পারে না। মানবপ্রকৃতিও, সুতরাং, ঐ সব নিয়মাবলী দ্বারাই নির্ধারিত হয়। (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ১৪-১৫)

প্রাণী হিসেবে মানুষের বিবর্তনের গতিপ্রকৃতিকে রায় দেখেন মানুষের স্বাধীনতার নিরিখে। তাঁর মতে, "অস্তিত্বের জীবতাত্ত্বিক সংগ্রামে প্রত্যেকটা

সাফল্যকেই স্বাধীনতার পশ্চাদ্ধাবনের একেকটি অভিযাত্রা হিসেবে আখ্যায়িত করা যেতে পারে" (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ২৪)। স্বাধীনতার পেছনে এই অনন্ত অনুসন্ধান অগ্রসর হয় যুক্তিবোধের পথে। এভাবে, বিবর্তনের সুদীর্ঘ পরিক্রমায় "মনুষ্যত্ব বলে যে তলানিটুকু" থাকে, সেটি আসলে "যুক্তিবোধের জীবতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার"ই বটে। তাঁর মতে, "কথাটিকে অন্যভাবে বললে, বিশ্বাস-প্রবণতা মানবপ্রকৃতি নয়, বরং স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম এবং সত্যের অনুসন্ধান করা"ই হচ্ছে মানুষের স্বভাব (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ১৮)। আরো একটু ভেঙে বললে,

> স্বাধীনতার পশ্চাদ্ধাবন করার জীবতাত্ত্বিক উত্তরাধিকার ইতোমধ্যে বর্বরদের মধ্যে জ্ঞানের তাড়না সৃষ্টি করেছিল, যা তাকে দিয়েছিল প্রকৃতির শক্তিসমূহের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা। সত্যের জন্য অনুসন্ধান তাহলে অন্তরঙ্গভাবে সংশ্লিষ্ট স্বাধীনতা-সন্ধিৎসার সাথে; আর এই স্বাধীনতা-সন্ধিৎসাই মানবপ্রকৃতির সারসত্তা। (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ২৫)

আবার, *যুক্তিবোধ, রোমান্টিকতা ও বিপ্লব* গ্রন্থের "নয়া মানবতাবাদ" প্রবন্ধে মানবেন্দ্রনাথ রায় বলছেন, "স্বাধীনতার তাড়নাই হচ্ছে জীবনের প্রাথমিক প্রণোদনা" (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ৪৯৯)।

৪.৪ ব্যক্তি-স্বাধীনতা ও সামাজিক বন্দোবস্ত

শুধু তা-ই নয়, ব্যক্তির সাথে সমাজের সম্পর্ক বিষয়ক আলাপও রায় আরম্ভ করেন মানবপ্রকৃতির সারসত্তাগত স্বাধীনতার জায়গা থেকে:

> ব্যক্তি ও সমাজের সম্পর্ক নিয়ে দুই থোকা মতামত রয়েছে। ... একটা মত হচ্ছে সমাজকে সদা-বিরাজিত সত্য বলে ধরে নেওয়া এবং তারপর সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ককে খাপ খাইয়ে নেওয়ার উপায় ও পদ্ধতি খুঁজে বের করা। সমাজ আগে থেকেই আছে; ব্যক্তি সমাজের একটা অংশ; সে তাতে বসবাস করে। সুতরাং, একটা সুসঙ্গতিপূর্ণ জীবন যদি পেতে হয়, ব্যক্তির নিজেকে অবশ্যই সমাজের সাথে মানিয়ে নিতে হবে।
>
> অপর মতটা ঠিক এর বিপরীত। এতে ব্যক্তিকে প্রাথমিক ঘটনা হিসেবে এবং সমাজকে মানুষের সৃষ্টি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। সমাজকে মানুষ সৃষ্টি করেছে তার নিজের উদ্দেশ্যে। যুক্তিপ্রণালীগত দিক থেকে এই মতের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হচ্ছে, সামাজিক সম্পর্করাজিকে (অর্থাৎ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, নীতিশাস্ত্রীয়, সামাজিক সম্পর্কসমূহের নানান ধরনকে) এমনভাবে খাপ খাইয়ে নিতে হবে যাতে করে ব্যক্তির

জীবনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেওয়া যায়।

পরিজ্ঞাত সমাজচিন্তক এবং সামাজিক তত্ত্ববিশারদবৃন্দের মধ্যে প্রথমোক্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই অধিকতর সুবিস্তৃতভাবে প্রচলিত। ইতিহাসের দিক থেকে, এইটা প্রাচীনতর দৃষ্টিভঙ্গিও বটে। ...

অপর মতটারই আমি অংশীদার ...। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৩)

ব্যক্তির স্বাধীনতার ধারণা সম্পর্কে রায়ের অবস্থানের একটা দিক হচ্ছে ব্যক্তির সামাজিক সত্তার সাপেক্ষে তাকে বিবেচনা করা:

স্বাধীনতার তাড়না সম্পর্কে যদি আমি সচেতন হই, যদি আমি অনুভব করি যে বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে, নীতিনৈতিকতাগতভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে নিজেকে বিকশিত করার স্বার্থে আমার এমন ধরনের সামাজিক সংগঠন লাগবে যেখানে অপরাপর ব্যক্তিবর্গ আমার স্বাধীনতার সীমা লঙ্ঘন করবে না, তাহলে তক্ষুণি আমি এ কথা উপলব্ধি করব যে এরকম একটা সামাজিক সংগঠন পেতে আমি সক্ষম হব শুধুমাত্র যদি আমি সমাজের অপরাপর সদস্যদেরকে একই জিনিসের নিশ্চয়তা দিতে প্রস্তুত থাকি। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৮-৩৯)

১৮৭১ সালে "মানুষ, সমাজ ও স্বাধীনতা" (১৮৭১) নামের এক রচনায় নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন যা বলেছিলেন তা যেন নয়া মানবতাবাদী রায়ের উপরোক্ত সিদ্ধান্তটিতে পৌছানোরই যুক্তিপ্রণালী:

আমি স্বাধীন বোধ করতে পারি শুধুমাত্র অন্যের উপস্থিতিতে, অন্যের সাথে সম্পর্কযুক্ত অবস্থায়। অধস্তন একটি পশু প্রজাতির সামনে তো না আমি স্বাধীন, না আমি মানুষ, কেননা এই পশু তো আমার মানবীয়তা বোঝে না, ফলে তার স্বীকৃতিও দেয় না। যতক্ষণ না আমি আমার সমস্ত সঙ্গীসাথীদের স্বাধীনতা আর মানবীয়তাকে স্বীকার করছি, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি নিজে স্বাধীনও না, মানুষও না।

তাঁদের মানবীয় বৈশিষ্ট্য শ্রদ্ধা করার মধ্য দিয়েই আমি আমার নিজের মানবীয় বৈশিষ্ট্যকে শ্রদ্ধা করি। ... একজন দাসমালিক মানুষ নয়, প্রভু।

...

তখনই আমি সত্যিকারের স্বাধীন হতে পারি যখন মানুষজন, নারী ও পুরুষ, একইরকমভাবে স্বাধীন। অন্য মানুষদের স্বাধীনতা আমার স্বাধীনতাকে খারিজ করা তো দূরের কথা, বরং তা আমার স্বাধীনতার প্রয়োজনীয় ভিত্তি এবং নিশ্চয়তা। আমার স্বাধীনতার পথে যা বাধা সৃষ্টি করে সেটা হচ্ছে অন্য মানুষদের দাসত্ব ...। (বাকুনিন ১৯৭১: ২৩৭)

৪.৫ মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত ভুল ধারণা

কলকাতায় ১৯৫১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদীদের প্রথম নিখিল ভারতীয় কনভেনশনের উন্মুক্ত অধিবেশনে "রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা সংক্রান্ত বিবৃতি" উপস্থাপন করার সময় বক্তৃতার শুরুতেই রায় বলেন, স্মরণাতীত কাল থেকে সামাজিক দর্শনকে অকার্যকর করে রেখেছে "মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত ভুল ধারণা" (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৯৩)। তাঁর *নয়া মানবতাবাদ* গ্রন্থ থেকে আমি উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অনুশীলন সামাজিক সম্পর্কসমূহেরই রূপ, এবং এগুলো, চূড়ান্ত বিচারে, ব্যক্তিবর্গের মধ্যকার সম্পর্কই বটে। রাজনৈতিক তত্ত্বাবলী ও অর্থনৈতিক মতবাদসমূহ সমেত সামাজিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক ক্যাটেগরি হচ্ছে ব্যক্তি-মানুষ। সুতরাং, মানবপ্রকৃতি সংক্রান্ত সঠিক একটি ধারণাই হবে সেই সামাজিক অনুশীলনের পার্থক্য-বিন্দু, যে অনুশীলন হতাশা ও অসহায়ত্বের বর্তমান পরিবেশ থেকে বেরুনোর একটা পথ দেখাতে পারে। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৯৩)

৪.৫.১ জন্মগতভাবে মানুষ স্বার্থপর, অর্থনৈতিক প্রাণী নয়

ঐ একই বক্তৃতায় রায় বুঝিয়ে বলেন (বলতে গেলে আমি স্রেফ অনুবাদ করে দিচ্ছি): এতকাল ধরে "মানুষের স্বভাব" সম্পর্কে প্রাথমিক দুটি অনুমান সত্য বলে ধরে নেওয়া হয়েছে। এর একটা হলো: হয় মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই স্বার্থপর, অথবা সহজাত প্রবৃত্তির কারণেই সে শুধু তার নিজের সুবিধা-অসুবিধাটুকু দেখে। দ্বিতীয়টা হলো: মনুষ্যস্বভাবই এমন যে তা কিছু একটা সদাশয় অতিপ্রাকৃত শক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে। এদের যেকোনো একটা সঠিক বলে ধরে নিলে সমাজকে জবরদস্তিমূলক সংগঠন হিসেবে ধরে নেওয়া ছাড়া পথ থাকে না— হয় সেটা মনুষ্যপ্রণীত আইনে পরিচালিত হবে, নতুবা ঐশ্বরিক প্রত্যাদেশে। উভয়েরই লক্ষ্য মানুষের মধ্যকার দুষ্ট প্রবৃত্তিকে দমন করা। উভয় ক্ষেত্রেই সমাজকে হতে হয় কারাগার— দণ্ডমূলক বা সংশোধনমূলক। একটাতে রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের কাছে মানুষের জন্মগত স্বাধীনতা সঁপে দিতে হয়, অন্যটাতে অতিপ্রাকৃত শক্তিসমূহের কাছে, যা তার জন্য নিতান্তই বোধগম্যতার অতীত। উভয় ক্ষেত্রেই মানুষ অসহায়। সামাজিক সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রে তার কোনো স্বাধীনতা থাকে না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে তার কোনো উদ্যোগ থাকে না। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৯৪)

রায়ের মতে, মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে বিদ্যমান এইসব ধারণা মোতাবেক

চললে বাস্তব ক্ষেত্রে স্বাধীনতা ও সমতার নিশ্চয়তা দেওয়ার মতো কোনো সামাজিক দর্শন দাঁড় করানো সম্ভব হয় না। এরই ফলাফল হচ্ছে সভ্যতার আজকের দিনের সংকট। সকলেই এই সংকট নিয়ে কথা বলেন। তাঁদের যোগ্যতার অভাব নাই। কিন্তু কেউই সংকটের এই গোড়াটার দিকে তাকান না। মার্কসের অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদে কেউ বিশ্বাস করেন না। কিন্তু, মার্কসবাদের মতোই আধুনিক উদারনৈতিক সমাজতাত্ত্বিকেরাও "অর্থনৈতিক মানুষ" এর মতবাদকে খারিজ করেন না। উভয় ধারাই মানুষকে দেখে "অর্থনৈতিক সত্তা" হিসেবে। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৯৪)

তো, রায়ের সিদ্ধান্ত হচ্ছে, মানুষ যদি স্রেফ একটা অর্থনৈতিকপ্রাণীই হতো, তাহলে বস্তুগত লাভালাভ সংক্রান্ত স্বার্থপরতাই হতো তার প্রধান বৈশিষ্ট্য, কিন্তু আদতে সে তা নয়।

এখানে আমাদের মনে পড়ে যায় ভিলহেল্ম হোমবল্টের কথা। বেশ খানিকক্ষণ আগে আলোচিত *রাষ্ট্রকর্মের সীমা* গ্রন্থে হোমবল্টও মানুষের সত্তা সংক্রান্ত এই একই প্রসঙ্গ তুলেছিলেন। মানুষের সত্তাকে স্রেফ স্বার্থপর হিসেবে দেখতে না চাওয়ার ক্ষেত্রে রায়ের বক্তব্যে হোমবল্টের, তথা আলোকায়নের মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্যের, স্বভাবিক 'অনুসৃতি'ই যেন ফুটে ওঠে:

> স্বার্থপর কাজের তুলনায় পরোপকারী কাজের দিকেই মানুষের ঝোঁক বেশি। আমরা তা জানতে পারি বর্বরদের ইতিহাস থেকে। তাদের ঘরোয়া গুণাবলীর ভেতরে অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও বন্ধুত্বপরায়ন এমন কিছু আছে, আর তাদের মানুষজনের সার্বজনিক গুণাবলীর মধ্যে অত্যন্ত মহীয়ান ও অনুপ্রেরণাদায়ী এমন কিছু আছে যে, যে-লোককে দুর্নীতিগ্রস্ত না-বলা কঠিন তেমন কারো পক্ষেও, তাদের প্রতি মন্ত্রমুগ্ধ হওয়াটাকে ঠেকানো রীতিমতো কঠিন। (হোমবল্ট ১৭৯২: ১৯৭)

মানবপ্রকৃতি ও স্বাধীনতা সম্পর্কে তো আগের অংশেই দেখেছি, এ প্রসঙ্গেও দেখছি নৈরাজ্যবাদীদের অবস্থান একই রকমের— রায়ের মতোই, হোমবল্টের মতোই। সম্প্রতি ফেসবুকে "নৈরাজ্য, নীতিবোধ, রাজনীতি" নামে আমার একটি নোটকে কেন্দ্র করে সামান্য তর্ক উস্কে উঠলে নিজেকে "অ্যানার্কো-লিবার্টারিয়ান" হিসেবে পরিচয়দানকারী উচ্চশিক্ষার্থে অস্ট্রেলিয়া-প্রবাসী গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক, বখতিয়ার আহমেদ যে ঝটিকা মন্তব্য করেন, তাও এই প্রসঙ্গে রীতিমতো প্রণিধানযোগ্য:

> নৈরাজ্যের চূড়ান্ত লক্ষ্য নৈরাজ্যই, এনার্কি ইজ অর্ডার। আর সব রাজনৈতিক দর্শন মানুষকে প্রাকৃতিকভাবে হিংস্র, স্বার্থপর মনে করে

(হবসের কল্পনা) এবং হানাহানিকেই আদি শাশ্বত সামাজিক দশা মনে করে। ফলে রাষ্ট্রকে বলপ্রয়োগের সার্ব্বভৌম ক্ষমতা দেয়া হয় একজন আরেকজনকে দেখিবামাত্র খুন করবার একটা সম্ভাবনাকে সমাজের প্রকৃতি অনুমান করে। খুনোখুনিকেই আদি মানব-দশা বা অর্ডার বোঝানো হয়। মনে করা হয় আইনের শাসন, কারাগার, এবং শাস্তির সার্বক্ষণিক একটা আতঙ্ক না থাকলে মানুষ মানুষ থাকবে না।

অন্যদিকে নৈরাজপন্থীরা মনে করেন একে অন্যকে সহযোগিতাই হচ্ছে মানবপ্রকৃতি। এবং মানুষ এটা রাষ্ট্রের খবরদারি, আইনি ব্যবস্থা এবং কোনো ধরনের হুজুরদের উপস্থিতি ছাড়াই করতে সক্ষম। রাষ্ট্রের দাপুটে ইতিহাস আমাদের এই সত্যটা ভুলিয়ে দেয় যে মানবেতিহাসের ৯৯% ভাগ সময় জুড়ে সব মানব সমাজ, এবং গত শতাব্দীর আগ পর্যন্ত পৃথিবীর বেশির ভাগ জায়গার মানুষেরা সেটা করেছে। নৈরাজপন্থীরা আস্থা রাখেন মানুষের অনাদি মমত্ববোধের উপর, সমাজের মধ্যে অরাজনৈতিক (কর্তৃত্বহীন) ক্ষমতা চর্চার উপর। তারা মনে করেন কর্তৃত্ব ছাড়াও নেতৃত্ব সম্ভব। রাষ্ট্রীয় আয়োজনে সংখ্যাগরিষ্ঠের গণতন্ত্রকে তারা সামরিকতন্ত্রেরই নামান্তর মনে করেন কারণ এখানেও একটি ছোট্ট 'নির্বাচিত' দলকে বৃহদাংশের উপরে বলপ্রয়োগের ক্ষমতা দেয়া হয়। নৈরাজপন্থীরা মনে করেন, একটি সমাজের প্রয়োজনীয় সব সিদ্ধান্ত প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের মাধ্যমে, সকলের সম্মিলিত অংশগ্রহণে নেয়া সম্ভব। (বখতিয়ার আহমেদ, ফেসবুকে 'সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-ঙ'-এর ওপর তাৎক্ষণিক মন্তব্য)

৪.৫.২ জন্মগতভাবে মানুষ হিংস্র নয়, সহযোগিতাপ্রবণ

মানুষ যে "প্রাকৃতিকভাবে হিংস্র, স্বার্থপর" নয়, বরং "একে অন্যকে সহযোগিতাই যে মানবপ্রকৃতি", নৈরাজ্যবাদীদের এই বিশ্বাসকে বিজ্ঞানসম্মত পর্যবেক্ষণ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেন রুশ প্রকৃতিবিজ্ঞানী ও নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক-বিপ্লবী পিটার ক্রপোৎকিন তাঁর *পারস্পরিক সহযোগিতা: বিবর্তনের একটি উপাদান* গ্রন্থে (ক্রপোৎকিন, ১৯০২; গ্রাহাম পারচেজ, ২০০৩)। ক্রপোৎকিনের সুবিস্তারিত প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণের তাৎপর্যসমূহের দুর্দান্ত একটি সারসংক্ষেপ করেছেন হুডস্ক হকার। দীর্ঘ হলেও উদ্ধৃতি দিচ্ছি:

> নৈরাজ্যবাদ একজন মূল্যবান প্রবক্তাকে পেয়েছিল পিটার ক্রপোৎকিনের মধ্যে। নৈরাজ্যবাদ বিষয়ক সমাজতাত্ত্বিক ধ্যানধারণার বিকাশের ক্ষেত্রে আধুনিক প্রকৃতি-বিজ্ঞানের অর্জনগুলাকে সুলভ করে তোলার কাজকে ইনি নিজের কাজ হিসেবে ঠিক করেছিলেন। তাঁর *পারস্পরিক সাহায্য:*

বিবর্তনের একটা উপাদান নামক সুযুক্তিনিষ্পন্ন গ্রন্থটিতে তিনি সামাজিক ডারউইনবাদের বিরোধীদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হন। সামাজিক ডারউইনবাদের প্রবক্তারা প্রমাণ করার চেষ্টা করছিলেন, বিদ্যমান সামাজিক অবস্থা অপরিহার্য। এটা তারা করছিলেন অস্তিত্বের সংগ্রাম সংক্রান্ত ডারউইনীয় তত্ত্বের সাহায্যে। দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের সংগ্রামকে তারা সমস্ত প্রাকৃতিক প্রক্রিয়াদির লৌহ-আইনের মর্যাদায় তুলে ধরেছিলেন— এমনকি মানুষকেও তারা এই লৌহ-আইনের অধীনস্ত করেছিলেন। ধারণাটা বাস্তবে এই ম্যালথাসীয় মতবাদ দ্বারা শক্তপোক্তভাবে প্রভাবিত ছিল যে, জীবনের সারণী সকলের জন্যে বিন্যস্ত নয় এবং যারা অপ্রয়োজনীয় তাদেরকে এ সত্যটা স্রেফ মেনে নিতে হবে।

ক্রপোৎকিন দেখালেন, সীমাহীন যুদ্ধ-সংগ্রামের একটা ক্ষেত্র হিসেবে প্রকৃতিকে দেখার ধারণাটা সত্যিকারের জীবনের একটা ব্যঙ্গচিত্র মাত্র। তিনি আরও দেখালেন, অস্তিত্বের স্বার্থে দাঁত আর থাবার সাহায্যে পরিচালিত নির্দয়-নিষ্ঠুর সংগ্রামের সাথে সাথে প্রকৃতিতে আরও একটা মূলনীতি বিদ্যমান আছে। দুর্বলতর প্রজাতিগুলার সামাজিক মৈত্রী এবং সহজাত সমাজ-প্রবৃত্তি ও পারস্পরিক সাহায্যের মাধ্যমে জ্ঞাতি-গোষ্ঠী-গোত্রসমূহের রক্ষণাবেক্ষণের মধ্য দিয়ে এই মূলনীতিটার প্রকাশ ঘটে।

এই অর্থে মানুষ সমাজের স্রষ্টা নয়, বরং সমাজই মানুষের স্রষ্টা। কেননা সে তার আগে থেকেই বিদ্যমান প্রকৃতির কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছে সমাজ-প্রবৃত্তি। আর এই সমাজ-প্রবৃত্তিই তাকে তার আদিতম প্রথম পরিবেশের মধ্যে অন্যান্য প্রজাতির শারীরিক শ্রেষ্ঠত্বের বিরুদ্ধে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতে সক্ষম করে তুলেছে এবং তার বিকাশের স্বপ্নাতীত এক উচ্চতা নিশ্চিত করেছে। অস্তিত্বের সংগ্রামের দ্বিতীয় এই প্রবণতাটা প্রথমটার চেয়ে বহুলাংশে শ্রেষ্ঠ। যেসব প্রজাতির কোনো সামাজিক জীবন নাই এবং যারা স্রেফ তাদের শারীরিক শক্তির উপর নির্ভরশীল, তাদের ধীর-ধারাবাহিক অধঃপতনের মধ্য দিয়ে এই শ্রেষ্ঠত্ব ফুটে ওঠে। প্রকৃতিবিজ্ঞানে এবং সমাজ-গবেষণায় এখন পূর্বাপর সঙ্গতিপূর্ণভাবে অধিকতর স্বীকৃতি অর্জনরত এই দৃষ্টিভঙ্গি মানবীয় বিবর্তন সংক্রান্ত অনুমানের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নতুন নতুন দৃশ্যপট উন্মোচন করেছে।

সত্য হচ্ছে এই যে, এমনকি সবচে জঘন্য উৎপীড়ক স্বৈরতন্ত্রের অধীনেও সঙ্গী-সাথী-সহকর্মীদের সাথে মানুষের সম্পর্ক-আত্মীয়তার আয়োজনাদি নিষ্পন্ন হয় স্বাধীন বন্দোবস্ত আর সংহতিমূলক যৌথতার মাধ্যমে। এটা ছাড়া সামাজিক জীবন মোটে সম্ভবই হতো না। তাই যদি

> না হতো, তাহলে রাষ্ট্রের এমনকি সবচে শক্তিশালী জবরদস্তিমূলক হাতিয়ারপাতি দিয়েও সামাজিক সুবন্দোবস্ত মাত্র এক দিনের জন্যেও টিকিয়ে রাখা যেত না। মানুষের এসব আচার-ব্যবহারের আঙ্গিকগুলো একদমই স্বাভাবিক [প্রাকৃতিক]। আর, এই আঙ্গিকগুলো উঠে আসে মানুষের একেবারে অন্তরের স্বভাব থেকে। আজকের যুগে অর্থনৈতিক শোষণ আর সরকারী অভিভাবকত্বের পরিণামে অবশ্য মানুষের স্বাভাবিক আচার-ব্যবহারের এসব ধরনের ওপর লাগাতারভাবে হস্তক্ষেপ ঘটছে আর সেগুলা কুঁকড়ে পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। এই অর্থনৈতিক শোষণ আর সরকারী অভিভাবকত্ব মানবসমাজে অস্তিত্বের সংগ্রামের নির্দয় রূপবিন্যাসটার প্রতিনিধিত্ব করে। এই সমস্যাকে জয় করতে হবে পারস্পরিক সাহায্য আর স্বাধীন যৌথতার অপর যে রূপবিন্যাসটা আছে সেটা দিয়ে। স্বাধীনতার মধ্যেই সবচেয়ে ভালোভাবে বিকশিত হয় ব্যক্তিগত দায়িত্ববোধের চেতনা এবং অপর সেই মহার্ঘ সদগুন, কোন সুদূর অতীতের দুনিয়া থেকে যেটা মানুষের কাছে এসে পৌছেছে: সেই সদগুণটা হলো: অন্যের সাথে সহমর্মিতা-সমবেদনা বোধ করার সক্ষমতা, যার মধ্যে নিহিত আছে সকল প্রকার সামাজিক নৈতিকতা, আর সামাজিক ন্যায়বিচারের যাবতীয় ধ্যানধারণা। (হুডল্ফ হকার, ২০১১)

আমাদের এম. এন. রায়ের মধ্যেও আমরা পরস্পর-সহযোগিতার প্রশ্নে এই একই রকম সুর পাই:

> মানবপ্রজাতি যখন থেকে অস্তিত্বমান হয়ে ওঠে, তখন থেকেই তা যৌথ জীবনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। প্রকৃতির শক্তিমত্তার সাথে লড়াই করার জন্য এবং বিভিন্ন প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা করার জন্য আদিম মানুষজন পরস্পর-সহযোগিতার প্রয়োজন বোধ করেছিল, এবং পরস্পর-সহযোগিতা সংগঠনের একটা ধরন। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৩)

পঞ্চম পাঠ

যুক্তিবোধ নীতিবোধ শ্রেয়োবোধ ও স্বাধীনতা



এম. এন. রায়ের পোর্ট্রেট: ১৯৩৮–১৯৩৯।



পঞ্চম পাঠ

যুক্তিবোধ নীতিবোধ শ্রেয়োবোধ ও স্বাধীনতা

> প্রত্যেক ব্যক্তিই যুক্তিবোধসম্পন্ন বিচারবুদ্ধিতে পৌছাতে সক্ষম, এবং সমাজ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে দেওয়া। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে পথ প্রদর্শনের মতো কোনো কর্মসূচি বা নীলনকশা প্রণয়ন করা সম্ভব না। যুক্তিবোধসম্পন্ন ও নীতিবোধসম্পন্ন বিচারবুদ্ধিতে পৌছানোর মতো স্বাধীন মনুষ্য-সন্তান হিসেবে ব্যক্তি যতটা বেড়ে উঠবে, সেই অনুপাতে এটা সুসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠবে। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৮)

৫.১ স্বাধীনতা ও শ্রেয়োবোধ বিবর্তনসূত্রে বিজড়িত

নৈরাজ্য-চিন্তনে নৈতিকতা, ন্যায়বিচার, সংহতি, সহযোগিতা প্রভৃতি ধারণা জৈব বিবর্তনের সূত্রে কীভাবে মানুষের স্বাধীনতার সাথে ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত, তার ইশারা হকারের উপরে প্রদত্ত সুদীর্ঘ উদ্ধৃতিটাতে (আগের অধ্যায়ের শেষ উদ্ধৃতি: ৪.৫.২ অংশে), বিশেষত এর শেষ বাক্যটাতে, দিব্যি দেখতে পাওয়া যাচ্ছে।

৫.১.১ নীতিবোধ ও নীতিহীনতা: ডারউইনবাদ, নিৎশে ও ক্রপোৎকিন

নীতিবোধ ও শ্রেয়োবোধ সংক্রান্ত নৈরাজ্য-চিন্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রকাশ ঘটেছে ক্রপোৎকিনেরই *নীতিবোধ: উৎপত্তি ও বিকাশ* গ্রন্থে (ক্রপোৎকিন, ১৯২৪)। তাঁর শেষ জীবনের এই বিশালায়তন কাজটি আসলে তাঁর *পারস্পরিক সহযোগিতা* গ্রন্থেরই ধারাবাহিকতা। এখানে তিনি ধর্মীয় ও অধিবিদ্যক ঘোর থেকে নীতিবোধকে মুক্ত করে তোলেন এবং মানবীয় আচরণ ও নীতিশিক্ষাকে সামাজিক বিবর্তন ও প্রাকৃতিক পরিবেশের বাস্তব নিরিখে পর্যালোচনা করেন; নীতিবোধকে তিনি দেখেন আদিম সমাজ থেকে শুরু করে আধুনিক রাষ্ট্র পর্যন্ত সময়কার মানুষের নিত্যদিনের বাস্তব আচরণের ভেতর দিয়ে (ফ্রায়েডল্যান্ড এবং প্রিয়শ্নিকফ, "অনুবাদকদের ভূমিকা"; ক্রপোৎকিন, ১৯২৪)।

উনবিংশ শতকের শেষ দুই দশকে তিনি এই কাজে পুরোপুরি ব্যাপৃত হয়ে

ওঠেন, যখন নাকি সাহিত্যজগতের লোকজনের মধ্যে এই ধারণার বিস্তার ঘটতে শুরু যে নীতিবোধের কোনো প্রয়োজন নাই; বিশেষত নিটশের অ-নীতিবোধের দর্শন এ সময় সবার মনোযোগের কেন্দ্রে এসে হাজির হচ্ছিল। আবার এটাই ছিল সেই সময় যখন ডারউইনবাদের প্রভাবে বিজ্ঞান ও দর্শনচিন্তার অনেক প্রতিনিধিই একবারে আক্ষরিক অর্থে বলতে শুরু করেন, পৃথিবীতে একটাই সাধারণ আইন আছে, আর সেটি হলো 'অস্তিত্বের সংগ্রামের আইন'; তাঁদের এই অনুমান সমর্থন জোগাতে থাকে দার্শনিক অ-নীতিবোধকে।

৫.১.২ প্রকৃতি নীতিবোধহীন নয়, মানুষও তা-ই

ক্রপোৎকিন দেখালেন, প্রকৃতি নিজে নীতিবোধহীন নয়, মানুষকে তা পাপ করতে শেখায় না, সামাজিক জীবনের বিবর্তনের পরিণামে প্রাকৃতিক উৎপাদ হিসেবেই বরঞ্চ গড়ে ওঠে শ্রেয়োবোধের ধারণা, এবং তা শুধু মানুষের বেলায়ই নয়, প্রাণীজগতের বেলায়ও সত্য। যৌথ, সামাজিক জীবনযাপনের পরিণামেই মানুষের মধ্যে সামাজিকতা, পারস্পরিক সহযোগিতা, সংহতি, সহানুভূতি, ভালোবাসা, পরোপকার-প্রবৃত্তি, মহানুভবতা, ন্যায়বিচার, আত্মত্যাগ, অপরের সাথে দুঃখ-দুর্দশা ভাগ করে নেওয়ার মানসিকতা প্রভৃতি গুণাবলীর বিকাশ ঘটে এবং এই সব মানবীয় প্রবৃত্তিই মানুষের যাবতীয় নীতিবোধ ও শ্রেয়োবোধের ভিত্তি। আরো যে মারাত্মক দিকটির দিকে ক্রপোৎকিন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন, তা হচ্ছে বিপ্লবীদের ও কমিউনিস্টদের জীবনযাপনের ভেতরকার নীতিবোধগত অসঙ্গতি। [কমিউনিস্ট বলতে এখানে শুধু মার্কসীয় কমিউনিস্টদেরকে বোঝানো হচ্ছে না। অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজমের বিপরীতে ক্রপোৎকিন নিজেকে অ্যানার্কো-কমিউনিস্ট বলতেন। প্রধানত তাঁর প্রভাবে অরাজক-কমিউনিজম নৈরাজ্যবাদের আলাদা একটি ধারা হিসেবেই আত্মপ্রকাশ করেছিল।] তিনি আরো খেয়াল করেন, রুশ বিপ্লব যে স্বাধীনতা ও ন্যায়বিচারের মূলনীতির ভিত্তিতে নতুন একটি সমাজ গঠন করতে ব্যর্থ হলো, সেটা তাঁদের নিত্যদিনের অনুশীলনের মধ্যে নীতিবোধগত এই অসঙ্গতির কারণেও বটে। (ন. লেবেদেভ, "সম্পাদকের ভূমিকা": ক্রপোৎকিন, ১৯২৪)

রায়ের বিপুল অধ্যয়নের পরিচয় বহনকারী *যুক্তিবোধ, রোমান্টিকতা ও বিপ্লব* বইয়ের শেষে এই বইয়ে রায় কর্তৃক উল্লেখকৃত পণ্ডিত-তাত্ত্বিকদের এবং গ্রন্থসমূহের নয় পাতা ব্যাপী যে তালিকা দেওয়া আছে তাতে নৈরাজ্যবাদী ধারার চিন্তকদের মধ্যে প্রুঁধো ও উইলিয়াম গডউইনের নাম-রচনার উল্লেখ থাকলেও ক্রপোৎকিনকে দেখা যায় না (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ৫০০-

৫০৯)। ক্রপোৎকিনের রচনাদির সাথে, বিশেষত উপরোক্ত দুই মৌলিক কাজের সাথে, তাঁর পরিচয় থাকলে যে তিনি আনন্দিত হতেন তাতে আমার অন্তত কোনো সন্দেহ নাই। নীতিবোধ সংক্রান্ত নৈরাজ্যিক চিন্তনের সাথে রায়ের এ সংক্রান্ত উপলব্ধির ঘনিষ্টতা কিছুতেই চোখ এড়ানোর মতো নয়।

নৈরাজ্যবাদীদের মতোই, তিনিও 'সহযোগিতামূলক সামাজিক সম্পর্করাজি'র কথা ভেবেছেন (২২টি থিসিসের প্রথম থিসিস: এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৫৩), সমাজবদ্ধ হওয়ার প্রবণতাকে 'সহজাত মানব-প্রবৃত্তি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৭), 'পরস্পর-সহযোগিতা'কে 'সংগঠনের একটা ধরন' হিসেবে শনাক্ত করেছেন (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৩)।

৫.১.৩ নীতিবোধ, যুক্তিবাদিতা ও বিচারবুদ্ধি মানুষের সহজাত প্রবৃত্তি

তিনিও মানুষের নীতিবোধের উৎস খোঁজেন তার সামাজিক বিবর্তনের শেকড়গুলোর ভেতরে। উপরন্তু যুক্তিবোধ, তাঁর মতে, মানবপ্রকৃতির অংশ:

> সহজাত প্রবৃত্তি বলে যাকে আখ্যায়িত করা হয় সেটা স্রেফ যুক্তিবাদিতারই আদিম অথবা অবিকশিত একটা রূপ। জৈব বিবর্তনের কার্যসাধন-পদ্ধতি সংক্রান্ত জ্ঞান এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছায় যে মানবপ্রবৃত্তি তার সারসত্তাগত দিক থেকে যুক্তিবাদী। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৭)

রায়ের মতে, যাবতীয় নীতিবোধ ও শ্রেয়োবোধের গোড়ায় আছে মানুষের ভালোমন্দের বোধ, মন্দ থেকে ভালোকে পৃথক করতে পারার মতো বিচারবুদ্ধিগত সক্ষমতা, তথা যুক্তিবোধ। বিচারবুদ্ধিগত এই সক্ষমতা মনুষ্য-স্বভাবের ভেতরেই "অন্তর্জাত অবস্থায়" থাকে (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৮):

> নীতিনৈতিকতা সংক্রান্ত বিচারবুদ্ধির সক্ষমতা যদি খোদ মানুষের মধ্যে অন্তর্জাত অবস্থায় না থাকে, তাহলে স্বাধীনতার মৌলিক তাড়নার পরিপূরণ হতে পারবে না। কেননা মানুষকে তাহলে অবশ্য-অবশ্যই কতিপয় নিয়মকানুন অথবা রীতির কাছে বশ্যতা স্বীকার করতে হবে, যেসব নিয়মরীতি নানান বহিরাগত এজেন্সি তার জন্য বিছিয়ে রেখেছে। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৮)

আবার তাঁর "র‍্যাডিক্যাল ডেমোক্রেসি সংক্রান্ত ২২টি থিসিস" এর চার নম্বর থিসিসে তিনি বলছেন, যুক্তিবোধ নিজেই মানুষের একটা "জীবতাত্ত্বিক ধর্ম" (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৫৪)। এটি তাঁর ধ্রুপদী গ্রন্থ *যুক্তিবোধ,*

রোমান্টিকতা ও বিপ্লব এর "মানবপ্রকৃতি" প্রবন্ধে উপনীত উপলব্ধিরই চুম্বক প্রকাশ (এম. এন. রায়, ১৯৪৮)। সেখানে উপস্থাপিত যুক্তিপ্রণালীর সংক্ষিপ্ত অভিপ্রকাশ পাওয়া যায় তাঁর *নয়া মানবতাবাদী ইশতেহারের* "নতুন একটি রাজনৈতিক দর্শন" অধ্যায়ে। সেখানে তিনি দেখাচ্ছেন,

> মানুষ সারসত্তাগতভাবেই একটি যুক্তিবাদী প্রাণী। মানুষের ভেতরকার যুক্তিবোধ বিশ্বজগতের ঐকতানেরই প্রতিধ্বনি। শ্রেয়োবোধকে মানুষের এই অন্তর্জাত যুক্তিবাদিতার ভেতরেই খুঁজতে হবে। শুধুমাত্র তবেই শ্রেয়োবোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবে মানুষ— স্বতঃস্ফূর্তভাবে এবং স্বেচ্ছায়। যুক্তিবোধ মানুষের শ্রেয়োবোধেরই অনুমোদন মাত্র; আর শ্রেয়োবোধ নাড়া দেয় বিবেকবোধের অনুভূতিতে; বিবেকবোধ আবার পরিবেশ সম্পর্কিত সহজাত সচেতনতা ও পরিবেশের প্রতি সহজাত সাড়া। চূড়ান্ত বিচারে, বিবেকবোধ অতীন্দ্রিয় কিছু নয়, রহস্যময় কিছুও নয়। এটা সচেতনতার স্তরের একটা জীবতাত্ত্বিক বৃত্তি ...। মানুষের অন্তর্জাত যুক্তিশীলতাই ঐকতানমূলক বিন্যাস-বন্দোবস্তের একমাত্র গ্যারান্টি। ঐকতানমূলক বিন্যাস-বন্দোবস্ত আবার একটা শ্রেয়োনৈতিক বন্দোবস্তও বটে, কেননা শ্রেয়োবোধ একটা যুক্তিবাদী বৃত্তি। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৩৬)

ক্রপোৎকিনের মতোই, রায় যখন জৈব-সামাজিক বিবর্তনের দিক থেকে প্রসঙ্গটিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চান, তখন মানুষের যুক্তিবোধ নীতিবোধ আর শ্রেয়োবোধ তার স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত একটা ব্যাপার হিসেবেই বিবেচিত হয়।

৫.১.৪ নীতিবোধসম্পন্ন স্বাধীন মনুষ্য-সন্তান হয়ে ওঠার প্রশ্ন

এম. এন. রায়ের কাছে মানুষের জৈব বিবর্তনের পাটাতনে তার প্রজাতিগত যুক্তিবোধ নীতিবোধ শ্রেয়োবোধ ও স্বাধীনতার এই সামগ্রিক সম্পর্কজালটি মানব-জীবনের উদ্দেশ্য সংক্রান্ত একটি ব্যাপার হিসেবে বিবেচিত হয়। রায়ের নিজের ভাষায়,

> মৌলিক যে প্রশ্নটা [আমাদের আলোচনায়] অন্তর্ভুক্ত, সেটা মানবজীবনের উদ্দেশ্য সম্পর্কিত প্রশ্ন। ...
>
> জীবনকে স্রেফ জীবনটুকুর মধ্যেই অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে ভাবলে, জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই। জীবন যখন অত্যন্ত জটিল মানবীয় রূপকাঠামোর মধ্য দিয়ে নিজের প্রকাশ ঘটায় এবং বুদ্ধিবৃত্তি, ইচ্ছা ও সচেতনতার অভিব্যক্তিসমূহকে বিকশিত করে তোলে, শুধুমাত্র তখনই

আমরা জীবনের উদ্দেশ্যের কথা ভাবতে পারি। ... এই উদ্দেশ্য সম্পর্কে মতৈক্যে পৌছানোটা বিশাল গুরুত্ব বহন করে, কেননা সামাজিক সংগঠন এবং বিভিন্ন প্রকার সামাজিক সম্পর্ক ততদূর পর্যন্তই সুসঙ্গতিপূর্ণ, সুস্থিতিশীল আর নীতিবোধসম্পন্ন হয়ে উঠতে পারবে যতটা পর্যন্ত এসব সামাজিক সম্পর্করাজি মানবজীবনের উদ্দেশ্যকে এগিয়ে নেবে।

প্রাক-মানব পর্যায়ে যদিও জীবনের কোনো উদ্দেশ্য নাই, তথাপি মানুষের নিচু পর্যায়ের জৈব বিবর্তনের ভেতরে মানবজীবনের উদ্দেশ্যের শেকড়গুলোকে শনাক্ত করা যায়। মানবজীবনের উদ্দেশ্য [আত্মপ্রকাশ করে] প্রাক-মানব জৈব বিবর্তনের, যথা অস্তিত্বের সংগ্রামের, চরিত্র-নির্ধারক বৈশিষ্ট্যের পরিণামে। প্রাক-মানব পর্যায়ে এই সংগ্রাম গড়ে ওঠে যান্ত্রিক অভিযোজন ও প্রাকৃতিক নির্বাচনের সমন্বয়ে। কিন্তু ইচ্ছা এবং বুদ্ধিবৃত্তির মানবীয় বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাবের পরে এই সংগ্রাম পরিবাহিত হয় উচ্চতর পর্যায়ে — যান্ত্রিক অভিযোজনের মাধ্যমে আর নয়, বরং বুদ্ধিমত্তাপূর্ণ পছন্দ নির্ধারণের মাধ্যমে, এবং সেই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য দরকার পড়ে বিচারবুদ্ধি। নীতিবোধ এবং যাবতীয় নীতি-নৈতিকতাগত মূল্যবোধের ভিত্তি হচ্ছে বিচারবুদ্ধিগত সক্ষমতা।

মানব-পর্যায়ে এই অস্তিত্বের সংগ্রাম যখন সচেতন ইচ্ছা এবং বুদ্ধিমত্তার ভিত্তিতে পরিচালিত হয় তখন তা হয়ে ওঠে স্বাধীনতার তাড়না। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৪-৩৫)

নিজের এই উপলব্ধিকে রায় আরো এগিয়ে নিয়ে যান মানবজীবনের পরম-কাঙ্ক্ষিত উদ্দেশ্যের দিকে, এবং বলেন যে সামাজিক ঐকতানমূলক একটি সমাজ যদি আমাদেরকে পেতে হয় তাহলে সমাজকে এমন হয়ে উঠতে হবে যাতে করে ব্যক্তির যুক্তিবোধ বিকশিত হয়ে ওঠে, যাতে করে ব্যক্তি হয়ে ওঠে "নীতিবোধসম্পন্ন ... স্বাধীন মনুষ্য-সন্তান":

স্বাধীনতার সাথে মানানসই— এমন ধরনের সমাজ এবং ব্যক্তির মধ্যে একটা সুসঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্ক তখনই সম্ভব যখন আমরা জীবতাত্ত্বিক জ্ঞান থেকে অবরোহী উপায়ে প্রাপ্ত এই অনুকল্প থেকে আরম্ভ করি যে প্রত্যেক ব্যক্তিই যুক্তিবোধসম্পন্ন বিচারবুদ্ধিতে পৌছাতে সক্ষম, এবং সমাজ-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এই সক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে দেওয়া। ব্যক্তি ও সমাজের মধ্যকার সম্পর্ক প্রসঙ্গে পথ প্রদর্শনের মতো কোনো কর্মসূচি বা নীলনকশা প্রণয়ন করা সম্ভব না। যুক্তিবোধসম্পন্ন ও নীতিবোধসম্পন্ন বিচারবুদ্ধিতে পৌছানোর মতো স্বাধীন মনুষ্য-সন্তান হিসেবে ব্যক্তি যতটা বেড়ে উঠবে, সেই অনুপাতে তা সুসঙ্গতিপূর্ণ হয়ে উঠবে। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৮)

এ প্রসঙ্গে আবারও মনে পড়ে যায় আলোকায়নের মুক্তিপরায়ন ঐতিহ্যের কথা, ভিলহেল্ম হোমবল্টের কথা। হোমবল্ট বলছিলেন,

> যুক্তিবোধ মানুষের জন্য সেই শর্ত-পরিস্থিতি ছাড়া আর কোনো শর্ত-পরিস্থিতিই কামনা করতে পারে না যে শর্ত-পরিস্থিতিতে প্রত্যেক ব্যক্তি তার নিজের শক্তিসমূহের দ্বারা নিজেকে নিজের নিখুঁত ব্যক্তিসত্তা হিসেবে বিকশিত করে তোলার ক্ষেত্রে সবচাইতে চূড়ান্ত স্বাধীনতা উপভোগ করে ... (হোমবল্ট ১৭৯২: ১৭-১৮)।

এম. এন. রায়ের মতোই (১৯৬০: ৪৪) ধ্রুপদী উদারনীতিবাদী হোমবল্টও বলছেন, মানুষের নীতিবোধের উৎসও হলো গিয়ে 'আত্মার অন্তর্জীবন', তথা মনুষ্যস্বভাব:

> সমস্ত নীতিনৈতিকতাজনিত সংস্কৃতি জন্মলাভ করে একান্তভাবে এবং সরাসরিভাবে আত্মার অন্তর্জীবন থেকে। বাহ্যিক ও বানানো ফন্দিফিকির দিয়ে কখনোই তা উৎপাদন করা যায় না। যেকোনো মানুষের অপরাপর অন্তর্গত সক্ষমতার মতোই, উপলব্ধির অনুশীলনও সাধারণত অর্জিত হয় তাঁর নিজের কর্মতৎপরতা, তাঁর নিজের উদ্ভাবনী শক্তি অথবা অন্যদের আবিষ্কার কাজে লাগানোর ক্ষেত্রে তাঁর নিজের কর্মপদ্ধতির মধ্য দিয়ে। (নোম চমস্কি, ১৯৭০ থেকে উদ্ধৃতি)

৫.২ রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে নীতিবোধসম্পন্ন হওয়া সম্ভব না

এখন প্রশ্ন হলো, বাস্তব রাজনীতির ক্ষেত্রে রায়ের নীতিবোধের তাৎপর্য কী? ১৯৫২ সালে *দ্য র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিস্ট* পত্রিকায় (২রা মার্চে প্রকাশিত সংখ্যায়) "রাজনীতি ও নীতিবোধ" নামের এক রচনায় রায় লিখছেন,

> ডানপন্থী হোক আর বামপন্থী হোক, রক্ষণশীলই হোক বা উদারনৈতিক হোক, অথবা প্রতিক্রিয়াশীলই হোক কিংবা বৈপ্লবিকই হোক কেন সমকালীন যেকোনো রাজনৈতিক তত্ত্ব পুনঃপরীক্ষা করে দেখলে এই বেদনাদায়ক সত্যই প্রকাশ পাবে যে বাস্তবের কাজে-কর্মে-অনুশীলনে তাদের মধ্যে সামান্য পার্থক্যই আছে, কেননা ক্ষমতা দখলই এই সকল প্রকার রাজনৈতিক তত্ত্বের সাধারণ কথা, তা সে তাদের ক্ষমতায় যাওয়ার পন্থা যেমনই হোক না কেন। ক্ষমতার জন্য তাদের হুড়াহুড়ি জনজীবনকে ক্রমাগতভাবে অনৈতিক করে তুলছে। জনজীবনের নৈতিকতা সংরক্ষণ করার জন্য, সুতরাং, এমন নতুন ধরনের রাজনৈতিক তত্ত্ব দরকার যাতে

> করে সমাজের প্রয়োজনীয় পরিবর্তনের জন্য ক্ষমতা দখল করা কোনো পূর্বশর্ত হয়ে না ওঠে। এই ধরনের নতুন একটা রাজনৈতিক তত্ত্ব দাঁড়াতে পারে এমন একটা সামাজিক দর্শন থেকে, মানুষই যেখানে প্রাথমিক এবং সার্বভৌম। নৈতিকতা যেহেতু বিবেকের রাজত্ব; সুতরাং নৈতিকতার চর্চা করতে পারে কেবল ব্যক্তি। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৪১)

"নৈতিকতা যেহেতু বিবেকের রাজত্ব; সুতরাং নৈতিকতার চর্চা করতে পারে কেবল ব্যক্তি" — রায়ের এই সিদ্ধান্তের তাৎপর্য অসাধারণ। বিবেক থাকে শুধু ব্যক্তির, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দলের কোনো বিবেক থাকে না, থাকা সম্ভব না। সুতরাং ব্যক্তির পক্ষেই কেবল নীতিবোধসম্পন্ন হওয়া সম্ভব, রাষ্ট্র বা রাজনৈতিক দলের পক্ষে নীতিবোধসম্পন্ন হওয়া সম্ভব না।

রায়ের এই এক সিদ্ধান্তেই আমাদের সারা পৃথিবীর যাবতীয় রাজনৈতিক দলের অস্তিত্বের নীতিগত বৈধতা খারিজ হয়ে যায়। কিন্তু এরকম একটি এক বাক্যের দুর্দান্ত সিদ্ধান্তে পৌছানোর জন্য রায়কে যে সুদীর্ঘ পথপরিক্রমা করতে হয়েছে সে কথা মনে রাখতে হয় বৈকি। রায়ের মতো ব্যক্তির দুর্দমনীয় অনুসন্ধিৎসা, ভুল করার স্পর্ধা, আর বারো ঘাটের জল খাওয়ার সাহস ও একাগ্রতা ছাড়া জীবনের সত্যে উপনীত হওয়া যায় না।

৫.৩ এম. এন. রায়ের নিজের জীবনে নীতিবোধ

একান্ত উপলব্ধির সাথে নিজের উক্তি ও আচরণকে একাত্ম করে তোলার জন্য, নিজের বিবেকের বাণীকে বাস্তবে রূপদানের জন্য, নিজেকেই ক্রমাগতভাবে পরিবর্তন করতে পারার, হাতের নাগালে থাকা বৃহৎ ক্ষমতার কেন্দ্রটিকে হেলায় ঠেলে দিয়ে জীবনের সত্যে উপনীত হওয়ার অনন্ত সাধনায় সংলিপ্ত হতে পারার সততা রায়ের ক্ষেত্রে খোদ নীতিবোধের একটি জীবন্ত দৈহিক দৃষ্টান্ত হিসেবে বিবেচিত হওয়ার মতো। এই দিকটা দেখেই হয়ত রায়ের বন্ধু, আমাদের আদরের কবি, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর ঘনিষ্ট এই বন্ধুর মৃত্যুতে লিখেছিলেন,

> ... লেনিন ও স্ট্যালিনের সাথে, গান্ধী ও নেহরুর সাথে একই কাউন্সিলে বসার পর তেপান্তরের নির্জনে তিনি অবসর নিয়েছিলেন স্বেচ্ছায়, কেননা তিনি দেখেছিলেন যে তার সাথী বিপ্লবীদের গরিষ্ট অংশই সামাজিক পরিবর্তন বলতে মনুষ্য-প্রণীত দুঃখ-দুর্দশার সত্যিকারের কোনো প্রতিকার ব্যতিরেকে স্রেফ ক্ষমতা-হস্তান্তরটুকু বুঝেছিলেন। এমনই ছিল তাঁর চারিত্রিক শুদ্ধতা যে তিনি উদ্দেশ্য ও উপায়ের মধ্যে, উপলব্ধি ও উচ্চারণের মধ্যে, কোনো ভেদ বজায় রাখতে পারতেন না। (সুধীন্দ্রনাথ

দত্ত, "এম. এন. রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি"; শিবনারায়ণ রায়, ১৯৯৫: ১৯৪-১৯৫)

৫.৪ উদ্দেশ্য ও উপায় সংক্রান্ত শ্রেয়োনীতি

এই হচ্ছে এম. এন. রায়ের নীতিবোধ।[১৩] উদ্দেশ্য যেহেতু মহৎ, সুতরাং কী উপায়ে ক্ষমতায় যাচ্ছি সেটা বড় কথা নয়, ক্ষমতায় গেলেই আমরা ভালো ভালো কাজ করে জনগণকে উদ্ধার করব তাতে কোনো সন্দেহ নাই — এই ধরনের যেনতেন পন্থার গোঁজামিলের সাথে রায়ের নীতিবোধের মারাত্মক পার্থক্য ছিল। অসৎ উপায়ে সৎ উদ্দেশ্যে পৌছানোর কোনো রাস্তা তাঁর কাছে নাই। তাঁর কাছে "রাজনীতি ও শ্রেয়োনীতি" সম্পর্কিত গোড়ার প্রশ্নটা হচ্ছে,

> বৈপ্লবিক রাজনীতির চর্চাকে কি আবশ্য-অবশ্যই জেসুইটদের এই আপ্তবাক্য দ্বারাই পরিচালিত হতে হবে যে উদ্দেশ্যই উপায়ের বৈধতা? যৌক্তিকভাবে দেখতে গেলে বিপ্লবের চূড়ান্ত বৈধতা যেহেতু তার নীতিবোধগত আবেদন, তথা ন্যায়বিচারগত আবেদনের মধ্যে নিহিত, সে ক্ষেত্রে ঐ প্রশ্নের উত্তরকে অবশ্যই নেতিবাচক হতে হবে। নৈতিক একটা জিনিস কখনো অনৈতিক উপায়ে অর্জন করা যাবে কিনা তাতে রীতিমতো সন্দেহ রয়েছে। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৩৪)

উদ্দেশ্য ও উপায় প্রশ্নে এটাই নৈরাজ্যবাদীদের সাধারণ অবস্থান। বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়ার এখন আর অবকাশ নাই। আপাতত শুধু ম্যালাতেস্তার কথা বলি। ১৮৯৬ সালে *লা অ্যানার্কিয়া* পত্রিকায় "উদ্দেশ্য ও উপায়" নামের এক রচনায় নৈরাজ্যবাদের অন্যতম পথিকৃত এরিকো ম্যালাতেস্তা সুবিস্তৃত যে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ হাজির করেছিলেন তাকে চাইলে এই এক বাক্যেই প্রকাশ করা যায়: "কী আমরা অর্জন করি তা নয়, বরং কীভাবে তা অর্জন করি সেটাই, আমাদের ক্ষেত্রে, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার"। (এরিকো ম্যালাতেস্তা, ১৯৯৩)

---

[১৩] এই প্রসঙ্গে সুধীন দত্তের সেই "কাব্য [হচ্ছে] উক্তি ও উপলব্ধির অদ্বৈত" কথাটা মনে না পড়ে পারে না (সুধীন দত্ত, ১১৯৭: ২৫৩)। রায়ের বন্ধু বলে কথা।

ষষ্ঠ পাঠ

মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, উদারনীতিবাদ এবং সমাজের নতুন বিন্যাস



এম. এন. রায়ের স্মরণে ভারত সরকারের স্মারক ডাকটিকেট: ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭।
আনুষ্ঠানিকভাবে 'ডাকটিকেট' পরিণত হলেন তাজা মানুষ এম. এন. রায়।



ষষ্ঠ পাঠ

মার্কসীয় সমাজতন্ত্র, উদারনীতিবাদ এবং সমাজের নতুন বিন্যাস

ইতিহাসের আইনসমূহ কারো জানা থাকলে তিনি নিশ্চয়তার সাথে অনুমান করতে পারবেন যে পুঁজিবাদী সমাজ নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম দেবে— মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা দাবি করেছিল এই প্রেক্ষাপটে। মার্কস সেই আইনগুলো আবিষ্কারের দাবি করেছিলেন। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের [আইজাক] নিউটনের পিছু পিছু কোনো [পিয়েরে-সিমন] ল্যাপ্লাস এসে হাজির হন নি। মার্কস নিজেই নিজেকে ভণ্ড প্রফেট হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ১৭)

৬.১ রুশবিপ্লব প্রসঙ্গে: একশিলা-পার্টি, লাল আমলাতন্ত্র ও মহাবিপর্যয়

যে ভাষায়, যে বেদনাবোধে জারিত হয়ে, যে নিরাসক্ত পর্যালোচনার ভেতর দিয়ে এম. এন. রায়ের ১৯৪৭ সালের *নয়া মানবতাবাদী ইশতেহারের* সূচনা ঘটেছে তা হুবহু তুলে ধরার আকর্ষণ সংবরণ করা কঠিন:

> প্রলেতারীয় বিপ্লবের আগমনী ঘোষণা করার জন্য *কমিউনিস্ট ইশতেহার* প্রকাশের পর এক শ বছর চলে গেছে। এ থেকে বেরিয়ে আসা কমিউনিজমের ভূত ইউরোপে হেঁটে বেড়ালো, বুর্জোয়াদের অন্তরে কাঁপন ধরালো, কিন্তু পরিহাসের ব্যাপার হচ্ছে, বাস্তবে ভালো কিছু ঘটতে এখনো বাকি। পুঁজিবাদী শোষণে নিপীড়িত-জর্জরিত সভ্য জগতের মুক্তির বারতা শোনালেও কমিউনিজম নিজেই আজ ভূত হয়ে গেছে। আর সেই ভূত শুধু বুর্জোয়াদের অন্তরেই আতঙ্ক তৈরি করছে না, আধুনিক জগতের এমনকি প্রগতিশীল শক্তিসমূহের মধ্যেও তা ঘটিয়ে চলেছে গভীর দুর্ঘটনা। প্রগতিশীল এই শক্তিগুলো শুধু যে আর্থ-রাজনৈতিক সম্পর্কাদির পরিবর্তন চেয়েছিল তা তো নয়, একই সাথে তারা চেয়েছিল যেন মানবতার সবচাইতে মূল্যবান সাংস্কৃতিক

মূল্যবোধগুলো অযত্নে, বেআক্কেলিপনার মধ্য দিয়ে সামাজিক বিপ্লবের ঘোড়ো সমুদ্রে বিলুপ্ত হয়ে না যায়।

এ কি ইতিহাসের পরিহাস, নাকি ভাগ্যের পরিহাস? তা যা-ই হোক, সেটা ঘটেছে এই কারণে যে এক শতাব্দী আগে যার আগমনী ঘোষণা করা হয়েছিল বহুত তূর্যনিনাদ আর নবীসুলভ আত্মবিশ্বাসের ভেতর দিয়ে, সেই প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগ কখনোই আসে নি।

আত্মবিশ্বাসের সাথে আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লব এক দেশে প্রতিষ্ঠার আগে কমবেশি জানা ছক অনুসারেই এক শতাব্দীর চার ভাগের তিন ভাগ সময় কেটে গেছে, কিন্তু সেটা দেশে দেশে ছড়িয়ে পড়ে নি, বিশ্ববিপ্লবে পরিণত হয় নি। এবং রাশিয়ায় বিপ্লব-পরবর্তী ঘটনাবলী আশ্বস্ত হওয়ার মতো ছিল না। *কমিউনিস্ট ইশতেহারে* আঁকা ইউটোপিয়ার দিকে তা যায় নি। প্রলেতারীয় বিপ্লবের ছবি হারিয়েছে তার মানবীয় রোমান্টিকতার জৌলুষ, আদি শ্রেয়োনৈতিক আবেদন। এক দেশে এর সফলতা প্রায়োগিকভাবে প্রমাণ করেছে যে নতুন ব্যবস্থাটি বাঁধনখোলা প্রমিথিউস হিসেবে জেগে ওঠা মানুষের সৃষ্টি হয়ে উঠতে যাচ্ছে না; বুদ্ধিবৃত্তিক, শ্রেয়োনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রগুলোতে মানবীয় সৃষ্টিশীলতার শেকলমুক্তি ঘটতে যাচ্ছে না; নতুন ব্যবস্থাটি বরং তৈরি করতে যাচ্ছে প্রলেতারিয়েতের যূথবদ্ধতার অহংবোধের এমন এক মন্দির যেখানে গিয়ে প্রণত হতে হবে, আত্মবলি দিতে হবে ব্যক্তিকে, যে ব্যক্তিদেরকে নিয়েই গড়ে উঠেছে ঐ শ্রেণী।

এই গর্ভপাতের পরিণাম এক বিশালকায় বিপর্যয়। যখন নাকি অবশেষে সেই প্রলেতারীয় বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছিল, দেখা গেল তা পর্যবসিত হয়েছে বিজয়ী প্রতিক্রিয়ার কালপর্বে— প্রতিবিপ্লবের যুগে। (শিথিল অনুবাদ: এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ১-২)

বলতে গেলে ঠিক এটাই ছিল রুশ বিপ্লব সম্পর্কে নৈরাজ্যবাদীদের মূল্যায়নের মোদ্দা কথা। পুরো ইউরোপের অজস্র শ্রমজীবী মানুষের অজস্র আন্দোলন এবং রুশ জনসাধারণের শ খানেক বছরের জানবাজি লড়াই-সংগ্রামের পরিণামে "যখন নাকি অবশেষে সেই প্রলেতারীয় বিপ্লবের সূচনা ঘটেছে বলে মনে হচ্ছিল"; খোদ আপামর জনতার নিজেদের সোভিয়েতসমূহের নেতৃত্বে যখন নাকি সংগঠিত হচ্ছিল সত্যিকারের রুশ আর্থ-সামাজিক বিপ্লব— গ্রাম-শহর-কল-কারখানা-জমি থেকে অবশেষে জার-জোতদার-জমিদার-মালিক-বুর্জোয়া-শাসক শ্রেণীগুলোর উচ্ছেদের সমুদ্রসম সামাজিক অভিযান পরিপূর্ণ সফলতার মুখ দেখতে চলেছে; আর সেই মহা-সামাজিক জাগরণ "ইতিহাসের পরিহাসে" যে দিন বলশেভিকদের সংকীর্ণ

ক্ষমতা দখলের ষড়যন্ত্রমূলক রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হলো— সেই দিন থেকেই (তার আগে থেকেও এবং তারপর এ যাবত কাল) রুশ নৈরাজ্যবাদীরা, মুক্তিপরায়ন চিন্তকেরা ও র‍্যাডিক্যাল সমাজতন্ত্রীরা বলে আসছেন যে জনগণের বিপ্লবের চূড়ান্ত সাফল্যের মুহূর্তে শ্রমজীবীদের নামে, "সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে"র জনপ্রিয় অ্যানার্কিস্ট শ্লোগানের নামে আসলে বিজয় অর্জন করেছে বলশেভিক-রাষ্ট্রতন্ত্রের রুশ প্রতিবিপ্লব, সংঘটিত হয়েছে মানব-ইতিহাসের "বিশালকায় বিপর্যয়"[১৪]। সেই ১৮৬৬ সালের এক চিঠিতে রাষ্ট্রপন্থী সমাজতন্ত্রের "লাল আমলাতন্ত্র" কী মহাবিপদ ডেকে আনতে পারে সে ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়ে নৈরাজ্যবাদী বাকুনিন বলেছিলেন, "এটা হবে আমাদের শতাব্দীতে সৃষ্ট সবচাইতে বীভৎস ও আতঙ্কজনক মিথ্যা" (৪৯ নং পাদটীকা, "বস্তুনিষ্ঠতা ও উদারনৈতিক মনীষা", নোম চমস্কি, ২০০৫: ৪১, ৮৩)।

৬.২ লেনিনের একশিলা-পার্টি সম্পর্কে রোজা লুক্সেমবার্গের সতর্কবাণী

রায় পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন, এই পরিস্থিতির পেছনে ছিল "একনায়কতন্ত্রের মতান্ধতার সাথে বৈবাহিকসূত্রে আবদ্ধ একটা একশিলা-পার্টি" (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৬)। কিন্তু, রায় সম্ভবত খেয়াল করার অবকাশ পান নি, লেনিনের প্রণয়ন করা এই একশিলা-পার্টি নীতি বা বিপ্লবী ভ্যানগার্ড পার্টির তত্ত্ব, বিশেষত এর "গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা"র নীতি সম্পর্কে, ১৯০৪ সালেই জার্মান পার্টির নেতা, 'মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের' অন্যতম উজ্জ্বল প্রতিনিধি রোজা লুক্সেমবার্গ "রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেসির সাংগঠনিক প্রশ্নসমূহ" নামের রচনায় সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়ে বলেছিলেন,

> রুশ পার্টির জন্য লেনিনের সাংগঠনিক পরিকল্পনার চেয়ে বড় কোনো বিপদের কথা আমরা ভাবতেও পারি না। এই সোজাসাপ্টা আমলাতন্ত্র ছাড়া আর কোনো কিছুই ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত একটা বুদ্ধিজীবী এলিটদের কাছে তরুণ একটা শ্রমিক আন্দোলনকে এতটা সুনিশ্চিতভাবে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করবে না। এটা আন্দোলনকে দুর্বল করে দেবে এবং

---

[১৪] দ্রষ্টব্য: আলেকজান্ডার বার্কম্যান, ১৯৮৬; এমা গোল্ডম্যান, ১৯২৩; এমা গোল্ডম্যান, ১৯২৪; ক্রপোৎকিন, ১৯১৯; পিওতর আর্চিনভ, ১৯২৬; বর্ট্রান্ড রাসেল, ১৯২০; ভিক্টর সার্জ, ১৯৩০; ম্যাক্সিমফ, ১৯৩৫; ম্যাক্সিমফ, ১৯৪০; ম্যাক্সিমফ, ০০০০; হুডল্ফ রকার, ১৯২০; রোজা লুক্সেমবার্গ, ১৯০৪।

তাকে পরিণত করবে কেন্দ্রীয় কমিটির দ্বারা তৎস্বার্থে ব্যবহৃত একটা যন্ত্রসত্তায়। (রোজা লুক্সেমবার্গ, ১৯০৪)

শুধু এটুকুই নয়, এর চেয়েও আরো সুস্পষ্টভাবে সতর্ক করে দিয়ে রোজা লুক্সেমবার্গ বলেছিলেন:

> সরলভাবে বলা যাক। ঐতিহাসিক দিক থেকে, সবচেয়ে চালাক একটা কেন্দ্রীয় কমিটির অভ্রান্ততার তুলনায় সত্যিকারের একটা বৈপ্লবিক আন্দোলনের করা ভুলভ্রান্তি সীমাহীন রকমের অধিক কাজের (রোজা লুক্সেমবার্গ, ১৯০৪)

৬.৩ মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্র: নোম চমস্কির সংজ্ঞা

এখানে রোজা লুক্সেমবার্গের পরিচয় প্রসঙ্গে এই মাত্র আমার উল্লেখ করা 'মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্র' শব্দবন্ধটি দিয়ে আসলে কী বোঝায় তা একটু বলে রাখা দরকার। এই ধারণাটি উনিশ শতকের ইউরোপীয় শ্রমিক-সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন থেকে উদ্ভূত একটি ধারণা। এটিকে বর্তমান কালে জনপ্রিয় এবং প্রাসঙ্গিক করে তুলেছেন নোম চমস্কি। তাঁর ভাষায়, "মুক্তিপরায়ন সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা বলতে আমি বোঝাতে চাই বাম-অভিমুখীন মার্কসবাদ থেকে শুরু করে নৈরাজ্যবাদ পর্যন্ত বিস্তৃত চিন্তাধারার পরিসরটিকে" (নোম চমস্কি, ১৯৭০; নোম চমস্কি ২০০৫)। এই ধারার প্রতিনিধি হিসেবে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক রোজা লুক্সেমবার্গ, কাউন্সিল কমিউনিজমের অন্যতম প্রবক্তা ওলন্দাজ মার্কসবাদী-বিজ্ঞানী প্রফেসর অ্যান্টন প্যানেকোয়েক, বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা উইলিয়াম পল প্রমুখের কথা উল্লেখ করেন চমস্কি, যাঁদের সঙ্গে, তাঁর মতে, বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদীদের তেমন কোনো মৌলিক পার্থক্য নাই।

৬.৪ সর্বহারার একনায়কত্ব বিষয়ক ধারণার সমালোচনা

তো, যা-ই হোক, রোজার মতো রায়ও জানতেন, এই পার্টিই ছিল রুশ বিপ্লবের ঘাড়ে নতুন একনায়কতন্ত্র চেপে বসার উৎস। এঁদের "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার সিদ্ধান্ত হলো: গণতন্ত্রের ধারণা আর একনায়কতন্ত্রের ধারণা পরস্পরের বিপরীত; একটা থাকলে আরেকটার অস্তিত্ব থাকতে পারে না; এবং "এমন কি প্রশংসনীয় উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য হলেও একনায়কতন্ত্রের তত্ত্ব ও চর্চা বিস্বাদের (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৬, ৭)।

কিন্তু, নৈরাজ্যবাদীরা "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" সংক্রান্ত তত্ত্বের আদি

উৎস হিসেবে যেভাবে খোদ মার্কসকে এবং মার্কসীয় রাষ্ট্রতন্ত্রকে মার্কসের জীবদ্দশায়ই, প্রথম ইন্টারন্যাশনালের ভেতরে, সুতীব্রভাবে শনাক্ত করেছিলেন, রায় অথবা রোজাকে সে দিকটা তেমনভাবে খেয়াল করতে দেখি না। মার্কসীয় এই রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই বাকুনিন তাঁর নৈরাজ্যবাদকে "রাষ্ট্রহীন সমাজতন্ত্র" বলে আখ্যায়িত করেছিলেন। "রাষ্ট্রতন্ত্র ও নৈরাজ্য" নামের রচনায় ১৮৭১ সালে বাকুনিন দেখাচ্ছেন, বিপ্লবের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরে,

> জনাব মার্কসের মতে, জনগণের তো রাষ্ট্রকে বিলুপ্ত করা উচিতই নয়, বরং তার বিপরীতে তাদের উচিত অবশ্য-অবশ্যই একে আরো শক্তিশালী করা ও বড় করে তোলা। তাদের উচিত তাদের যাঁরা মঙ্গলসাধন করবেন সেই অভিভাবক ও শিক্ষকদের (তার মানে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবৃন্দ, অর্থাৎ জনাব মার্কস ও তাঁর বন্ধুদের) পূর্ণ দায়িত্বে রাষ্ট্রকে তুলে দেওয়া, যাঁরা তারপর তাঁদের নিজেদের মতো করে জনগণের মুক্তিসাধন করবেন। সমস্ত প্রশাসনিক ক্ষমতা তাঁরা নিজেদের শক্ত হাতের ভেতরে জড়ো করবেন, কেননা মূর্খ জনসাধারণের দরকার শক্তিশালী অভিভাবক, এবং তাঁরা একটা কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক বানাবেন, আর যাবতীয় বাণিজ্য, কলকারখানা, কৃষি, এবং এমন কি বিজ্ঞানকেও নিয়ন্ত্রণ করবে সেই ব্যাঙ্ক। আমজনতার পিণ্ডকে ভাগ করে বানানো হবে দুটো সেনাবাহিনী— একটা হবে কৃষিবিষয়ক, অন্যটা হবে কলকারখানা বিষয়ক। সেনাবহিনী দুটো থাকবে রাষ্ট্র-প্রকৌশলীদের প্রত্যক্ষ কম্যান্ডে। আর এই রাষ্ট্র-প্রকৌশলীদেরকে নিয়ে গঠিত হবে বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত নতুন একটি রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক শ্রেণী। (বাকুনিন, ১৯৭১: ৩৩২)

বাকুনিনের বিশ্লেষণকে অভ্রান্ত প্রমাণ করে ১৯১৭ সালের রাশিয়ায় ঠিক এই 'বিপ্লব'ই সাধিত হয়েছিল। এবং সর্বহারা শ্রেণীর নামে সেখানে আদতে রোজা লুক্সেমবার্গ-কথিত "ক্ষমতার জন্য ক্ষুধার্ত বুদ্ধিজীবী এলিট"দেরকে নিয়ে, তথা বাকুনিন-কথিত "রাষ্ট্র-প্রকৌশলী"দেরকে নিয়ে গঠিত "বিশেষাধিকারপ্রাপ্ত নতুন রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক শ্রেণী"টিরই একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। এরকম একটি "রাজনৈতিক-বৈজ্ঞানিক শ্রেণী" ছাড়া মার্কসের আবিষ্কার করা "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" আর কার নেতৃত্বে পরিচালিত হতে পারত?

৬.৫ মার্কসীয় অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের সমালোচনা

তো, মার্কসীয় এই বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রধান যে একটা ত্রুটি রায় খেয়াল

করেন সেটি হচ্ছে, "অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ"। কিন্তু, রায়ের বিবেচনায় স্বার্থপরতা যেহেতু মনুষ্যস্বভাব নয়, যেমনটা আমরা আগেই দেখেছি, সুতরাং "বর্তমান সংকট থেকে সভ্য মানবজগতকে বের করে আনার ক্ষেত্রে অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ কোনো সামাজিক দর্শন হতে পারে না" (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৯৮)। রায়ের মতে,

> ... অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদের ওপর এই গুরুত্ব তাঁর [মার্কসের] ইতিহাস সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য থেকে একটি পরমকারণবাদের [বা টেলিওলজির] জন্ম দেয়। [এই তত্ত্ব অনুসারে] সমাজতান্ত্রিক সমাজ মানুষ কর্তৃক গঠিত হওয়ার কথা নয়। উৎপাদিকা শক্তিসমূহের চলনের ভেতর থেকে স্বয়ংক্রিয়ভাবে ও অপরিহার্যভাবেই তা গঠিত হওয়ার কথা। এটা হওয়ার কথা ঐতিহাসিক বিকাশের আবশ্যিক একটা উৎপন্ন-বস্তু। ইতিহাসের আইনসমূহ কারো জানা থাকলে তিনি নিশ্চয়তার সাথে অনুমান করতে পারবেন যে পুঁজিবাদী সমাজ নতুন সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার জন্ম দেবে— মার্কসীয় সমাজতন্ত্র বিজ্ঞানের বস্তুনিষ্ঠতা দাবি করেছিল এই প্রেক্ষাপটে। মার্কস সেই আইনগুলো আবিষ্কারের দাবি করেছিলেন। কিন্তু সমাজ-বিজ্ঞানের নিউটনের পিছু পিছু কোনো ল্যাপ্লাস[১০] এসে হাজির হন নি। মার্কস নিজেই নিজেকে ভণ্ড প্রফেট হিসেবে প্রমাণ করেছিলেন। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ১৭)

৬.৫ রাষ্ট্রের শুকিয়ে উবে যাওয়া সম্পর্কিত মার্কসীয় ধারণার সমালোচনা

মার্কসের "অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী" ইতিহাস-ব্যাখ্যা অনুযায়ী "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্র একটা পর্যায়ে এসে আপনা-আপনি "শুকিয়ে উবে যাওয়ার" কথা। রায়ের নয়া মানবতাবাদী ইতিহাস-ব্যাখার সাথে এই মার্কসীয় তত্ত্বের বিপুল ফারাক লক্ষ্য না করে পারা যায় না। নয়া মানবতাবাদী ইতিহাস-ব্যাখায় কোনো প্রকার একনায়কতন্ত্রই গ্রহণযোগ্য নয়, এবং সেটা নীতিবোধগত বিবেচনার কারণেও বটে। উদ্দেশ্য ও উপায়ের অভেদ সম্পর্কে একটু আগেই আমরা রায়ের নীতিবোধগত স্পষ্ট অবস্থান দেখেছি। এবারে রাশিয়ায় সর্বহারার একনায়কতন্ত্র সম্পর্কে তার প্রায়োগিক ব্যাখ্যা দেখা যাক:

---

[১০] সকলেই জানেন, তবু বলে রাখি, পিয়েরে সিমন ল্যাপ্লাস (১৭৪৯–১৮২৭) ছিলেন ফরাসি গণিতজ্ঞ, পরিসংখ্যানবিদ ও জ্যোতির্বিজ্ঞানী। তাঁকে 'ফ্রান্সের নিউটন' বা 'ফরাসি নিউটন' বলে ডাকা হতো।

> একনায়কতন্ত্রের যেকোনো রূপই, তা সেটার অজুহাত আপাত অর্থে যতই যুক্তিগ্রাহ্য বলে মনে হোক না কেন, সামাজিক বিবর্তনের র‍্যাডিক্যাল মানবতাবাদী পরিপ্রেক্ষিত অনুসারে পরিত্যাজ্য। স্বাধীনতার কাঙ্ক্ষিত আদর্শকে একেবারে গুবলেট পাকিয়ে না ফেলে রাজনীতি থেকে নীতিবোধকে তালাক দেওয়া যায় না। এটা একটা প্রত্যক্ষ প্রমাণমূলক সত্য যে অনৈতিক উপায় অবশ্য-অবশ্যই উদ্দেশ্যকে দূষিত করে ফেলে। সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র স্থায়ী প্রতিষ্ঠান হয়ে ওঠার প্রতিজ্ঞা করেছে। কমিউনিজমের তা সমার্থক হয়ে উঠেছে। উপায়ই হয়ে উঠেছে উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের শুকিয়ে উবে যাওয়ার কোনো আশা দেখা যাচ্ছে না। সোভিয়েত ইউনিয়নে যদি কোনো সমাজতান্ত্রিক সমাজই প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে, তাহলে উত্তরণকালীন পর্ব তো পার হয়ে গেছে, এবং এখন অবশ্যই একনায়কতন্ত্র অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার কথা। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত অন্য কোনো পার্টির অস্তিত্ব অনুমোদিত না হচ্ছে, অথবা একনায়কতন্ত্র সমেত প্রলেতারিয়েতের পার্টি অদৃশ্য না হচ্ছে, এ কথা বলা নিরর্থক উচ্চতর কোনো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৪১)

ইতিহাসের "অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদী" ব্যাখ্যা এবং "সর্বহারার একনায়কতন্ত্র" সম্পর্কে রায়ের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এইসব সিদ্ধান্ত ও উপলব্ধি-সমূহে পৌছানোর বিশ্লেষণমূলক যুক্তিপ্রণালী আমরা পাই নৈরাজ্যবাদীদের, বিশেষত হুডল্ফ হকারের, রচনায়। রায়ের চেয়ে হকার এ ক্ষেত্রে অনেক বেশি বিশ্লেষণাত্মকই বটে। প্রসঙ্গত একটু বলেই রাখি, রায়ের সাথে হকারের এই পার্থক্য নয়া মানবতাবাদের তুলনায় নৈরাজ্যবাদের চিন্তনগত দিক থেকে অধিকতর সুসংগঠিত বিশ্লেষণ-ধারারই আভাস দেয়। তো, হকারের যুক্তিমালা এখানে একটু সবিস্তারেই দেখব, যেন স্বাধীন মনুষ্য-স্বভাবের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ একটা সমাজ নির্মাণের লক্ষ্যে আমাদের বর্তমান কর্ম-তৎপরতায় আমরা রাষ্ট্রতন্ত্রের প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে সচতন থাকার ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব দিতে শিখি। হকার বলছেন,

> এটা [নৈরাজ্যবাদ] মার্কস ও তাঁর অনুসারীদের লালন-পালন করা এই তত্ত্ব ছুঁড়ে ফেলে দেয় যে, শ্রেণীহীন সমাজে যাওয়ার পথে প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র হিসেবে গঠিত রাষ্ট্র একটা আবশ্যিক উত্তরণকালীন স্তর: আর এই স্তরে সকল শ্রেণী-সংঘাত এবং তারপর খোদ শ্রেণীগুলাই দূরীভূত হওয়ার পরে রাষ্ট্র নিজেই নিজেকে বিলুপ্ত করে দেবে এবং দৃশ্যপট থেকে উধাও হয়ে যাবে। এই ধ্যানধারণা রাষ্ট্রের

আসল স্বভাবচরিত্রকে এবং ইতিহাসে রাজনৈতিক ক্ষমতা নামক ঘটনাটার তাৎপর্যকে একদমই ভুলভাবে বোঝে আর ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে। এই ধ্যানধ্যারণা আসলে তথাকথিত অর্থনৈতিক বস্তুবাদের যৌক্তিক পরিণতি মাত্র। অর্থনৈতিক বস্তুবাদ ইতিহাসের সমস্ত ঘটনা-লক্ষণ-প্রপঞ্চের মধ্যেই কোনো একটা সময়পর্বের স্রেফ উৎপাদন-পদ্ধতিসমূহের অপরিহার্য ফলাফলই শুধু দেখতে পায়। এই তত্ত্বের প্রভাবে লোকজন বিভিন্ন আকার-প্রকারের রাষ্ট্র এবং অন্য সমস্ত সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে সমাজের "অর্থনৈতিক অট্টালিকা-কাঠামোর" ওপরে দাঁড়ানো "আইন-বিষয়ক ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো" হিসেবে বিবেচনা করতে শুরু করেছিল; এবং লোকজন ভেবেছিল এই তত্ত্বের মধ্যে তারা প্রত্যেকটা ঐতিহাসিক ঘটনামালার চাবিকাঠি খুঁজে পেয়েছে। বাস্তবে রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে পরিচালিত বিশেষ বিশেষ লড়াই-সংগ্রাম কীভাবে একটা দেশের অর্থনৈতিক বিকাশধারাকে শত শত বছরের জন্যে রুদ্ধ করে দিয়েছে বা ব্যাহত করেছে ইতিহাসের প্রত্যেকটা পর্বই আমাদেরকে তার হাজার হাজার দৃষ্টান্ত সরবরাহ করে।

খ্রিস্ট-যাজকীয় রাজতন্ত্রের উত্থানের আগে শিল্প-কল-কারখানার দিক থেকে স্পেন ছিল ইউরোপের সবচেয়ে অগ্রসর দেশ। অর্থনৈতিক উৎপাদনের প্রত্যেকটা খাতে প্রথম স্থানে ছিল স্পেন। কিন্তু খ্রিস্টধর্মীয় রাজতন্ত্রের বিজয়ের এক শতকের মধ্যে সে-দেশের শিল্প-কল-কারখানার বেশিরভাগটাই লোপাট হয়ে যায়। যা অবশিষ্ট ছিল, তা কোনোমতে টিকে ছিল চরম দুর্দশাপূর্ণ অবস্থায়। এসব শিল্পকলকারখানার বেশিরভাগই অত্যন্ত আদিম ধরনের উৎপাদন-পদ্ধতিতে ফিরে যায়। কৃষি ভেঙে পড়েছিল, খাল এবং জলপথগুলা বিনষ্ট হয়ে পড়েছিল, বিপুল-বিস্তীর্ণ — আদিগন্ত বিস্তৃত — পল্লী-গ্রামাঞ্চল মরুভূমিতে রূপান্তরিত হয়েছিল। আজকের দিন [অর্থাৎ ১৯৩৮ সাল] পর্যন্ত স্পেন ঐ পশ্চাদগামিতার ধাক্কা কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাজনৈতিক ক্ষমতার জন্যে বিশেষ একটা ধর্মবর্ণগত শ্রেণীর উচ্চাকাঙ্ক্ষা অর্থনৈতিক বিকাশধারাকে চাষ-দেওয়া-জমি ফেলে রাখার মতো করে শত শত বছর ধরে পতিত করে রেখেছিল।

ইউরোপের রাজকীয় স্বৈরশাসন তার হতবুদ্ধিকর "অর্থনৈতিক বিধিবিধান" আর "শিল্প-কারখানা সংক্রান্ত আইনকানুন"-এর সাহায্যে ইউরোপের দেশগুলোতে শিল্প-কলকারখানার বিকাশকে শত শত বছর ধরে থামিয়ে রেখেছিল এবং এর স্বাভাবিক বিকাশকে ব্যাহত করেছিল। উৎপাদনের [রাজতন্ত্র-]নির্দেশিত কর্মপন্থা থেকে যেকোনো প্রকার বিচ্যুতিকে এসব বিধিবিধান আর আইনকানুন দিত কঠোর শাস্তি এবং

কোনোরকম কোনো নতুন উদ্ভাবনের অনুমোদন দিত না। আর, রাজনৈতিক ক্ষমতার যেসব বিচার-বিবেচনা বিশ্বজনীন অর্থনৈতিক সংকটের হাত থেকে উদ্ধার-প্রাপ্তিকে সার্বক্ষণিকভাবে বিঘ্নিত করে এবং যাবতীয় সব দেশের ভবিষ্যৎকে তুলে দেয় রাজনীতি-খেলুড়ে সেনা-অফিসার ও রাজনৈতিক রোমাঞ্চকর কর্মকাণ্ডের হাতে, সেইসব বিচার-বিবেচনা যদি না থাকত? আধুনিক ফ্যাসিবাদ ছিল অর্থনৈতিক বিকাশধারার অনিবার্য ফল— একথা জোর দিয়ে বলবে কে?

সেটা যা-ই হোক, তথাকথিত "প্রলেতারীয় একনায়কতন্ত্র" যেখানে পরিপক্ক হয়ে বাস্তব হয়ে উঠেছে, সেই রাশিয়াতে নির্দিষ্ট একটা পার্টির রাজনৈতিক ক্ষমতার উচ্চাভিলাষ ব্যাহত করেছে অর্থনীতির প্রকৃত সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে এবং দেশটাকে একটা নিষ্পেষণমূলক রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের দাসত্বের অধীন হতে বাধ্য করেছে। যে-"প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্রের" মধ্যে অর্বাচীন সাদাসিধা লোকজন আসল সমাজতন্ত্রের পথে স্রেফ একটা ক্ষণস্থায়ী, অথচ অপরিহার্য, উত্তরণকালীন স্তর দেখতে চান, সেই "প্রলেতারিয়েতের একনায়কতন্ত্র" আজ একটা ভয়ঙ্কর রকমের স্বৈরতান্ত্রিক উৎপীড়নে পরিণত হয়েছে, যা ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রগুলার জুলুম-শাহির চেয়ে কোনো দিক দিয়েই পেছনে প'ড়ে নাই।

যতক্ষণ না শ্রেণীসংঘাত, এবং তাদের সাথে সাথে শ্রেণী, বিলুপ্ত হয় ততক্ষণ পর্যন্ত অবশ্য-অবশ্যই রাষ্ট্র থাকা দরকার— জোরালো এই ঘোষণা, যাবতীয় সব ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার আলোকে, বাজে কৌতুকের মতো শোনায়। আসলে, প্রত্যেক প্রকার রাজনৈতিক ক্ষমতাই মানুষের দাসত্বের নির্দিষ্ট কোনো-একটা কাঠামোকে স্বাভাবিক সত্য বলে ধরে নেয়— যে-কাঠামোর সৃষ্টি ঐ ক্ষমতারই রক্ষণাবেক্ষণের স্বার্থে। নিজের অস্তিত্বকে সঠিক প্রতিপন্ন করার জন্য রাষ্ট্রকে বাইরের দিক থেকে, অর্থাৎ অন্য রাষ্ট্রসমূহের সাথে সম্পর্কের দিক থেকে, কৃত্রিম কতকগুলা বৈরিতা সৃষ্টি করতে হয়। একইভাবে, ভেতরের দিক থেকেও সমাজকে বর্ণ, পদমর্যাদা, এবং শ্রেণী আকারে বিভক্ত করে ফেলতে হয়। এই বৈরিতা এবং বিভক্তি হচ্ছে রাষ্ট্রের ধারাবাহিক অস্তিত্বের অত্যাবশ্যিক একটা শর্ত। রাষ্ট্র শুধুমাত্র পুরাতন বিশেষাধিকারগুলা রক্ষা করতে এবং নতুন নতুন বিশেষাধিকার সৃষ্টি করতেই সক্ষম: এইটুকুতেই ফুরিয়ে গেছে রাষ্ট্রের যাবতীয় তাৎপর্য।

সামাজিক বিপ্লবের মাধ্যমে নতুন যে-রাষ্ট্র সৃষ্টি করা হয়েছে, সেই রাষ্ট্র পুরাতন শাসকশ্রেণীসমূহের বিশেষাধিকারগুলার ইতি টানতে পারে বটে, কিন্তু এটা সে করতে পারে তাৎক্ষণিকভাবে নতুন আরেকটা বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী খাড়া করার মাধ্যমেই, যে-শ্রেণীটাকে তার

প্রয়োজন পড়বে নিজের শাসকগিরি বজায় রাখার জন্য। কথিত প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্বের অধীনে রাশিয়ায় বলশেভিক আমলাতন্ত্রের বিকাশ পুরোনো ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতারই নতুন একটা নজির মাত্র, যে-ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা অসংখ্যবার নিজের পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছে। আর, প্রলেতারিয়েত ও সমগ্র রুশ জনগণের উপর ছোট্ট একটা চক্রের একনায়কত্ব ছাড়া কথিত ঐ প্রলেতারিয়েতের একনায়কত্ব কখনোই অন্যকিছু ছিল না। নয়া-অভিজাততন্ত্র হিসেবে আজ ধাঁই ধাঁই করে বেড়ে-ওঠা নতুন এই শাসকশ্রেণীকে রুশ কৃষক-শ্রমিকদের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী থেকে পৃথক করে রাখা হয়েছে— অন্যান্য দেশের বিশেষাধিকার-প্রাপ্ত শ্রেণী-বর্ণগুলা তাদের জনগণ থেকে যে-রকম পৃথক ঠিক সে-রকমই। (হুডল্ফ হকার, ২০১১)

৬.৬ নৈরাজ্যের দুই উৎস: সমাজতন্ত্র ও ধ্রুপদী উদারনীতিবাদ

লিবারাল গণতন্ত্র সম্পর্কেও রায়ের অবস্থান হুবহু অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্টদের[১৬] মতোই। মার্কসীয় সমাজতন্ত্র এবং লিবারাল গণতন্ত্রের প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদীদের এই অবস্থানের একটি সংক্ষিপ্ত চিত্র এঁকেছেন হকার। উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হলেও কাজের বটে:

> আধুনিক নৈরাজ্যবাদের মধ্যে আমরা পেয়েছি দুইটা মহান স্রোতোধারার বেণীবন্ধন। ফরাসি বিপ্লবের সময়কালে, এবং সেই সময় থেকে, এই দুই স্রোতোধারা ইউরোপের বুদ্ধিবৃত্তিক জীবনে বৈশিষ্ট্যসূচক দুই অভিব্যক্তি পেয়েছে: সমাজতন্ত্র এবং উদারনীতিবাদ। সামাজিক জীবনের অত্যন্ত মহৎ পর্যবেক্ষকরা যখন বেশি বেশি স্পষ্ট করে দেখতে শুরু করলেন যে, রাজনৈতিক সংবিধান আর সরকারের গঠনবিন্যাসে নানান পরিবর্তন কখনোই সেই সমস্যার গোড়ায় গিয়ে পৌঁছতে পারবে না যাকে আমরা বলি "সামাজিক প্রশ্ন", তখনই গড়ে উঠল সমাজতন্ত্র। সমাজতন্ত্রের সমর্থকেরা বুঝতে পেরেছিলেন, সম্পত্তির মালিকানা থাকা বা না-থাকার ভিত্তিতে মানুষজন যতদিন আলাদা আলাদা শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে থাকবে ততদিন পর্যন্ত–সবচেয়ে মধুর-মনোরম নানান তাত্ত্বিক অনুমান ইত্যাদি সত্ত্বেও–মানুষে মানুষে সামাজিক সমতা বিধান করা সম্ভব হবে না। আর, নানান শ্রেণীর অস্তিত্ব যে আছে, স্রেফ এই ব্যাপারটাই সত্যিকারের একটা [অখণ্ড] মানব-সম্প্রদায়ের ধারণাকে আগাম খারিজ করে দেয়। ফলে,

---

[১৬] 'অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজম' বা 'অরাজক শ্রমিকতন্ত্র' নৈরাজ্যবাদী সামাজিক আন্দোলনের প্রভাবশালী একটি ধারা।

এই উপলব্ধি গড়ে উঠল যে, শুধুমাত্র অর্থনৈতিক একচেটিয়ার উচ্ছেদ আর উৎপাদনের উপায়-উপকরণ-হাতিয়ারপাতির সাধারণ মালিকানার দ্বারাই–তার মানে এক কথায়, এগুলার সাথে সংশ্লিষ্ট যাবতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহের পূর্ণাঙ্গ রূপান্তরের দ্বারাই–সামাজিক ন্যায়বিচারের একটা অবস্থা আদৌ উপলব্ধিযোগ্য হয়ে ওঠে। এটা এমন একটা অবস্থা, সমাজ যেখানে সত্যিকারের একটা মানব-সম্প্রদায় হয়ে উঠবে, এবং শোষণের উদ্দেশ্য পূরণ করার কাজে মানবীয় শ্রম আর ব্যবহৃত হবে না, বরং প্রত্যেকের জন্যে প্রাচুর্য নিশ্চিত করার কাজে তা লাগানো হবে। কিন্তু সমাজতন্ত্র যখনই তার শক্তি সমাবেশ করতে শুরু করল এবং একটা আন্দোলনে পরিণত হলো, ঠিক সেই মুহূর্তেই মতামতের কতিপয় পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠল–এমনটা ঘটল বিভিন্ন দেশের সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে। এটাই সত্য যে, ঈশ্বর-যাজকীয় সরকারতন্ত্র থেকে আরম্ভ করে জারতন্ত্র আর স্বৈরতন্ত্র পর্যন্ত প্রত্যেকটা রাজনৈতিক ধারণাই সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের নানান উপদল-গোষ্ঠীকে প্রভাবিত করেছিল।

এদিকে ইতোমধ্যে রাজনৈতিক চিন্তাচেতনায় দুইটা মহান স্রোতোধারা গড়ে উঠেছে–সমাজতান্ত্রিক আদর্শসমূহের বিকাশে যাদের নির্ধারক তাৎপর্য ছিল। একটা হলো উদারনীতিবাদ। অ্যাংলো-স্যাক্সন দেশসমূহ এবং বিশেষত স্পেনের অগ্রসর মানসকে এটা প্রবলভাবে আলোড়িত করেছিল। অপরটা হলো গণতন্ত্র–পরের দিককার অর্থে যার একটা অভিব্যক্তি দাঁড় করিয়েছিলেন রুশো তাঁর *সামাজিক চুক্তি* গ্রন্থে। গণতন্ত্র তার সবচেয়ে প্রভাবশালী প্রতিনিধিদের খুঁজে পেয়েছিল ফরাসি জ্যাকোবিনতন্ত্রের মধ্যে। [উদারনীতিবাদের জায়গা থেকে] লিবারেশন বা মুক্তি যখন নাকি তার নিজের একটা সামাজিক তত্ত্ব দাঁড় করানোর কাজ শুরু করল, তখন তা আরম্ভ করল ব্যক্তির অবস্থান থেকে, ফলে তা চাইল রাষ্ট্রের কর্মকাণ্ডকে যতটা সম্ভব কমের মধ্যে সীমিত রাখতে; অন্যদিকে গণতন্ত্র তখন অবস্থান নিল বিমূর্ত যৌথ একটা ধারণার ওপর, রুশো যাকে বলেন "সাধারণ ইচ্ছা", যা নিজের আয়োজন সম্পন্ন করতে চাইছিল জাতীয় রাষ্ট্রের ভেতরে।

অনন্য-সাধারণভাবেই, উদারনীতিবাদ আর গণতন্ত্র হচ্ছে রাজনৈতিক ধারণা। আর যেহেতু এই উভয়েরই আদি অনুসারী-সমর্থকদের ব্যাপক গরিষ্ঠ অংশ পুরাতন অর্থে মালিকানার অধিকার বজায় রেখেছে। তাই যখন অর্থনৈতিক বিকাশ এমন একটা গতিপথ গ্রহণ করেছে যা গণতন্ত্রের আদি মৌলিক মূলনীতিগুলার সাথে দোস্তি বজায় রাখতে পারে না, আর উদারনীতিবাদের সাথে তো আরও কম পারে–তখন তাদেরকে তাদের

নিজেদের বিশ্বাসকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয়েছে। গণতন্ত্রের মূলমন্ত্র ছিল "আইনের কাছে সব নাগরিক সমান", আর উদারনীতিবাদের মূলমন্ত্র ছিল "নিজের দেহের উপর নিজের অধিকার"। এই দুই মূলমন্ত্রই পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক বিন্যাসের বাস্তবতায় প'ড়ে পরিপূর্ণভাবে বিনষ্ট হয়ে গিয়েছিল–যেভাবে সমুদ্রে জাহাজ ভেঙে যায়, ডুবে যায়। বিভিন্ন দেশের অযুত-নিযুত মানুষকে যতক্ষণ তাদের শ্রমশক্তি বিক্রি করতে হয় ক্ষুদ্র সংখ্যালঘিষ্ট কিছু মালিকের কাছে, এবং কোনো ক্রেতা খুঁজে পাওয়া না গেলে ডুবে যেতে হয় সবচাইতে শোচনীয় দারিদ্র্যের মধ্যে–ততক্ষণ ঐ তথাকথিত "আইনের কাছে সমতা" স্রেফ একটা সাধু প্রতারণা হয়েই থাকে, কেননা আইন তো তৈয়ার করে তারাই যারা জানে যে, তারা নিজেরাই সামাজিক সম্পত্তির মালিক। আবার ঐ একইভাবে, "নিজের দেহের উপর নিজের অধিকার" নিয়ে কোনো কথাই চলে না, কেননা অনাহারে থাকতে না চাইলে কাউকে যখন অন্য মানুষের অর্থনৈতিক হুকুমদারির কাছে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হতে হয়–তখনই ঐ অধিকার ফুরিয়ে যায়।

উদারনীতিবাদের সাথে নৈরাজ্যবাদের মিল এই উপলব্ধির জায়গায় যে, যাবতীয় সামাজিক বিষয়াদির আবশ্যিক মাপকাঠি হতে হবে ব্যক্তির সুখ আর সমৃদ্ধি। আর, উদারনীতিবাদী চিন্তাধারার মহান প্রতিনিধিদের সাথে মিল এখানেও যে, সরকারের কর্মকাণ্ড নিম্নতম পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখার ভাবনাটা নৈরাজ্যবাদেরও। নৈরাজ্যবাদের সমর্থকরা বরং এই চিন্তাটাকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেছেন চিন্তাটার চূড়ান্ত যৌক্তিক পরিণতি পর্যন্ত, এবং তারা চান রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রত্যেকটা প্রতিষ্ঠানকে সমাজজীবন থেকে একেবারে উচ্ছেদই করতে। উদারনীতিবাদের গোড়ার ধারণাটাকে জেফারসন যখন এইসব শব্দের জামাকাপড় পরান: "সেই সরকারই সেরা যে-সরকার শাসন করে সবচেয়ে কম", নৈরাজ্যবাদীরা তখন থরিউ'র সাথে গলা মিলিয়ে বলেন: "সেই সরকারই সেরা যে-সরকার কোনো শাসনই করে না"।

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতাদের সাথে মিল এইখানে যে, নৈরাজ্যবাদীরা সকল প্রকার অর্থনৈতিক একচেটিয়ার বিলুপ্তি দাবি করে, দাবি করে জমি এবং উৎপাদনের আর-সব উপায়-উপকরণ-হাতিয়ারপাতির সাধারণ মালিকানা, এবং আরও দাবি করে, উৎপাদনের হাতিয়ারপাতিকে মজুদ রাখতে হবে একেবারে সবার ব্যবহারের জন্যে–এক্ষেত্রে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে কোনোরকমের ফারাক করা চলবে না; কেননা প্রত্যেকের জন্যে সমান অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধা বজায় রাখার ভিত্তিতেই কেবলমাত্র ব্যক্তিগত আর সামাজিক স্বাধীনতার কথা ভাবা যেতে পারে। খোদ

সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনের ভেতরেই নৈরাজ্যবাদীরা এই দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরে যে, পুঁজিবাদের বিরুদ্ধে যে-যুদ্ধ, সেটাকে অবশ্য-অবশ্যই রাজনৈতিক ক্ষমতার সকল প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ হিসেবেও নিতে হবে; কেননা ইতিহাসে অর্থনৈতিক শোষণ সবসময়ই রাজনৈতিক আর সামাজিক দমন-পীড়নের হাতে হাত রেখে এগিয়েছে। মানুষ কর্তৃক মানুষকে শোষণ আর মানুষের ওপর মানুষের শাসন-নিয়ন্ত্রণ অবিচ্ছেদ্য, এবং এদের একটা আরেকটার পূর্বশর্ত। (হুডক্ষ হকার, ২০১১)

৬.৭ লিবারাল গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা প্রসঙ্গে এম. এন. রায়

লিবারাল গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা প্রশ্নে রায়ের বিশ্লেষণের যুক্তিপ্রণালী কৌতূহলোদ্দীপক, একদম হকারেরই মতো,

> সংসদীয় গণতন্ত্রের ঘাটতিগুলো তার নিজেরই অন্তর্জাত। অত্যন্ত আধুনিক শিল্পসমাজে ব্যক্তিগত নাগরিকেরা, বিশেষত যারা অর্থনৈতিকভাবে অসুবিধার মধ্যে বাস করা সংখ্যাগরিষ্ঠ শ্রমজীবীদের অংশ, তাদের আনুষ্ঠানিক অর্থে সার্বভৌম অধিকারগুলো প্রয়োগ করার সুযোগ কমই পান। আইন তাদেরকে সামান্যই সুরক্ষা দেয়— বিশেষত সংকট-মুহূর্তে। এ কথা তর্কাতীতভাবে সত্য যে, সংসদীয় প্রথায় গণতন্ত্র নির্বাহীবিভাগকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। দুই নির্বাচনের মাঝখানের সময়টাতে গণতন্ত্র একবারে অদৃশ্য হয়ে যায়। সেই সময়টুকুতে সংসদের সংখ্যাগরিষ্টতা লাভকারী একটা পার্টি সাংবিধানিকভাবেই স্বৈরতন্ত্রী ক্ষমতা অর্জন করতে পারে। গণতান্ত্রিক অনুমোদন নিয়ে গড়ে ওঠা এ ধরনের ক্ষমতার বিরুদ্ধে নিশ্চয়তার কোনো আইনগত বৈধতাও নেই। ... এভাবে, আনুষ্ঠানিক সংসদীয় প্রথা গণতন্ত্র এবং নাগরিক অধিকারসমূহকে সত্যিই সর্ব পরিস্থিতিতে রক্ষা করতে পারে না। হিটলারই যে শুধু "গণতান্ত্রিকভাবে" ক্ষমতায় এসেছিল তা নয়, গত সিকি শতাব্দীতে অনেক দেশের ইতিহাসেই এমনসব অভিজ্ঞতার রেকর্ড আছে, একনায়কতন্ত্র যেখানে গণতান্ত্রিক অনুমোদন পায় যদিও তা ক্ষমতায় যাওয়ার পর [গণতান্ত্রিক] মইটা লাথি দিয়ে ফেলে দেয়।
>
> সংসদীয় গণতন্ত্রের মৌলিক ত্রুটিটি উদারনীতিবাদের দর্শন ও রাজনৈতিক চর্চার মধ্যকার অসঙ্গতি থেকে আসে। মানবতাবাদী ঐতিহ্যের প্রতি সৎ থেকে উদারনীতিবাদ ব্যক্তির স্বাধীনতা দাবি করেছিল, অথচ অবাধ বাজারের অর্থনৈতিক মতবাদ, এবং তার রাজনৈতিক অনুষঙ্গ, ব্যক্তিকে গলাকাটা প্রতিযোগিতার নির্জনতায় অসহায় অবস্থায় ঠেলে দেয়। এই অবস্থায়, উদারনীতিবাদের রাজনৈতিক

ও সামাজিক অনুশীলন যখন তার নিজের দর্শনের নৈতিক উৎকর্ষকে খাটো করে ফেলছে, সংসদীয় গণতন্ত্র তো তখন অবিশ্বস্ত হয়ে উঠবেই। তা যদি না হতো, তাহলে ফ্যাসিবাদের ঝোড়ো উত্থানকে যৌক্তিকভাবে ব্যাখ্যা করা যেত না।

ফ্যাসিবাদ গড়ে উঠেছে সংসদীয় গণতন্ত্রের সংকট থেকে ... রাষ্ট্রের ওপর সার্বক্ষণিক নিয়ন্ত্রণ করতে পারার মতো সংগঠিত একটা গণতন্ত্র হওয়া উচিত নতুন সমাজবিন্যাসের ভিত্তি। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৮)

এভাবে, লিবারাল গণতন্ত্র এবং মার্কসীয় সমাজতন্ত্র সম্পর্কে রায়ের সার্বিক সিদ্ধান্ত হকারের অত্যন্ত ঘনিষ্টই বটে:

নিরাসক্তভাবে বললে, উদারনীতিবাদী দর্শন এবং রাজনৈতিক তত্ত্বের মৌলিক নীতিই হচ্ছে ব্যক্তিতন্ত্র, এবং আধুনিক সভ্যতার তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো অর্জনসমূহের অনুপ্রেরণার উৎস ছিল উদারনীতিবাদ। কিন্তু বাস্তবে, ব্যক্তিতন্ত্রের নীতি পর্যবসিত হয় একটা বিমূর্ত মতবাদে, সার্বভৌম ব্যক্তি পর্যবসিত হয় আইনী কল্পকথায়। ... [আর] উদারনীতিবাদ যদি সার্বভৌম ব্যক্তির আইনী কল্পকথা তৈরি করে থাকে, তাহলে স্বাধীনতার সমাজতান্ত্রিক ও কমিউনিস্ট ধ্যানধারণা হচ্ছে খোদ স্বাধীনতার প্রত্যাখ্যান। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৪১-৪২)

৬.৮ কাঙ্ক্ষিত সমাজের বিন্যাস ও মানুষের স্বাভাবিক স্বাধীনতা

কাঙ্ক্ষিত সমাজের বিন্যাসের প্রশ্নটিকেও রায় বিবেচনা করেন জৈব প্রাণসত্তা হিসেবে মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্যসমূহের জায়গায় থেকে:

... একটা জৈব প্রাণসত্তা হিসেবে মানুষের ভেতরে যেসব সম্ভাবনা নিহিত থাকে সেসবের বিকাশ ঘটানোর ক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করাটাই ছিল [সমাজের] আদি উদ্দেশ্য। মানবজীবন যেভাবে-যতটা সচেতনতা, ইচ্ছা ও বুদ্ধিমত্তার বিকাশ ঘটিয়েছিল, মানুষের চাহিদাসমূহ ও উদ্দেশ্যরাজি সেভাবে-ততটা ক্রমবর্ধমানহারে বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল এবং তা তার অস্তিত্বের আরো ব্যাপক, ব্যাপকতর পরিসরকে নিজ আওতাভুক্ত করে তুলেছিল। চূড়ান্ত পরিণামে, অস্তিত্বের জৈব তাড়না মানুষের এমন এক সচেতন চাহিদা আকারে বিবর্তিত হয়ে উঠেছিল যাতে করে তার ব্যক্তিত্ব [পার্সোনালিটি], তার ব্যক্তিসত্তা [ইনডিভিজুয়ালিটি] বিকশিত হয়ে ওঠে।

এই মত যদি আমরা গ্রহণ করি, তাহলে আমরা কোনো একটা সামাজিক প্রতিষ্ঠানের নৈতিক বৈধতা বা রাজনৈতিক যৌক্তিকতা বা

অর্থনৈতিক ন্যায়পরায়নতাকে বিচার করার একটা মাপকাঠি পাই। যে সামাজিক সংগঠন মানব-ব্যক্তিত্বের স্বাধীন বিকাশের সম্ভাবনাকে বাধাগ্রস্ত করে, তা মানবসমাজ সৃষ্টির আদি উদ্দেশ্যের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ। সুতরাং, ব্যক্তির পূর্ণতম স্বাধীনতা এবং একটি সুসঙ্গতিপূর্ণ সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে কোনা প্রকার পরস্পরবিরোধিতা থাকার দরকার পড়ে না। এ ধরনের পরস্পরবিরোধিতা আসে এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যে সামাজিক ব্যবস্থা এমন একটা জিনিস যা ব্যক্তির উর্ধ্বে অবস্থিত, ব্যক্তিকে যা অতিক্রম করে যায়, যার একেবারে নিজস্ব কোনো উদ্দেশ্য আছে, এবং যখনই নাকি ব্যক্তির উদ্দেশ্য আর ঐ সামাজিক ব্যবস্থার কল্পনাপ্রসূত উদ্দেশ্যের মধ্যে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়, তখনই সমাজে সুর-সঙ্গতির অভাব তৈরি হয়। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৫-৩৬)

৬.৯ রাষ্ট্র, স্থানীয় প্রজাতন্ত্র ও পার্টি-রাজনীতির বিরোধিতা

এখন কথা হচ্ছে, নিজের ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষের তো সমাজকে দরকার। কতকগুলো সামাজিক প্রতিষ্ঠান-কাঠামো দরকার। রাষ্ট্রের সাথেই বা তার সম্পর্কের কী হবে?

এম. এন. রায়ের যুক্তি-পরম্পরা ধরে এগিয়ে গেলে দেখি, তিনি বলছেন, ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য মানুষের কতকগুলো প্রাথমিক জিনিস দরকার। তার শারীরিক অস্তিত্বের সুরক্ষা দরকার। খাদ্য, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদি দরকার। এ সবের বন্দোবস্ত করার জন্য তার শক্তির বেশিরভাগটা খরচ করার হাত থেকে যদি সে মুক্ত হতে পারে, তাহলে মানবজীবনের সূক্ষ্ম দিকগুলো, যথা বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক প্রয়োজনগুলোর দিকে সে বেশি মনোযোগ দিতে পারবে। তাই যদি হয়, তাহলে কোনো একটা সামাজিক সংগঠনের প্রথম উদ্দেশ্য হতে হবে সমাজের প্রত্যেকটা সদস্যের শারীরিক অস্তিত্বের সুরক্ষার বন্দোবস্ত করা। এটা সমাজের অর্থনৈতিক দিকের ব্যাপার। তারপর, জীবতাত্ত্বিকভাবেই যেহেতু প্রত্যেকের মন আছে, জ্ঞান অর্জনের সক্ষমতা আছে, সুতরাং এগুলোর অনুশীলন দরকার। এই অনুশীলনের প্রক্রিয়া থেকে সূচনা ঘটে সাংস্কৃতিক ও শিক্ষা বিষয়ক সুসংগঠিত কর্মকাণ্ডের। এটা হলো সমাজ-ব্যবস্থার দ্বিতীয় উদ্দেশ্য। তারপর, বিপুল সংখ্যক মানুষ যখন একত্রে বসবাস করে, তখন যেহেতু মানুষের বিকাশ ঘটে অসম মাত্রায়, সুতরাং দ্বন্দ্ব-সংঘাতের সম্ভাবনা সব সময়ই থেকে যায়, যা আবার সহিংস রূপ ধারণ করতে পারে যখন-তখন। রাজনৈতিক সংগঠন-সংস্থান, তথা রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা তাই থেকেই যায়। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৭)

কিন্তু রাষ্ট্রের কাজ কী হবে? রাষ্ট্রের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক কী হবে? এ বিষয়ে রায়ের বক্তব্য হচ্ছে,

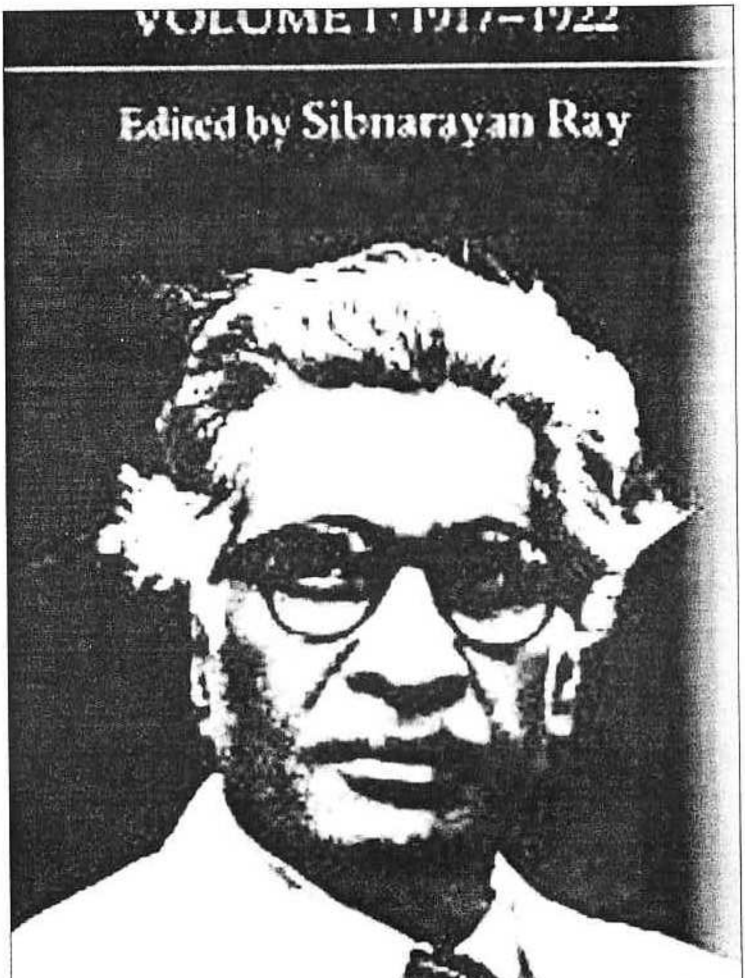
> যে সব শর্ত-পরিস্থিতির অধীনে এক জন মানুষ কর্তৃক আরেক জন মানুষকে খুন করার দরকার পড়বে না, অথবা সম্প্রদায় বা জাতিসমূহের একে অন্যকে আক্রমণের দরকার পড়বে না ... সে রকম শর্ত-পরিস্থিতি বজায় রাখা ছাড়া তার বেশি কোনো কাজ সম্পাদনের উদ্দেশ্য রাষ্ট্রের থাকা উচিত না।
>
> শান্তিপূর্ণ অস্তিত্ব ও শারীরিক কল্যাণের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি জ্ঞান অর্জন ও বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশের সমতাপূর্ণ সম্ভাবনার শর্ত-পরিস্থিতিসমূহ সৃষ্ট হয়ে গেলে ব্যক্তি-মানুষদেরকে তাদের মতো করে থাকতে দিতে হবে, যেখানে তাদের সামাজিক ও ব্যক্তিগত অস্তিত্ব ও কর্মকাণ্ডের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ হবে ন্যূনতম। (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৭)

এখানে রায়ের মধ্যে আমরা এই প্রবন্ধের শুরুর দিকে নোম চমস্কির (১৯৭০) সূত্র ধরে আলোচিত ধ্রুপদী উদারনীতিবাদের হোমবল্টীয় ভাবধারারই প্রতিধ্বনি শুনতে পাই যেন।

অন্য দিকে তার মধ্যে নৈরাজ্যবাদের প্রতিধ্বনিও শোনা যায়। "বের হয়ে আসার পথ" নামের প্রবন্ধে তাঁকে বলতে শুনি, "গণতন্ত্র শুধু তখনই আসল হয়ে উঠতে পারে যখন রাষ্ট্র গড়ে ওঠে স্থানীয় প্রজাতন্ত্রসমূহের ভিত্তির ওপর" (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ৪৭৪)। শুধু তাই নয়, "গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রের ওপর প্রত্যক্ষ ও কার্যকর একটা নিয়ন্ত্রণ সম্ভব করে তোলার জন্য" নৈরাজ্যবাদীদের মতো তিনি রাইট টু রিকল ও গণভোটের ব্যবস্থা রাখার কথাও বলেন। "এ ধরনের একটা গণতন্ত্র", তাঁর মতে, "পার্টি-রাজনীতিকে অতিক্রম করতে সক্ষম হবে।" (এম. এন. রায়, ১৯৪৮: ৪৭৪)

সপ্তম পাঠ

নৈরাজ্যের নিত্যতা অথবা মুক্তিপরায়ন ইতিহাসবীক্ষা



শিবনারায়ণ রায়ের সম্পাদিত 'সিলেক্টেড ওয়ার্কস অফ এম. এন. রায়' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত এম. এন. রায়ের ছবি।



সপ্তম পাঠ

নৈরাজ্যের নিত্যতা অথবা মুক্তিপরায়ন ইতিহাসবীক্ষা

ব্যক্তিক ও যৌথ যেটাই হোক, যাবতীয় রকমের যুক্তিসিদ্ধ মানব-আচরণের উদ্দেশ্য হচ্ছে সদা-ক্রমবর্ধমানভাবে স্বাধীনতা অর্জন করা। ব্যক্তির সম্ভাবনাসমূহের উন্মোচন ঘটার পথ থেকে সর্বপ্রকার বাধা-নিষেধের ক্রমাগত অপসারণ ঘটতে থাকাটাই হচ্ছে স্বাধীনতা। আর, ব্যক্তি বলতে এখানে মনুষ্য-সন্তান হিসেবে ব্যক্তিকে বোঝানো হচ্ছে; যান্ত্রিক কোনো সমাজ-সত্তার খাঁজকাটা চাকাসমূহের দাঁত হিসেবে বিবেচিত কোনো ব্যক্তির কথা বলা হচ্ছে না। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৫৪)

৭.১ এম. এন. রায়ের কতিপয় সীমাবদ্ধতা

এম. এন. রায়ের চিন্তাধারায় নানারকম টুকটাক অসঙ্গতির পরিচয়ও মেলে। তাঁর ২২টি থিসিসের চতুর্থটিতে আমরা "ঐতিহাসিক নির্ধারণবাদ"-এর সাক্ষাৎ পাই। সেখানে এমন কি "নির্ধারণবাদের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ধারণা"র কথাও বলেন রায়। বলেন যে "নির্ধারণবাদের যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক ধারণাকে নিয়তিবাদ সংক্রান্ত টেলিওলজিক্যাল বা ধর্মীয় মতবাদের সাথে গুলিয়ে ফেললে চলবে না"। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ৫৪) মনে হয় যেন সমাজবৈজ্ঞানিক গ্র্যান্ড থিওরির ঝোঁক থেকে তিনি বেরুতে পারছেন না।

ডগমাটিক প্রবণতার ছায়াও দেখতে পাওয়া যায় তাঁর চিন্তনে-শব্দচয়নে। নিজের নয়া মানবতাবাদকে যখন তিনি "বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ" নামেও ডাকেন (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ১০৪), অনিবার্যভাবে তখন মার্কস-এঙ্গেলসের "বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র" মনে পড়ে যায়। মানবতাবাদ মোটেও নতুন কোনো চিন্তাধারা নয়, এ কথা মেনে নিয়েও রায় দাবি করেন "বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান" তাঁর প্রস্তাবিত মানবতাবাদের বিশেষ ধরনটিকে "সকল অসঙ্গতি ও বিভ্রান্তি থেকে মুক্ত করেছে"। অতএব, রায়ের কথায়,

> আমরা একে নয়া মানবতাবাদ নামে ডাকি, কেননা এর নতুনত্বের অবতারণা ঘটেছে আধুনিক বৈজ্ঞানিক জ্ঞান থেকে। কাজেই এর

> অধিকতর উপযুক্ত নাম বৈজ্ঞানিক মানবতাবাদ। মানুষের সার্বভৌমত্ব ও প্রাথমিকত্বের নীতি আমরা পুনর্বয়ান করি অন্ধবিশ্বাস হিসেবে নয়, বরং বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সহায়তা নিয়ে। (এম. এন. রায়, ১৯৪৭-ক: ১০৫)

ভয় হয়: এভাবেই তো মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সমাজতন্ত্রের আর-সব রূপকল্পনাকে 'অন্ধবিশ্বাস' বা ডগমা বলে উড়িয়ে দিয়েছিল এবং ব্যাপারটা স্রেফ কিছু মতামতকে বায়ুমণ্ডলে উড়িয়ে দেওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে সত্যিকারের প্রাণসংশয়ের কারণ হয়ে উঠেছিল অজস্র মানুষের।

রায় বিজ্ঞান আর দর্শনের মধ্যেও পার্থক্য রাখতে চান না। দর্শনকে তিনি বিজ্ঞান বানানোর কথা কিন্তু ভাবেন না, বরং বিজ্ঞানকে দর্শন বানিয়ে তোলার চেষ্টায় আপ্রাণ নিরত থাকেন। এবং সেই সামগ্রিকতাবাদী দর্শনকে বিজ্ঞান হিসেবে নিজে বিশ্বাস করেন। অন্যদেরকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টাও করেন। এভাবে তাঁর মধ্যে এক প্রকার টোটালিটারিয়ান জ্ঞানের ঝোঁক তৈরি হয়। তাঁর ঘনিষ্ঠ সমকালীন ব্যক্তিবর্গ তাঁর জাদুতে এতই মোহাবিষ্ট হয়েছিলেন যে কখনোই তাঁরা স্বাধীনভাবে রায়কে বিচার করার অবকাশ পান নি।

> আসলে, চমস্কি যেমনটা বলছেন, উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি পর্যন্ত এটাই ছিল জগতের রীতি। যিনি বিজ্ঞান জানতেন, তিনি নীতিশাস্ত্র জানতেন, তিনি দর্শন জানতেন, তিনি সাহিত্য জানতেন। বিজ্ঞানের পক্ষে সম্পূর্ণ পৃথক একটা শাখা হয়ে ওঠার ঘটনা খুবই সাম্প্রতিক। উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময়ের আগে কোনোক্রমেই নয়। (নোম চমস্কি, ২০১১-ক)

এ কথা মনে রাখলে রায়ের সর্ব-সামগ্রিক জ্ঞান প্রণয়ণের প্রবণতাকে সমকালীন একটি ঐতিহাসিক প্রবণতা হিসেবেই চিহ্নিত করা চলে হয়ত।

কোনো সামাজিক-দার্শনিক মতাদর্শ যখন "বৈজ্ঞানিক" হয়ে ওঠে, তখন তো অন্যদের পক্ষে সেটাকে স্রেফ মেনে নেওয়া ছাড়া গতি থাকে না। আলাদা আলাদা সামাজিক মতাদর্শের সবই তো আর একই সাথে "বৈজ্ঞানিক" হতে পারে না। কালক্রমে "সঠিক" একটা অফিশিয়াল মতাদর্শ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। বহুমতের পথ এভাবে রুদ্ধ হয়, মতাদর্শিক নিপীড়নের অবকাশ ঘটে। এসব দেখে সংশয় হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের একশিলীভূত সাংগঠনিক মতাদর্শিক চর্চার 'বৈজ্ঞানিক' ঘেরাটোপ থেকে রায় শেষ পর্যন্ত নিজেকে মুক্ত করতে পেরেছিলেন বলে আমার বিশ্বাস জন্মায় না।

বলাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হবে না হয়ত, মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের তত্ত্ব ও রূপকল্প হিসেবে নৈরাজ্যবাদের এই যে এত ভুরি ভুরি শাখা আছে, তার মধ্যে কোথাও আপনি "বৈজ্ঞানিক নৈরাজ্যবাদ" বলে কিছু পাবেন না। একবার রুশ নৈরাজ্যবাদী ম্যাক্সিমফ এই শব্দবন্ধটি ব্যবহার করলে অন্যরা তাঁকে ভর্ৎসনাই করেন। 'মানবপ্রকৃতি' বলে যে একটা ব্যাপার আছে সেটা নৈরাজ্যবাদীদের

বিশ্বাস মাত্র। এঁকে তাঁরা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে প্রতিষ্ঠা করতে চান না।[১৭] কেননা তাঁরা বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানের নামে বিজ্ঞানের সামাজিক-মতাদর্শিক ব্যাখ্যার মধ্যকার পার্থক্য বোঝেন। বিজ্ঞানকে তাঁরা মানুষ ও সমাজ সম্পর্কিত চূড়ান্ত কোনো জ্ঞান হিসেবে বিবেচনা করেন না। বিজ্ঞান পদ্ধতি মাত্র, ভুলত্রুটির ভেতর দিয়ে যা নিজেকে প্রয়োজন মতো সংশোধন করতে করতে অগ্রসর হয়। ব্যক্তি-সমাজ-জগত সম্পর্কে কোনো রকম কোনো গ্র্যান্ড সায়েন্টিফিক থিওরি হাজির করে না বিজ্ঞান। নৈরাজ্যবাদীরা আগাগোড়াই জানেন, সমাজ এতটাই বড় একটা এলাকা যে কোনো তত্ত্ব বা বিজ্ঞান বা মতাদর্শের পক্ষেই এ সম্পর্কে একশত ভাগ সঠিক অর্থে কোনো বৈজ্ঞানিক ধারণা দেওয়া সম্ভব হয় না। এক কথায়, সামাজিক চিন্তাধারাকে 'বিজ্ঞান' বলে চালানোর ঘোর বিরোধী নৈরাজ্যবাদের প্রায় সকল ধারা।

একটা ব্যাপার খেয়াল করাটা মারাত্মক জরুরি। সেটা হলো, খোদ রাশিয়ায় সত্যিকারের 'বৈজ্ঞানিক একনায়কতন্ত্রের' একেবারে কেন্দ্রে অবস্থান

---

[১৭] একটি সাক্ষাৎকারে নোম চমস্কিকে নৈরাজ্যের বৈজ্ঞানিকতা প্রসঙ্গে প্রশ্নকর্তা যা জিজ্ঞেস করেছিলেন এবং চমস্কি তার যে উত্তর পেশ করেছিলেন তা এখানে প্রণিধানযোগ্য। আমি নিজের বাংলায় টুকে দিচ্ছি:

> **প্রশ্নকর্তা:** স্বাধীনতার জন্য মনুষ্য-প্রাণীর একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে বলে বাকুনিনের যে অনুমান, তাকে বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণ করার উদ্দেশে তথাকথিত "বৈজ্ঞানিক" নৈরাজ্যবাদের নানান পদক্ষেপ সম্পর্কে আপনার মতামত কী? মানে, স্বাধীনতা অভিমুখে আমাদের যে একটি প্রবণতা রয়েছে শুধু তা-ই নয়, জীবতাত্ত্বিক একটি চাহিদাও আছে। যা নাকি আপনি সর্বজনীন ব্যাকরণ দিয়ে খুব সফলভাবে প্রমাণ করতে পেরেছিলেন ...
>
> **নোম চমস্কি:** এটা আসলে একটি আশা মাত্র। এটা কোনো বৈজ্ঞানিক ফলাফল নয়। মানবপ্রকৃতি সম্পর্কে একটাই কম জানাবোঝা গেছে যে আপনি কোনো সিরিয়াস সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারবেন না। এমন কি আমরা পোকামাকড়ের প্রকৃতি সম্পর্কেও কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে পারব না। আমরা আপাত কিছু সিদ্ধান্ত টেনে থাকি আমাদের অন্তর্জ্ঞান, আশা, আর কিছু অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণের ভিত্তিতে। সেভাবে আমরা হয়ত এই সিদ্ধান্ত টানতে পারি যে স্বাধীনতার জন্য মানুষের একটি সহজাত প্রবৃত্তি আছে। কিন্তু আমাদের এমন কোনো ভান করা উচিত হবে না যে এই সিদ্ধান্তটা বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও উপলব্ধি থেকে আহরণ করা হয়েছে। ব্যাপারটা তা নয় এবং তা সম্ভবও নয়। মনুষ্যসন্তান এবং তাদের মধ্যকার ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার কোনো বিজ্ঞান নেই। এমন আরো সরল জীবসত্তাসমূহের বেলায়ও তা নেই ...। (নোম চমস্কি, ২০০৫: ২৪০)

করে, সেই একনায়কতন্ত্র কর্তৃক আটক হয়ে 'মরতে মরতে পালিয়ে বেঁচেও' (শিবনারায়ণ রায়ের "ভূমিকা"র ২০ নং টীকা; এম. এন. রায়, ২০০০: ২৩) যে তাঁর এই সর্ব-সামগ্রিক জ্ঞান প্রণয়ণের মার্কসীয়-লেনিনীয় প্রবণতা কাটে না, তাতে করে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে বিজ্ঞান ও দর্শনের নামে, পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের নামে দীর্ঘদিনের 'অন্ধবিশ্বাস-চর্চা' এমনকি এম. এন. রায়ের মতো মানুষকেও কতখানি সীমাবদ্ধ করে ফেলতে পারে।

রায় চান "স্পিরিচুয়ালি ফ্রি ইনডিভিজুয়াল"দেরকে নতুন সমাজের গাইড হিসেবে দায়িত্ব দিতে। সংশয় হয়: এটা আসলে ভ্যানগার্ড আইডিয়ারই প্রচ্ছন্ন রূপ কিনা। অন্য দিকে, নৈরাজ্যবাদীদের প্রাথমিক একটা বিশ্বাস, মানুষেরা কোনো প্রকার হুজুর-মুরুব্বি-ভ্যানগার্ড ছাড়াই নিজেরা নিজেদের মতো করে নিজেদেরকে চালাতে সক্ষম, উন্নততর সমাজ গঠন করতে সক্ষম। পরীক্ষানিরীক্ষা-ভুলভ্রান্তির মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাওয়া ছাড়া এ ক্ষেত্রে উপায় নাই। এক প্রকার নিশ্চিত হওয়ার জন্যই বোধ হয় তিনি কিছু উন্নত মানুষের ওপর অধিকতর দায়িত্ব দেওয়ার কথা ভেবেছিলেন। কিন্তু নৈরাজ্যবাদীরা মার্কসবাদী-লেনিনবাদীদের মতো করে ভ্যানগার্ড-ধারণায় আস্থা রাখেন না। তাঁরা মনে করেন, মানুষই নিজেরা নিজেদের সমাজ নির্মাণ করবেন। নৈরাজ্যবাদীদের কাজ হলো প্রত্যক্ষভাবে নিজে/নিজেরা কাজ করা, শিক্ষা ও প্রচারমূলক তৎপরতায় লিপ্ত হওয়া, এবং একা অথবা সমমনাদের সাথে সংগঠিতভাবে নিজেদের সাধ্যমত বাস্তব তৎপরতায় লিপ্ত থাকা, তথা বাস্তব আচরণের ভেতর দিয়ে নৈরাজ্যবাদী মূলনীতিগুলোকে ফুটিয়ে তোলা।

ব্যক্তির স্বাধীনতা ও মঙ্গলকে সমস্ত সামাজিক তৎপরতার উদ্দেশ্য ও কেন্দ্র হিসেবে গণ্য করার দাবির মধ্যে রায়ের সাথে নৈরাজ্যবাদীদের সামান্যও পার্থক্য নাই, কিন্তু সমাজের আগে ব্যক্তি ছিল– রায়ের এই ধারণার সাথে নৈরাজ্যবাদীদের বিস্তর ফারাক রয়েছে। নৈরাজ্যবাদীরা ভাবেন, ব্যক্তি সমাজেরই সৃষ্টি; এবং ব্যক্তির শরীর, ভাষা ও যুক্তিবোধ-নীতিবোধ সুদীর্ঘ সামাজিক বিবর্তনেরই ফসল (এই দ্বিতীয় অংশটা কিন্তু খোদ রায়েরও উপলব্ধি)।

এ কথাও তো সত্যি (রায় এবং নৈরাজ্যবাদীরা উভয়ই তা মানেন) যে ব্যক্তিই সমাজ, ব্যক্তিকে নিয়ে সমাজ গড়ে ওঠে, সমাজ কখনোই ব্যক্তি হতে পারে না। কিন্তু মুশকিলটা বাধে যখন রায় ভাবেন, একেবারে আদিতে, সমাজ গঠনেরও আগে, আবির্ভূত হওয়া আদি ব্যক্তিবর্গ প্রকৃতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সুবিধা পাওয়ার জন্য নিজেদের যুক্তিশীল সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে আদি সমাজ গড়ে তুলেছিল (এম. এন. রায়, ১৯৬০: ৩৩)। রায় হয়ত ব্যক্তির গুরুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, ব্যক্তির প্রাথমিকতাকে প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে, ঐতিহাসিক

অনুক্রমের দিক থেকে আদি ব্যক্তিকে আদি সমাজেরও আগে কল্পনা করে ফেলেছেন এবং সেটা বিজ্ঞানের দোহাই দিয়েই বটে। এ ক্ষেত্রে তিনি আসলে নিজের যুক্তিপ্রণালীর সাথেই বিবাদে জড়িয়ে পড়েন।

৭.২ নৈরাজ্যের স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ হিসেবে এম. এন. রায়

এম. এন. রায়ের সাথে নৈরাজ্যবাদীদের পার্থক্যের অভাব নাই। কিন্তু তাঁর সাথে নৈরাজ্যবাদীদের দুর্দান্ত ও মৌলিক সাদৃশ্যও এড়িয়ে যাবার মতো নয়—কোনোভাবেই। প্রশ্নটা তাই না উঠে পারে না: নৈরাজ্যবাদীদের সাথে রায়ের এরকম সাদৃশ্য কেন? সাদৃশ্য অবশ্যই এ জন্য নয় যে এম. এন. রায়ও একজন নৈরাজ্যবাদী। তাঁকে নৈরাজ্যবাদী প্রতিপন্ন করাটাও এ বইয়ের উদ্দেশ্য নয় মোটেই। তাহলে এই অপরিহার্য সাদৃশ্যের ব্যাখ্যা কী?

নৈরাজ্যবাদীদের বিশ্বাস, নৈরাজ্যবাদ মানুষের একটি স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা। প্রাচীন কাল থেকে এ পর্যন্ত সারাবিশ্বের সমাজচিন্তক ও দার্শনিকদের অনেকের মধ্যে, এবং কোনো সামাজিক সম্প্রদায়ের চর্চার মধ্যে নৈরাজ্যপ্রবণতা দেখতে পাওয়া যায়। এম. এন. রায়, সুতরাং, বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম নন নিশ্চয়ই। কিন্তু, তারপরও, বিশেষত এম. এন. রায়ের চিন্তাধারার সাথে নৈরাজ্যবাদের সাদৃশ্য অনেক অনেক বেশি তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো। সেটা সম্ভবত এই কারণে যে উভয়ই তাদের বিকাশের পৃথক পৃথক পর্যায়ে কার্ল মার্কসের কর্তৃত্বপরায়ন রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিচারমূলক সামাজিক পর্যালোচনা দাঁড় করানোর মধ্য দিয়ে নিজ নিজ অবয়ব অর্জন করেছে।

সার্বিক বিবেচনায়, আমাকে তাই রায় সম্পর্কে এই উপসংহারেই পৌছাতে হয় যে সত্যানুসন্ধানে রায়ের সার্বিক ঐতিহাসিক অভিযাত্রা কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্র থেকে মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রের বাতিঘরে পৌছানোর ইশারাই বহন করে। আমাদেরকে তা জানায়: অন্ধবিশ্বাস যত প্রিয়ই হোক, যত শক্তিশালীই হোক, যত দীর্ঘদিনেরই হোক না কেন, সচেষ্ট ব্যক্তির লাগাতার ও পরিশ্রমী অনুসন্ধিৎসা, প্রশ্ন করার সাহস, সত্যকে গ্রহণ করার মানবোচিত ঔদ্ধত্য এবং প্রয়োজনে নিজেকে বদলে ফেলার হিম্মত মনুষ্যচিন্তার সার্বভৌমত্ব ও ব্যক্তির স্বাধীনতারই জয়গাথা রচনা করে তোলে।

রায় তাঁর সারা জীবন ধরে স্বাধীনতার যে সাধনা করেছেন নৈরাজ্যবাদ তা গত দেড় শ বছরের বেশি সময় ধরে অজস্র মানুষের অজস্র তৎপরতায় ও চিন্তনে অজস্র ফুলে-পাতায়-শাখায় পল্লবিত করে তুলেছে। আধুনিক বঙ্গ-ভারতের ইতিহাসে এম. এন. রায় নিঃসন্দেহে নৈরাজ্য ঘরানার অন্যতম

স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ হিসেবেই সারা পৃথিবীর স্বাধীনতাপিপাসু অজস্র মানুষের কাছে শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সাথে বিবেচিত ও বিশ্লেষিত হবেন।

৭.৩ নৈরাজের নিত্যতা: বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে নৈরাজ্যের অজস্র অভিপ্রকাশ

মানবেন্দ্রনাথ রায়, কর্তৃত্বপরায়ন মার্কসবাদ এবং মুক্তিপরায়ন নৈরাজ্যপন্থার সাথে সম্পর্কিত বিশেষ বিশেষ ঘটনাপ্রবাহের বিশেষ বিশেষ সত্য নিয়ে এতক্ষণকার এই আলোচনার উপসংহার-পর্বে এসে এবারে একটু সাধারণ সত্যে পৌছানোর দিকে অগ্রসর হতে চাই। ইতিহাসের কফিনে আটকে পড়া একজন মানবেন্দ্রনাথ রায়কে বিশেষ প্ল্যানচেটের মাধ্যমে 'বিস্মৃতির কবর' থেকে তুলে নিয়ে এসে তাঁকে একজন 'নৈরাজ্যবাদী' প্রতিপন্ন করার মতো অকিঞ্চিতকর কার্যে রত হওয়া যে আমার উদ্দেশ্য নয়, সে কথাটা পরিষ্কার করে বলার সময় হয়েছে এতক্ষণে। খোদ মানবসত্তার এবং প্রকৃতিসত্তার স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ হিসেবে নৈরাজ্যকে দেখাই আসলে আমার এই গ্রন্থের প্রচ্ছন্ন-অথচ-প্রধান মর্ম।

বইয়ের শুরুতেই — অল্প করে হলেও — খানিকটা বলে রেখেছিলাম, রায়ের সঙ্গে আমার ব্যক্তিগত জীবনসাযুজ্যই আমাকে রায়-চর্চার প্রতি আগ্রহী করে তুলেছিল (দ্রষ্টব্য: এই গ্রন্থের ১.৪ অংশ)। এবারে ঝেড়ে কাশি দিয়ে বলি: এম. এন. রায়ের নাম দিয়ে এই বইয়ে আসলে আমি আমার নিজের জীবনেতিহাসের ভাষ্যও রচনা করেছি। কেননা রায়ের মতো আমি নিজেও স্বাভাবিক নৈরাজ্যপ্রবণ একজন মানুষ। এখন যখন পেছনের দিকে তাকাই তখন দেখতে পাই: সারা জীবন ধরে আসলে আমি নিজের মনে, নিজের পথে, নিজের পদ্ধতিতে স্বাভাবিক স্বাধীনতাশীলতার অনুশীলন তথা নৈরাজ্যের সাধনাই করে চলেছি। এর নাম যে 'নৈরাজ্য' সে কথা জেনেছি অনেক পরে— সাত ঘাটের কর্তৃত্বশীলতার পানি খেয়ে এসে। কিন্তু, 'নৈরাজ্য' একটি নামই মাত্র।

বছর বারো আগে বঙ্গের 'মহাপ্রভু'র নামে নব পর্যায়ে নতুন করে প্রচলিত নাম-তত্ত্ব/নাম-সংকীর্তনের খবর নিতে গিয়ে টের পেয়েছিলাম, চিরন্তন, সনাতন, অনাদি-অনন্ত মহামানবসত্তার আছে হাজারো অভিপ্রকাশ— যেমনটা শুনেছিলাম রাজশাহীরই পাঠান-পাড়ায় মাওলা বাবার দরবারে আসা সুফি সাধকদের মুখে: "যত কাল্লা তত আল্লা"। শ্রীচৈতন্যদেবের তথা নদিয়ার নিমাই পণ্ডিতের জীবনীগ্রন্থ *শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত*-রচয়িতা জনাব কৃষ্ণদাস কবিরাজের কাছে শিখেছিলাম, দেহীমাত্রেরই যেমন দেহ থাকে, তেমনই 'নাম'

যখন আছে তখন সেই নামের 'নামী' আছেন ("নামমাহাত্ম্য", কৃষ্ণদাস কবিরাজ, ২০০৩: ২৯৫-২৯৮)। [তুলনীয়: "The name means everything" (পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন ১৯৯৩: ১৯)] পাক্কা আজ দশ বছর হতে চলল, ২০০৩ সালের প্রথম দিনগুলোতে আমাদের *মানুষ* পত্রিকার মুখে বদরে মুনীর এবং আমি 'সম্পাদকীয়' না লিখে যে "মানুষ-এর কথা" লিখেছিলাম, তাতে "প্রতিরোধ মহাপ্রভু স্বয়ং" অংশটিতে আমি লিখেছিলাম আমার নিজের ঐ 'স্বাভাবিক স্বাধীনতাশীলতার অনুশীলন'-এরই কথা:

> আরশিনগর টের হয় না কার? যাকে দেখা না-যায় একদিনও, তার খোঁজে দিন যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যখন খবর হয় ঐ নগরের মালিক 'আমি' নয়, 'প্রভু'— গ্রামময় রাষ্ট্র হয়। আয়নায় আবছা হয় 'আমি'; পড়শি ভেসে ওঠে। আমার-বাইরের-অথচ-আমারই-অস্তিত্বের, অর্থাৎ 'আমাদের', ইতিহাস কখনো সমাজ কখনো অচেতন কখনো-বা রাষ্ট্রের জামা গায়ে দিয়ে টেলিভিশনে হাজির হয়। তখন তাহাকে বলে তাঁহার প্রভুর স্বর। বকধার্মিক সময় দাঁড়িয়ে থাকে এক পায়ে; আর ঝিম-মারা সতর্কতায় বোঝে: 'এইখানে শিকার বোধ হয় বসে থাকে শিকারীর খোঁজে।' পর্দা থেকে বিড়াল বেরিয়ে আসে রাস্তায়; ইঁদুর লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ে পিকচার টিউবে। গোলামি আমাদের জন্য বরাদ্দ থাকে; তাঁহাদের জন্য নহে। কিন্তু দাস হওয়া সহজ নয়; মাংশমগজ পিষ্ট হয়। আরশিনগরের আত্মরক্ষার তাগিদ আমার আর পড়শির প্রতিরোধের কর্তব্য বোধ করে। প্রতিরোধ মহাপ্রভু স্বয়ং। [আসন্ন] দিব্যযুগে তাঁর অযুত অবতারের একটার নাম আমরা দিয়েছি **মানুষ**। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৩-ক: ix)

এই 'মহাপ্রভু', 'সমাজ', 'অচেতন', 'চৈতন্য', 'প্রতিরোধ' এবং 'মানুষ'— 'নৈরাজ্য'রই নানা রকম নাম। এবং নামে অবশ্যই আসে যায়। যেমন ধরা যাক, 'নৈরাজ্যবাদ' নামটা শুনলেই কেমন যেন আগে-থেকে-জানা কোনো একটা অনড় টাইপের বিধিবিধানের বা শাস্ত্রের বা কোড অব কন্ডাক্টের বিশ্রী ইঙ্গিত পাওয়া যায়। নিরাজ-পথের বা অরাজ-পথের পথিক নিজেকে কখনও "নৈরাজ্যবাদী" নামে ডাকতে পারে না বলে আমার ধারণা। নিজেকে আমি তাই 'নৈরাজ্যবাদী'ও বলি না আর। এই জন্যই ফেসবুকে বিস্তারিত তিনটি 'নোট'-এ আমি আমার "আইডিয়া অফ অ্যানার্কি উইদাউট অ্যানার্কিজম" এর ধারণা তুলে ধরেছিলাম (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-খ; সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-গ; সেলিম রেজা নিউটন, ২০১১-ঘ)। ঐ সব নোট লেখার আরো পরে খোঁজ করতে গিয়ে জেনেছি, একুশ শতকের "নয়া

নৈরাজ্য"ও এই একই বৈশিষ্ট্যের ধারক বটে (ডেভিড গ্রেইবার, ২০০২)। নিজেকে সে "নৈরাজ্যবাদ" নামে ডাকতে চায় না। জনসমক্ষে অতটা ভালোভাবে 'নৈরাজ্যবাদী' হিসেবে নিজেকে হাজির করার আগেই আমাকে তাই 'অরাজপন্থা' শব্দটাকে তার মর্মসহ আবিষ্কার করতে হয়। হাতে লেখা নোট খাতা ঘাঁটাঘাঁটি করে দেখছি, ২০০৬ সালের মে মাসে 'অরাজ' শব্দটা প্রথম মাথায় আসে আমার। নেপালে তখন রাজতন্ত্র অবসানের দাবিতে গণআন্দোলন চলছে মূলত মাওবাদীদের নেতৃত্বে। 'রাজতন্ত্র' নিয়ে ভাবতে ভাবতে 'অরাজতন্ত্র' শব্দটা মাথায় খেলে যায়। আমার নোট খাতা থেকে এখানে উদ্ধার করছি:

> anarchism-এর একটা প্রতিশব্দ ভাবছি 'অরাজতন্ত্র'। নৈরাজ্যবাদ শব্দটা খুবই নেতিবাচক ব্যবহারে জীর্ণ হয়ে পড়েছে বলে সন্দেহ হয়। নিজেকে 'নৈরাজ্যবাদী' বলাটা প্রথম ঝলকেই মানুষকে ভীত করে তুলবে বলে শঙ্কা হয়। চমস্কি নিজেকে যেমন liberterian socialist বলেন, সেভাবে নিজেকে 'মুক্তিপন্থী সমাজতন্ত্রী' বলাটা ভালোই। সদর্থক ধারণা এতে করে জনমানসে পৌছানো যায় বটে। তিনি অবশ্য নিজেকে সুস্পষ্টভাবে anarchists বলেন। শব্দটার নেতিবাচক অর্থ মানুষের মনে যেভাবে গেঁথে দেওয়া হয়েছে, তার রাজনীতিক দিকটা উন্মোচনের উপর জোর দেন। শব্দটাকে মনে হয় তিনি যেন তার আদি সদর্থে ফিরিয়ে আনার লড়াইটা চালাতে চান।
>
> বাংলাদেশে মুশকিল হলো, ইউরোপ আর USA তে যেমনটা হয়েছে, আছে, এখানে কখনই সেরকম ধরনের কোনো আন্দোলন নিজেকে 'নৈরাজ্যবাদী' নাম দিয়ে কাজ করেনি। সারা দুনিয়ার মতো, বাংলাদেশেও জনমানুষের নিজস্ব আন্দোলন—রাজনৈতিক অভিজাততন্ত্রীদের নেতৃত্ববিহীন যেসব আন্দোলন সেগুলোর কথা বলছি—স্বভাবতই নৈরাজ্যবাদী। কার্যত, বাস্তবত, তাই ঘটে থাকে। সাম্প্রতিক কানসাট, শনির আখড়া, বস্ত্র শ্রমিকদের গণআন্দোলনগুলো তো আসলে নৈরাজ্যবাদই। ...
>
> অবশ্য বুৎপত্তির দিক থেকে anarchism-এর বাংলা নাম হিসেবে 'নৈরাজ্য' একেবারে আক্ষরিক অর্থে, এবং রাজনৈতিক অর্থেও, খুব সঠিক। তবু এদেশে সর্বমহলে 'নৈরাজ্য' মানেই 'উচ্ছৃংখলতা'— 'বিশৃংখলা'। মজার ব্যাপার একটা এই যে, 'শৃংখলা' তো শেকল-পরানো অবস্থা বোঝায়! শৃংখল তো আক্ষরিক অর্থেই শেকল!! সুতরাং 'উচ্ছৃংখলতা' বা 'বিশৃংখলা' তো কাম্যই বটে। কিন্তু জনমানসে শৃংখলার প্রতি খুব টান আর আনুগত্য আছে। এটা অবশ্য একদিকে অধিপতি/অভিজাত দীক্ষায়ন-প্রকৌশলের ফল, অন্যদিকে সমাজে সু-বন্দোবস্ত থাকবে— এই আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন। প্রথম অর্থটার প্রণয়ন এবং প্রচারে রাজতন্ত্র-সামন্ততন্ত্র ঔপনিবেশিক প্রভুর

বিদ্যাবুদ্ধি এবং মার্কসবাদী-লেনিনবাদী-মাওবাদী কমিউনিস্টদের অবদান অগ্রগন্য আর, দ্বিতীয় অর্থটার যে বাসনা তা কাম্য, কিন্তু তা 'শৃংখলা' শব্দে যে বোঝানো যায় না।

তো ধৈর্য ধরে দীর্ঘকালের কাজ-লেখালেখি-তর্ক দিয়ে বোঝাতে হবে। বোঝাতে হবে যে, নৈরাজ্যই হলো সুবন্দোবস্ত— এটাই প্রকৃতির প্রকৃতি। প্রকৃতি অভিজাতমনস্ক নয়, বরং গণবৃত্তিক, প্রজাতিমনস্ক সকলেই সুন্দর বিকাশের সম্ভাবনা এর একটা অতি-সাধারণ বৈশিষ্ট্য। কিন্তু আপাতত 'ব্যানা'[১৮] বা ব্যানার বা নামচিহ্ন হিসাবে এদেশে 'নৈরাজ্যবাদ' কথাটা ব্যবহার না করাটা কৌশলের দিক থেকে কাজের। শব্দটা 'নিষিদ্ধ' করে দিতে বলছি না—একে স্বমহিমায়, সদর্থে, বুৎপত্তিগত সঠিক/শুদ্ধ অর্থে প্রতিষ্ঠার লড়াই চালিয়ে যেতে তো হবেই—আপাতত শুধু মুক্তিপন্থী সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের নামচিহ্ন বা পরিচয়চিহ্ন হিসেবে ব্যবহার না করার কৌশল হিসেবে বলছি।

'অরাজতন্ত্র' নামচিহ্ন হিসেবে স্বভাবতই সদর্থক। এদেশের মানুষ ঐতিহাসিকভাবেই রাজতন্ত্রবিরোধী-গণতন্ত্রী, সাধারণতন্ত্রী, প্রজাতন্ত্রী, গণপ্রজাতন্ত্রী। রাজা, রাজনীতি, রাজতন্ত্র (সর্বপ্রকার রাজতন্ত্র বা রাজাতন্ত্র) ধারণাগুলোকে 'অরাজতন্ত্র' দিয়ে সহজেই খারিজ করা যায়। 'অরাজতন্ত্র' বললে তথাকথিত 'বিশৃংখলাও বোঝায় না। বাংলায় Politics কথাটা কতিপয়ের মিথ্যাচারণমূলক ছলাকথা (Tricks), গণবিরোধী কার্যক্রম, কলাকৌশল অর্থে 'রাজনীতি' শব্দের মধ্যে ধরা পড়েছে। এই অর্থ এখন সুপ্রতিষ্ঠিত। রাজনীতি, রাজনৈতিক দল— সব এখন গণভাবে প্রত্যাখ্যাত। এদেশের মানুষ এখন যাবতীয় রাজনৈতিক কার্যকলাপকে ঘৃণা করে। মনে মনে ও প্রকাশ্যে ঘৃণা করে, এবং এসব থেকে নিজেদেরকে দূরে রাখতে চায় (সবসময় পারে না), এবং সর্বোপরি রাজনীতিকে রাজার নীতি বলে মনে করে, যা নাকি (তাঁদের মতে) 'রাজা'দের স্বার্থ রক্ষা করে। রাষ্ট্রের নেতা বা রাজনৈতিক দলের নেতাদেরকে মানুষ এদেশে 'রাজা'ই মনে করে— অনেক ক্ষেত্রে মুখে উচ্চারণ করে বলেও। কিন্তু/অথচ Politics-এর সত্যিকারের অর্থ যে রাজনৈতিক প্রক্রিয়া-কর্মকাণ্ড নীতিনির্ধারণমূলক বিষয় আশয়— সেসবের প্রতি মানুষ কিন্তু উদাসীন নয় মোটেও বরং অংশগ্রহণ করতে উৎসাহী, নিজেদের ভাগ্য রাজারানীদের হাতে ছেড়ে না দিয়ে নিজেরাই নির্ধারণ করতে আগ্রহী।

---

[১৮] লালন ফকিরের গানে 'ব্যানা' শব্দের ব্যবহার স্মর্তব্য: "সালাতুল মেরাজুল মুমিনিনা, জানতে হয় নামাজের ব্যানা"। শব্দটি পরে *চৈতন্যচরিতামৃত* গ্রন্থেও পাই। অভিধানে এর অর্থ ঐ ব্যানার বা নামচিহ্ন জাতীয় বস্তু।

> তবু, অভ্যাসের কারণে এবং 'স্বাভাবিক' নেতৃত্ব অর্থে কারও কারও পক্ষে (সিধু-কানু-তীতুমীরদের মতো) নেতা হওয়ার, তথা 'রাজা' হওয়ার এক ধরনের প্রয়োজনীয়তার কথা যাঁরা অগ্রাহ্য করতে পারেন না (এক অর্থে এটাকে অগ্রাহ্য করা আসলেই সম্ভব হয় না) তারা 'অরাজতন্ত্র' শব্দে ঘাবড়ে যেতে পারেন। তাঁদেরকে বোঝানোর জন্য 'অরাজতন্ত্র' কথাটার সদর্থক ব্যাখ্যা হিসাবে 'সামাজিক স্বরাজতন্ত্র' বা 'সমাজতান্ত্রিক স্বরাজতন্ত্র' শব্দবন্ধটা কাজে লাগানো যায়। রবিঠাকুরের 'আমরা সবাই রাজা' মানে গণমানুষের স্বরাজতন্ত্র।
>
> 'মহাত্মা' গান্ধীর 'স্বরাজ' আন্দোলনও স্মর্তব্য। 'স্বরাজ' কথাটা দিয়ে মানুষের নিজের 'রাজা' হয়ে ওঠার কামনাকে ধারণ করা যায়। ... আমরা যখন সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক স্বরাজ বলব, তখন বিদ্যালয়, পরিবার, কারখানা ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলোর স্ব-মালিকানা, স্ব-পরিচালন বা স্ব-নিয়ন্ত্রণকে বোঝাবে। এটাই নৈরাজ্যবাদের প্রধান একটা কথা।
>
> অন্য দিকে, বাউল-সুফি-তান্ত্রিক 'আন্দোলন'গুলোতে 'মানুষ' হয়ে ওঠা, নিজেই নিজের 'খোদা' হয়ে ওঠা, নিজেকে সার্বভৌম 'আল্লাহ'[র প্রতিভূ] হিসেবে (নিজের সার্বভৌম কর্তাসত্তাকে) আবিষ্কার করার যে আকাঙ্ক্ষা আছে তাকেও 'সামাজিক বা সমাজতান্ত্রিক স্বরাজতন্ত্র' এর মিত্র হিসেবে পাওয়া যাবে। সাধক তখনই নিজে 'খোদা' হিসেবে হয়ে ওঠে যখন সে দেশের মধ্যে, জাতির মধ্যে, প্রকৃতির মধ্যে নিজের কর্তাসত্তাকে বিলীন না করেও নিজেকে পরম্পরার মধ্যে একাকার/ঐক্যসূত্রে গ্রথিত/ফানা হিসেবে উপলব্ধি করে, দেখতে পায়। শিষ্য ছাড়া তো গুরুর মুক্তি নাই। সাধনা তাই সামাজিক। সাধুরা 'খোদার জাহানে রাষ্ট্রের খোদগারি' মানেন না— তাঁরাও তাই (নৈরাজ্যবাদী) অরাজতন্ত্রী বা সামাজিক স্বরাজতন্ত্রী। ... (সেলিম রেজা নিউটন ২০০৬)

অ্যানার্কি বা অরাজ একটি পথ মাত্র। পথ কখনো আগে থেকে জানা থাকে না। আমার ক্ষেত্রে পথ, পথিক বা পন্থার ধারণা আমি পেয়েছি এক দিকে ইউরোপীয় অ্যানার্কির (মার্টিন বুবার, ১৯৪৯) এবং অন্য দিকে সুফি-ইসলামের কাছ থেকে। (একজন সুফি সাধক কখনও নিজেকে 'সুফি' নামে আখ্যায়িত করেন না।) পরে তন্ত্র তাও জেন এবং সহজিয়া সাহিত্য থেকেও পেয়েছি পন্থার হদিস।

দেশ-কাল-পরিস্থিতি নির্বিশেষে নৈরাজ্যের স্বাভাবিক অভিপ্রকাশের ঘটনা এত বিচিত্র এবং এত শত ধারায় এর বিকাশ ঘটেছে যে নৈরাজ্যকে চাইলে আমরা কলিম খানের মতো করে 'ন্যাচারাল পারফেকশন' বা 'শিবতার নীতি'

তথা 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি' (কলিম খান, ১৯৯৫), অথবা স্বরাজ-অরাজ-নৈরাজ অথবা অন্য কোনো নামে ডাকতে পারি। এমনকি আমি সারা পৃথিবীর প্রেক্ষাপটে যখন দেখতে চাই তখন তাকে তন্ত্র, সংঘ, বা সহজ/সহজিয়া, তাও, জেন, এবং সুফি-ইসলাম নামেও ডাকি। কাজেই, ঘটনাটা স্রেফ এম. এন. রায়ের নয়— এটা প্রাচীণ তন্ত্র-চার্বাক-লোকায়ত থেকে রায়-গান্ধী-তাও-তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথ হয়ে এমনকি বর্তমান কালের 'পাষণ্ড'বৃন্দ পর্যন্ত প্রবহমান স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক-সামাজিক একটা প্রবণতা। এই প্রবণতার হাজারো রূপভেদ সত্ত্বেও স্বাধীনতা-সমতা-সহযোগিতা-সংহতি-সৃজনশীলতার মৌলিক যে মনুষ্যনীতি, তা সদাভব সদাতন সনাতন শাশ্বত চিরন্তন নিরাকার নিরঞ্জন[১৯] সর্বথা (সর্বব্যাপী) সদাহাজির অবস্থায়, নিত্যবস্তু হিসেবে, কোনো না কোনো নাম-রূপ পরিগ্রহ করে নিজের প্রকাশ ঘটায়। এই যে দেশ-কাল-পরিস্থিতিভেদে হাজারো নামে নৈরাজ্যের হাজার রকমের স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ— একেই আমি বলি 'নৈরাজ্যের নিত্যতা'[২০]। এই বই এই ধারণারই অন্যতম ধারাভাষ্য বটে। আর, বইয়ের এই শেষ অধ্যায়টিতে নানা ভাবে আমি এই ধারণারই পরিচয় হাজির করতে থাকব।

৭.৪ বাকুনিনের নৈরাজ্য: স্বাধীনতা মানবদেহের একটি বীজানু

এই যে নৈরাজ্যবাদীদের বিশ্বাস, নৈরাজ্যবাদ মানুষের একটি স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তিক ধারা— এ সম্পর্কে আরো খানিকটা আলোকপাত না করলে বর্তমান গ্রন্থটি অসম্পূর্ণ থেকে যায়। নৈরাজ্য প্রকৃতপক্ষেই একটি স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক বুদ্ধিবৃত্তিক প্রবণতা যার স্বতঃস্ফূর্ত অভিপ্রকাশ দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে নিজেকে নিজের মতো করে, স্বকীয় পন্থায়, মেলে ধরে। বাকুনিন যেমনটা বলতেন, স্বাধীনতা আসলে এক প্রকার বীজানু যা আমাদের দেহে থাকে।

---

[১৯] অতএব ঋষিগণ কি বলিব আর / একমাত্র নিরঞ্জন জগতের সার / মুক্তির সমান আর নাহি কিছু ধন / ভাগ্যফল ফলে যার পায় সেই জন (শিবপুরাণ, ১৪১২ বঙ্গাব্দ: ২০০)

[২০] আজ থেকে পাঁচ/ছয় বছর আগে, তৎকালে ইংরেজি সাহিত্যের ২য় বর্ষের শিক্ষার্থী, নাটোরের কবি সজীব সরকারকে এক দিন যখন আমি নৈরাজ্যের এই বিশেষ দিকটি সম্পর্কে বিরতিহীনভাবে 'জ্ঞান' দিতে দিতে প্রদক্ষিণ করছিলাম গোটা সাহেববাজার, তখন আমার ঘণ্টা দুয়েকের বাচালতার শেষাংশে সজীব জানতে চান গোটা ধারণাটাকে তাহলে 'নৈরাজ্যের নিত্যতা' হিসেবে আখ্যায়িত করা চলে কিনা। আমি লাফিয়ে উঠে গ্রহণ করি। সুতরাং, বিশেষ এই শব্দবন্ধটি বাংলায় প্রণয়ন করার পুরো আনন্দটুকুর জন্য সজীব সরকারের কবিসত্তাই দায়ী।

যেমন ধরা যাক, বাকুনিন তাঁর ১৮৬৬ সালের "বৈপ্লবিক মূলনীতির সারকথা" (রেভলুশনারি ক্যাটেসিজম) রচনায় বলছিলেন, স্বাধীনতার বীজানুই তাঁর কাছে মনুষ্যত্বের মূল্য। তাঁর ভাষায়, "বাচ্চাদেরকে যখন কঠোরভাবে শৃংখলা শেখানো হয়, এমনকি তখনও মনুষ্য-তাৎপর্যের প্রতি, তথা *স্বাধীনতার বীজানুর* প্রতি, সম্মানবোধ হাজির থাকতে হবে— অবশ্য-অবশ্যই" (বাকুনিন, ১৯৭১)[২১]। বাকুনিন কথিত স্বাধীনতার এই বীজানুকে ধ্বংস করা যায় না, কেননা বাকুনিন নিজেই অসংখ্য জায়গায় দেখিয়েছেন: স্বাধীনতা মানুষের একটি প্রাকৃতিক প্রবণতা, অন্তর্জাত তাড়না। যেহেতু বিজ্ঞ ব্যক্তির জন্য ইশারাই যথেষ্ট, আপাতত তাই শুধু কিছু উদ্ধৃতি দিয়েই ছেড়ে দিচ্ছি।

তাঁর *মার্কসবাদ স্বাধীনতা ও রাষ্ট্র* গ্রন্থে বাকুনিন বারবার করে "বিদ্রোহ করার সম্মানজনক অভ্যাস"[২২], "বিদ্রোহ করার খোদ সহজাত প্রবৃত্তি"[২৩], "স্বাধীনতার সহজাত প্রবৃত্তি"[২৪], "অর্থনৈতিক সমতার জন্য জনসাধারণের সহজাত প্রবৃত্তিগত আকুলতা"[২৫] ইত্যাদি ধারণার কথা উল্লেখ করেছেন, বুঝিয়ে বলেছেন (বাকুনিন ১৯৫০)। ঐ বইয়েই মার্কসীয় ইতিহাস-তত্ত্বের বিপরীতে গিয়ে বলছেন বাকুনিন, "মানুষের ওপর যে অর্থনৈতিক চাহিদার তাগাদা ক্রিয়া করে সেটি ছাড়াও, তার মধ্যকার [বিদ্রোহের] সহজাত প্রবৃত্তিই হয়ে ওঠে যাবতীয় মানব-মুক্তির সবচাইতে শক্তিশালী কারক"[২৬] (বাকুনিন ১৯৫০)।

নৈরাজ্যের স্বাভাবিকতা সম্পর্কে বাকুনিনের এই ধারণা প্রসঙ্গে *নৈরাজ্য-সংহিতা* নামক এক ব্রাজিলীয় বইয়ের "ভূমিকা"য় নোম চমস্কি যে কথা বলেছেন তা রীতিমতো প্রণিধানযোগ্য:

> আমরা আশা করতে পারি যে বাকুনিনের বলা 'স্বাধীনতার সহজাত প্রবৃত্তি' সত্যিই মানবপ্রকৃতির কেন্দ্রীয় দিক থেকে গাঠনিক একটা উপাদান। কর্তৃত্বপরায়ন সব মতবাদ দিয়ে, এবং এসব মতবাদ যে নৈরাশ্য চাগিয়ে তোলে তা দিয়ে, ক্ষমতা দিয়ে, এবং ক্ষমতার দ্বারা

---

[২১] "Respect for human worth, *the germ of freedom*, must be present even while children are being severely disciplined."
[২২] "the salutory habit of revolt"
[২৩] "the very instinct of revolt"
[২৪] "the instinct ... of liberty"
[২৫] "The instinctive passion of the masses for economic equality".
[২৬] "In man, besides the economic needs which urge him on, this instinct [of revolt] becomes the most powerful agent of all human emancipations."

সাধিত ধ্বংসযজ্ঞ দিয়ে এই প্রবৃত্তিকে দীর্ঘ কাল ধরে দাবিয়ে রাখা ও নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না। (নোম চমস্কি, ২০০৫: ১৫২)

"গণতন্ত্রের বিপদ হজম করা" নামের এক রচনায় চমস্কি এ প্রসঙ্গে আরো খানিকটা ভেঙে বলেছেন:

> যেসব "স্বাভাবিক বিশ্বাস" আমাদের আচার-আচরণকে ও আমাদের চিন্তাকে পরিচালনা করে, সেগুলোর মধ্যকার কোনো কোনোটার দিকে প্রথমে একটু তাকানো যাক বরং। এরকম একটা বিশ্বাস হলো, সারসত্তাগত দিক দিয়ে মানবপ্রকৃতির খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা গাঠনিক উপাদান হচ্ছে বাকুনিন যাকে বলতেন "স্বাধীনতার একটা সহজাত প্রবৃত্তি"। যদি আমরা এরকম একটা অনুমান প্রণয়ন করি, তাহলেই শুধু হিউমের হেঁয়ালির উদ্ভব ঘটে। এই প্রবৃত্তি অনুসারে কাজ করতে ব্যর্থ হওয়াটাই হলো সেই জিনিস যা হিউমের কাছে অত্যন্ত বিস্ময়কর মনে হয়েছিল। এই একই ব্যর্থতা রুশোকে সেই ধ্রুপদী আক্ষেপ করার দিকে ঠেলে দিয়েছিল যে মানুষ জন্মায় স্বাধীন হয়ে, কিন্তু ধনীরা তাদের লুটপাট নিশ্চিত রাখার জন্য যে প্রহেলিকা তৈরি করে, সুশীল সমাজের সেই প্রহেলিকায় প্ররোচিত হয়ে সর্বত্র সে বাঁধা থাকে শেকলে। স্বাধীনতার সহজাত প্রবৃত্তিকে মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত শক্তপোক্ত একটা তত্ত্বের জমিনে দাঁড় করানোর নানা চেষ্টা অব্যাহত আছে। এমন নয় যে সেগুলো কৌতূহল-উদ্দীপক নয়, কিন্তু এটা সুনিশ্চিত যে মামলাটিকে প্রমাণিত করার ধারেকাছেও সেগুলো নাই। কাণ্ডজ্ঞানের আরো সব দিকের মতো এই বিশ্বাসটিও একটি পরিচালনামূলক নীতি হিসেবে থেকে গেছে যা আমরা গ্রহণ করি, বা প্রত্যাখ্যান করি, আমাদের যার যার বিশ্বাস অনুযায়ী। কোন বিকল্পটাকে আমরা বেছে নিচ্ছি তা আমাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য বিরাট আকারের অভিঘাত সৃষ্টি করতে পারে। (নোম চমস্কি, ২০০৫: ১৫৫)

অন্য দিকে, বাকুনিনের *ঈশ্বর ও রাষ্ট্র* গ্রন্থের অর্বাচীন সংস্করণের ভূমিকায় বাকুনিনের জবানিতে প্রফেসর পল অ্যাভ্রিচ (১৯৭০) জানাচ্ছেন,

> প্রত্যেক মানুষের মধ্যে এমনিতেই যে "স্বাধীনতার তাড়না, সমতার আকুলতা, বিদ্রোহের পবিত্র সহজাত প্রবৃত্তি" প্রভৃতি বৈপ্লবিক জোশ আছে— শ্রমিকদেরকে তত্ত্ব শেখানোর মাধ্যমে মার্কস কেবল সেটাকে কুঁকড়ে দিতেই সফল হবেন মাত্র। মার্কসের "বৈজ্ঞানিক" সমাজতন্ত্রের বিপরীতে বাকুনিনের যে সমাজতন্ত্র সেটা ছিল "বিশুদ্ধভাবে সহজাত প্রবৃত্তিগত"— এ কথা বাকুনিন জোরের সাথেই বলেছিলেন। (পল

অ্যাভ্রিচ, ১৯৭০-এর vi নম্বর পৃষ্ঠায় উল্লেখিত এইসব হদিস দ্রষ্টব্য: বাকুনিন, ১৮৯৫-১৯১৩: ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ৩৯৯; ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ১৮৯)

আবার, পল ম্যাকললিন (২০০২: ৪৫, ৯৭; ৪৬ নম্বর পাদটীকা) এর বরাতে জানা যাচ্ছে, বাকুনিনের মধ্যে "ন্যায় বিচারের সহজাত প্রবৃত্তি"র ধারণাও ছিল বহুল ব্যবহৃত একটি ধারণা (বাকুনিন, ১৮৬৯-১৯৭০)।

সব মিলিয়ে মানুষের ভেতরে স্বাধীনতা-সমতা-সংহতি-সৃজনশীলতা-বিদ্রোহ-ন্যায়বিচার প্রভৃতির সহজাত এইসব প্রবৃত্তি (বা অন্তর্জাত তাড়না) এমনই ব্যাপার যা স্বাধীনতা, সমতা এবং আত্মমর্যাদাপূর্ণ সামাজিক-প্রাকৃতিক পরিবেশের বিন্যাস-বন্দোবস্ত ছাড়া টিকে থাকতে পারে না। এই যে স্বাধীনতা-স্বাভাবিকতা-সমতা-সংহতি-সৃজনশীলতার সামাজিক-প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত—এরই নাম নৈরাজ্য।

এই ধারণাটারই প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন পিয়েরে জোসেফ প্রুধোঁ *একজন বিপ্লবীর স্বীকারোক্তি* নামে তাঁর ১৯৪৯ সালের একটি রচনায়: "নৈরাজ্য হচ্ছে ক্ষমতা বাদ দিয়ে অর্জিত নিয়ম-বন্দোবস্ত" ("অ্যানার্কি ইজ অর্ডার উইদাউট পাওয়ার")। এ থেকে পরে জন্ম নেয় জনপ্রিয় নৈরাজ্য স্লোগান 'অ্যানার্কি ইজ অর্ডার' বা 'নৈরাজ্যই নিয়ম'। এই বাক্যবন্ধটি থেকেই পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে ইংরেজি 'এ' অক্ষরের চারপাশ ঘিরে আঁকা বৃত্ত দিয়ে রচিত Ⓐ নৈরাজ্য-চিহ্নটি। বৃত্তটি হচ্ছে ইংরেজি 'ও' অক্ষর। এই 'এ' এবং 'ও' হচ্ছে 'অ্যানার্কি ইজ অর্ডার' কথাটির নাম-সংক্ষেপ। নৈরাজ্যের সুবিখ্যাত ইতিহাস রচয়িতা পিটার মার্শাল লিখেছিলেন এই চিহ্নটি হচ্ছে "শহুরে অঞ্চলে দৃশ্যমান সব চেয়ে এজমালি দেয়াললিখন" (পিটার মার্শাল, ২০০৮: ৫৫৮)। 'নৈরাজ্যই নিয়ম' এর এই ধারণাটি নৈরাজ্য-ধারণার প্রাকৃতিক বন্দোবস্তের ইঙ্গিতবহও বটে। এই বইয়ের ৪.৫.১ অংশে ("জন্মগতভাবে মানুষ স্বার্থপর, অর্থনৈতিক প্রাণী নয়"), ৪.৫.২ অংশে ("জন্মগতভাবে মানুষ হিংস্র নয়, সহযোগিতাপ্রবণ") এবং ৫.১ অংশে ("স্বাধীনতা ও শ্রেয়োবোধ বিবর্তনসূত্রে বিজড়িত") রায়, হুডল্ফ হকার এবং পিটার ক্রপোৎকিনের আলোচনা থেকে সুস্পষ্টই বোঝা যায় যে স্বাধীনতা-সমতা-সংহতি-সৃজনশীলতা তথা নৈরাজ্যের ধারণাটি প্রাকৃতিক বিবর্তনের আইনের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি ধারণা। এ থেকে 'নৈরাজ্যের নিত্যতা' সম্পর্কিত ধারণাটিই আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

সেই সাথে এখানে ক্রপোৎকিনের প্রাকৃতিক বিবর্তনের ধারণাটিকে আরো এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সাম্প্রতিক পণ্ডিত গ্রাহাম পারচেজের পিএইচডি থিসিসের শরণ নেওয়া যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ার সিডনী শহরের নিউ সাউথ ওয়েলস বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০০৩ সালে সম্পাদিত তাঁর *পিটার ক্রপোৎকিন:*

ইকলজিস্ট, ফিলসফার অ্যান্ড রেভল্যুশনারি শীর্ষক পিএইচডি থিসিসের শুরুর "সারসংক্ষেপ" অংশে গ্রাহাম পারচেজ দেখিয়েছেন যে বিজ্ঞান ও সামাজিক তত্ত্ব নিয়ে ক্রপোৎকিনের বিচিত্র রচনারাশিকে প্রণালীবদ্ধভাবে সাজালে তা থেকে এ "পৃথিবীতে প্রাণের বিবর্তনের ওপর সমাজসত্তাগত দিকটির প্রভাব" সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা অর্জন করা যায় (গ্রাহাম পারচেজ ২০০৩: ৬)। থিসিসের ৬ষ্ঠ অধ্যায় "নৈরাজ্যবাদ, প্রকৃতি এবং সংগঠন" এ পারচেজ বিস্তারিত ভেঙে দেখিয়েছেন প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত বা প্রকৃতির সংগঠন-প্রণালীর সাথে কেন্দ্রীভূত হায়ারার্কি বা উচ্চনিচ-কর্তৃত্ব-ক্রমতন্ত্রের মধ্যকার সম্পর্ক-সূত্রাবলী। প্রাণের বিকাশের সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক ইতিহাস, আমাদের কোষের মধ্যকার বংশগতি-দানা বা জিনের বিকেন্দ্রায়িত স্বয়ম্গঠন, জীবজগতের মধ্যকার স্থানীয়-সামাজিক স্বপরিচালন-প্রণালী, আমাদের মস্তিষ্কের বিকেন্দ্রীভূত স্বপরিচালন-নীতি ইত্যাদি প্রভৃতি সংক্রান্ত নানান বৈজ্ঞানিক মতবাদ, আবিষ্কার এবং ব্যাখ্যার ওপর ভিত্তি করে পারচেজ প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, বহিঃস্থ কোনো কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সৃষ্ট বা বিন্যস্ত বা পরিচালিত সিস্টেম নয় আমাদের মা প্রকৃতি। পূর্ণাঙ্গ অটোনমি বা আত্মকর্তৃত্বই হচ্ছে প্রকৃতির একটি নিয়ম। এর সমস্ত উপাদান-অংশ-কারক একেকটি স্বপরিচালিত সিস্টেম-সত্তা। এ হচ্ছে জগৎসত্তার স্থানীয় বা অভ্যন্তরীণ স্বপরিচালনার বা আত্ম-সংগঠনের প্রাকৃতিক নীতি। প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত নিজে নিজের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখে, নিজে নিজের বিকাশ ঘটায়, নিজে নিজের নিত্য-নবায়ন ঘটায়। প্রকৃতির সংগঠন-নীতি হচ্ছে অ-কেন্দ্রায়িত, পরস্পর-সহযোগিতাপ্রবণ এবং হায়ারার্কিবিরোধী। অন্য দিকে, রাষ্ট্র প্রকৃতিসিদ্ধ কোনো সংগঠন নয়। রাষ্ট্র হচ্ছে অপ্রাকৃতিক বা অস্বাভাবিক একটি প্রতিষ্ঠান। প্রকৃতি যে নিয়মে চলে রাষ্ট্র চলে তার ঠিক উল্টা নিয়মে। প্রকৃতিতে হায়ারার্কি নাই। আর, রাষ্ট্র চলে হায়ারার্কির নিয়মে। মনে পড়ে, বাকুনিনও তাঁর নানা রচনায় বিশেষত "হোয়াট ইজ অথরিটি" এবং "পাওয়ার অ্যাণ্ড অথরিটি" রচনা দুটিতে দেখিয়েছিলেন, একমাত্র প্রকৃতি নিজেই হলো সেই কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ যার নিয়মকানুন আবিষ্কার করা, হৃদয়ঙ্গম করা, মেনে চলা এবং নিজেদের কাজে লাগানো ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এ এমন এক কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ আমরা নিজেরাই যার গাঠনিক অংশ-উপাদান-সন্তান। এ আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, বাইরে থেকে আমাদের ওপর চাপিয়ে দেওয়া কোনো কর্তৃত্ব নয়। পারচেজের বরাতে সম্যকভাবে জানা যাচ্ছে, ক্রপোৎকিন এই অর্থেই প্রকৃতির নিয়মগুলোর বোঝার এবং তার নৈরাজ্যপ্রবণ বৈশিষ্ট্যগুলোকে শনাক্ত করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে, প্রকৃতি নিজেই নৈরাজ্যের নিত্যতার জলজ্যান্ত এবং জড়জ্যান্ত অভিপ্রকাশ। সাম্প্রতিক কালের ইন্টারনেট নিজেই এমন এক মানবীয়

মহাসংগঠন যা স্বপরিচালিত, কেন্দ্রীভূত কর্তৃপক্ষবিহীন, বিকেন্দ্রায়িত, স্ব-নবায়িত একটি প্রতিষ্ঠান। নৈরাজ্যের নিত্যতার এ আরেক মানবীয় মহাপ্রকাশ বটে।

৭.৫ আদিম ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে কর্তৃত্বনীতি বনাম শিবতার নীতি

নৈরাজ্যের স্বাভাবিক-পৌরাণিক অভিপ্রকাশটিকে শনাক্ত করার ক্ষেত্রে নিজের অজান্তেই দুর্দান্ত কাজ করে চলেছেন কলিম খান।[২৭] বেশ পরে হলেও তাঁর সাথে মানিকজোড়ের মতো জুটেছেন বর্ষীয়ান ইংরেজি-সংস্কৃত পণ্ডিত রবি চক্রবর্তী।[২৮] তাঁরা দুজনে মিলে যে ভাষাতাত্ত্বিক কর্মসম্পাদন করে চলেছেন শত প্রতিকূলতা অতিক্রম করে এবং বন্ধু-বান্ধব-সুহৃদের সাহায্য-সযোগিতায় তা এক কথায় রীতিমতো দুর্লভ।

খানের গ্রন্থাকারে প্রকাশিত প্রথম রচনাটিই (*মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে*; কলিম খান, ১৯৯৫) বলতে গেলে তাঁর ইতিহাসবীক্ষার মূল রূপকল্পের ইশতেহার, যদিও তাঁর ভাষাতাত্ত্বিক মূল 'আবিষ্কার'টি ('ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি') প্রথম ছাপা হয়েছিল এরও আগে, যতদূর মনে পড়ে "ভাষাতত্ত্বের পূর্ব দিগন্ত" নামের একটি রচনায়, একটি ছোটকাগজে।[২৯]

তো, *মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে* নামের এই বইতে তিনি "আধুনিক বিশ্বের নিকট আজও অজ্ঞাত" কিন্তু সুবিন্যস্তভাবে "বেদ পুরাণাদিতে বিধৃত মানবসভ্যতার আদিম ইতিহাসটাকে" তুলে ধরার দুর্দান্ত, চাঞ্চল্যকর ও বিদ্যা-ঘন ও তথ্য-ঘন সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন ("প্রাক-কথন", কলিম খান, ১৯৯৫: ১১)। তাঁর ভাষায়, "ইতিহাসের সেই প্রেক্ষাপটে যাকে সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ভূমিকায় দেখা গেল, তার আধুনিক নাম মৌলবাদ; পাওয়া গেল তার উদ্ভব ও বিকাশের ইতিহাসটাও" ("প্রাক-কথন", কলিম খান, ১৯৯৫: ১১)। আমি এখানে অল্প ইঙ্গিতে দেখানোর চেষ্টা করব, কলিম খান যাকে 'মৌলবাদ' বলছেন তা আসলে মানব সমাজের 'কর্তৃত্বনীতি' বা 'কর্তৃত্বতন্ত্র' তথা কর্তৃত্বক্রমতন্ত্র'। তার আগে দেখে নিই ঠিক কী বস্তু কলিম

---

[২৭] দ্রষ্টব্য: কলিম খান, ১৯৯৫; কলিম খান, ১৯৯৯; কলিম খান, ২০০০; কলিম খান, ২০০১; কলিম খান, ২০০২-ক; এবং কলিম খান, ২০০২-খ।

[২৮] দ্রষ্টব্য: কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, ২০০৪; কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, ২০০৬; কলিম খান ও রবি চক্রবর্তী, ২০০৮; এবং রবি চক্রবর্তী, ২০০২।

[২৯] নবপথ-সঞ্চারী এই প্রবন্ধটি পরে অবশ্য তাঁর *পরমা ভাষার সংকেত* গ্রন্থে (কলিম খান, ২০০১: ৭৭-৯৮) ছাপা হয়েছে।

খানের এই 'মৌলবাদ':

> মৌলবাদ একটি বিকৃত মানবিক-জীবন-নীতি। আগে যেভাবে সফল হওয়া গিয়েছিল, পরে ঠিক তেমনটি করবার যে নীতি তাকে মৌলবাদ বলে। এ হল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একই কর্মের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি'র নীতি। একে 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি', 'আচারের পুনরাবৃত্তি' 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। ... মৌলবাদ পূর্ব-বিধানের সদাচারে বিশ্বাসী, আর সদাচার সর্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা ইতিপূর্বে ঘটেনি তা সত্য নয়। যা ঘটে গেছে তাই সত্য; সত্য অতীত বলেই সে 'পূর্ব-বিধানে' পরিণত হবার যোগ্যতা ধরে। পূর্বের 'ন্যায়' করবার যে বিধান, তাই পূর্ববিধান। সেই হেতু পূর্ববিধান সব সময় 'ন্যায়'সম্মত। আর, মৌলবাদ পূর্ববিধানের সদাচারে বিশ্বাসী বলে সেও ন্যায়-সঙ্গত বা ন্যায়শাস্ত্রসম্মত। তাই মৌলবাদ আইনসঙ্গতও বটে। ন্যায় ও সত্যের জোর থাকে অতীত ঘটনায়। তাই আইন অতীত দ্বারা শাসিত বা ভূতশাসিত। যা আগে ঘটে নি, তা কোনো কিছুর 'ন্যায়' নয় বলেই অ-ন্যায়। আবিষ্কার নতুন বলেই কোন কিছুর 'ন্যায়' নয়। তাই আবিষ্কার মাত্রেই অ-ন্যায়। মৌলবাদ অন্যায়কে মেনে নিতে পারে না। নতুনকে মেনে নিতে তার আপত্তি, কেননা নতুন 'ন্যায়'-সঙ্গত নয়। কোনরকম ঝুঁকি নিতে মৌলবাদ রাজি নয়। পূর্ব-বিধানকে হুবহু মেনে চলাই তার নীতি। তাকে আংশিক বা সম্পূর্ণ অমান্য করবার স্বাধীনতা সে কাউকে দিতে পারে না। যে খেলা 'অব-লীলায়' খেলা যাবে, সেই নিশ্চিত খেলাটাই মৌলবাদ খেলতে চায়। লীলাতে তার বড় ভয়।
>
> 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি'র এই নীতি জীবনকে এক নিশ্চিত প্রবাহে প্রবাহিত করে; তা গড্ডলিকা প্রবাহ হলেও। জীবন প্রবাহকে কোনও ভাবেই বাধাগ্রস্ত হতে দিতে রাজি নয়। ... তাই সে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। ... (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৩-১৪। স্বতঃস্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদগুলোকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।)

পৃথক পূর্ণাঙ্গ প্রবন্ধ রচনা করে তাঁরই (এবং পরবর্তী কালে রবি চক্রবর্তীর) রচনাবলীর মালমশলা এবং ইতিহাসের মুক্তিপরায়ন পরিপ্রেক্ষিতের সাহায্যে বিস্তারিতভাবে দেখানো সম্ভব যে কলিম খান "মানবসভ্যতার আদিম ইতিহাস" এর প্রেক্ষাপটে "সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ভূমিকায়" যাকে দেখলেন, এবং

পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের জ্ঞানকাণ্ড মোতাবেক যাঁর নাম দিলেন 'মৌলবাদ'[৩০] সে আসলে বাকুনিন কথিত 'কর্তৃত্বনীতি' (বাকুনিন ১৯৭০: ৪১, ৪২, ৪৯, ৫৩; বাকুনিন ১৯৭১: ১০৪, ১৪২, ১৪৯, ২০০, ২০২, ২১৬ ইত্যাদি পৃষ্ঠা ছাড়াও এই বইয়ের বিভিন্ন রচনায় এর উল্লেখ আছে; বাকুনিন, ১৯৫০ এর প্রথম অধ্যায়); আর কলিম খান যাকে বলছেন 'শিবতার নীতি' তাকে চাইলে 'অরাজ-নীতিও বলা যেতে পারে। একই সাথে এও দেখানো সম্ভব যে যে-'মৌলবাদ'কে তিনি "সর্বাপেক্ষা সক্রিয় ভূমিকা"র মর্যাদা দিলেন তা আসলে আংশিক সত্য মাত্র— সম্ভবত অধিকতর সক্রিয় ভূমিকায় আসলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে, তাঁরই রচনা মোতাবেক, 'শিবতার নীতি'কে (অর্থাৎ, কর্তৃত্বনীতির চেয়ে স্বাভাবিক নৈরাজ্যের নীতিই চিরকাল অধিকতর সক্রিয়; যেমন যেমন বিদ্রোহ তেমন তেমন ভাবেই নিজেকে অভিযোজিত করে কর্তৃত্ব-তন্ত্র)।

কেন আমি কলিম খান বর্ণিত ঐ 'মৌলবাদ' বস্তুকে বলতে চাইছি না সে কথা ওঠা স্বাভাবিক। আমার কথা হলো 'মৌলবাদ' কথাটার মধ্যে কাকে 'মূল' ধরব? আজ যেটা কর্তৃত্বওয়ালাদের কাছে 'মূল', কালই সেটা দরকার পড়লে

---

[৩০] "পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানের মুখ" নামের এক প্রবন্ধে যা লিখেছিলাম তা থেকে কলিম খান কথিত 'মৌলবাদ' ধারণাটির সাথে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদের জ্ঞানকাণ্ডের যোগাযোগের স্পষ্ট আভাস পাওয়া যাবে। টুকে দিচ্ছি একটু অংশ:

> 'মৌলবাদ' শব্দটাকে ইংরেজিতে বলে fundamentalism। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা ২০০২ ডিলাক্স এডিশান সিডি-রম* এবং *মাইক্রোসফ্‌ট্ এনকার্টা এনসাইক্লোপিডিয়া ২০০২ সিডি-রম* বলছে, fundamentalism নামক পদার্থটার জন্ম ১৯-শতকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খ্রিস্টীয় পুনরুজ্জীবনবাদী প্রোটেস্ট্যান্ট ধারার মধ্যে। বাইবেলের সত্যকে অকাট্য মনে করা এই ধারার বৈশিষ্ট্য। এঁরা বৈজ্ঞানিক বিশ্ববীক্ষা ও বিবর্তনবিদ্যার ঘোর বিরোধী। ২০-শতকে মার্কিন ধর্মীয় ও সেক্যুলার জীবনে 'আধুনিক' প্রবণতাসমূহের বিরোধিতা হিসেবে এই মৌলবাদের প্রসার। ২০-শতকের শেষ ভাগে অসংখ্য চার্চ-সংস্থায়, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এবং বিশেষ বিশেষ সংগঠনের মধ্য দিয়ে এর প্রতিনিধিত্ব ঘটে। খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেই অসংখ্য খ্রিস্টান ধর্মগোষ্ঠী মৌলবাদের নানা রূপের চর্চা অব্যাহত রেখেছে। এঁদের মধ্যে কোনো কোনো গ্রুপ সশস্ত্রও বটে।
>
> খ্রিষ্টীয় ধর্মতত্ত্ব থেকে পাওয়া 'মৌলবাদ' কথাটা পরে আস্তে আস্তে সকল ধর্মমতের ক্ষেত্রেই সেই ধর্মমতের গোঁড়া ও আদি রীতি-নীতি-শিক্ষার অন্ধ অনুসারীদেরকে বোঝানোর জন্য ব্যবহার করা হতে থাকে। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০২: ১৩৮)

বদলে যাবে, যায়, তা বলাই বাহুল্য। আর যেটাই 'মূল' বলে ধরি না কেন, সেই মূলের কাছে ফিরে যাওয়া তো বিশেষ কোনো সমস্যা নয়। যেমন ধরুন, খানিক পরে 'শাস্ত্র' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে দেখতে পাব, কলিম খানও তো তার যুগান্তকারী মৌলিক ভাষাতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ক্ষেত্রে সেই আদিতম 'মূল' ব্যাকরণের বুৎপত্তিগত দিকের ওপরই নির্ভর করেছেন। 'বুৎপত্তি'র ভেতরেও তো সেই 'গোড়া' বা 'মূল'-এরই ব্যাপার।

আমার কাছে তাই প্রশ্নটা আসলে কোনো 'মূল'-এর প্রতি আনুগত্যের নয়— খোদ আনুগত্যের। কলিম খানের বর্ণিত এই 'মৌলবাদ' তো কোনো রকম কোনো 'মূল'-এর প্রতি আবশ্যিক কোনো আনুগত্য দাবি করে না, সে দাবি করে সকলের আনুগত্য— তার নিজের প্রতি। প্রশ্নটা তাই যেহেতু আনুগত্যের, সুতরাং প্রশ্নটা আসলে 'মৌলবাদ'-এর না— দাসত্বের, মানে রাজনীতির, শাসনের, দণ্ডনীতির, শাস্ত্রের।

আবার দেখুন, এই পশ্চিমা জ্ঞানকাণ্ডীয় 'মৌলবাদ'-এর ধারণা দিয়ে আজকের দুনিয়ার রাজনৈতিক 'মৌলবাদ'কেও বোঝা যায় না, কেননা এরাও তো কোনো 'মূল'-এর প্রতি সত্যিকার অর্থে অনুগত না। তারা আসলে নিজের নিজের পছন্দ মতো একেকটা 'মূল'কে 'মূলা' বানিয়ে অনুসারীদের নাকের সামনে ঝুলিয়ে রেখে তাদেরকে রাজনৈতিক-আদর্শিক-চিন্তাগত দাসত্ব-আনুগত্যের দিকে নিয়ে যেতে চায়— উদ্দেশ্য স্রেফ শাসন-কর্তৃত্ব অর্জন করা। তার মানে ঘুরে-ফিরে সেই দাসত্বের, মানে রাজনীতির, শাসনের, দণ্ডনীতির, শাস্ত্রের।

তো, এবার আসুন ওপরের ঐ 'মৌলবাদ'-বর্ণনাকে 'মৌলবাদ' শব্দটা বাদ দিয়ে আরেকবার পড়ি। আমি শুধু 'মৌলবাদ' শব্দটার বদলে কোথাও 'কর্তৃত্বনীতি', কোথাও বা 'কর্তৃত্ব-তন্ত্র' বসিয়ে দিচ্ছি (ফলে যা দাঁড়িয়েছে তা হলো আদিম ভারতীয় সমাজে কর্তা-কর্তৃপক্ষ-কর্তৃত্ব-তন্ত্রের স্বভাব ও উৎপত্তির পৌরাণিক ব্যাখ্যা):

> কর্তৃত্বনীতি একটি বিকৃত মানবিক-জীবন-নীতি। আগে যেভাবে সফল হওয়া গিয়েছিল, পরে ঠিক তেমনটি করবার যে নীতি তাকে কর্তৃত্বনীতি বলে। এ হল, রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, 'একই কর্মের পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি'র নীতি। একে 'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি', 'আচারের পুনরাবৃত্তি' 'একই কর্মের পুনরাবৃত্তি' ইত্যাদিও বলা হয়ে থাকে। ... কর্তৃত্বনীতি পূর্ব-বিধানের সদাচারে বিশ্বাসী, আর সদাচার সর্বদা সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকে। যা ইতিপূর্বে ঘটেনি তা সত্য নয়। যা ঘটে গেছে তাই সত্য; সত্য অতীত বলেই সে 'পূর্ব-বিধানে' পরিণত হবার যোগ্যতা ধরে। পূর্বের 'ন্যায়' করবার যে বিধান, তাই পূর্ববিধান। সেই হেতু পূর্ববিধান সব সময়

'ন্যায়'সম্মত। আর, কর্তৃত্বনীতি পূর্ববিধানের সদাচারে বিশ্বাসী বলে সেও ন্যায়-সঙ্গত বা নায়শাস্ত্রসম্মত। তাই কর্তৃত্বনীতি আইনসঙ্গতও বটে। ন্যায় ও সত্যের জোর থাকে অতীত ঘটনায়। তাই আইন অতীত দ্বারা শাসিত বা ভূতশাসিত। যা আগে ঘটে নি, তা কোনো কিছুর 'ন্যায়' নয় বলেই অ-ন্যায়। আবিষ্কার নতুন বলেই কোন কিছুর 'ন্যায়' নয়। তাই আবিষ্কার মাত্রেই অ-ন্যায়। কর্তৃত্ব-তন্ত্র অন্যায়কে মেনে নিতে পারে না। নতুনকে মেনে নিতে তার আপত্তি, কেননা নতুন 'ন্যায়'-সঙ্গত নয়। কোনরকম ঝুঁকি নিতে কর্তৃত্ব-তন্ত্র রাজি নয়। পূর্ব-বিধানকে হুবহু মেনে চলাই তার নীতি। তাকে আংশিক বা সম্পূর্ণ অমান্য করবার স্বাধীনতা সে কাউকে দিতে পারে না। যে খেলা 'অব-লীলায়' খেলা যাবে, সেই নিশ্চিত খেলাটাই কর্তৃত্ব-তন্ত্র খেলতে চায়। লীলাতে তার বড় ভয়।

'পুরাতনের পুনরাবৃত্তি'র এই নীতি জীবনকে এক নিশ্চিত প্রবাহে প্রবাহিত করে; তা গড্ডলিকা প্রবাহ হলেও। ... তাই সে একই কর্মের পুনরাবৃত্তির নীতিকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে। ... (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৩-১৪। স্বতঃস্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদগুলোকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।)

এবার এখানকার প্রত্যেকটা বাক্যকে এমনকি আজকের, বা যেকোনো যুগের, আইন-আদালত-থানা-পুলিশ-জেলখানা-রাষ্ট্র ইত্যাদির আলোকে, সার্বিকভাবে কর্তৃত্বক্রমতন্ত্রের আলোকে মিলিয়ে দেখুন, দেখবেন কীরকম অধিকতর সুস্পষ্ট হয়ে উঠছে তার অর্থ— সর্ব যুগের জন্য, সর্ব স্থানের জন্য।

আমি যা বলতে চাইছি, তার মোদ্দা কথাটা হলো, বেদ-পুরাণাদির নতুনতর বিনির্মাণের সাহায্যে কলিমের আলোচ্য বইয়ে তিনি আদিম মাতৃতান্ত্রিক জৈব সমাজে আদি পণ্যের সৃজন; তারপর জ্ঞানের ওপর একটা শ্রেণীগত মালিকানার জের ধরে প্রথমত জ্ঞানের ওপর আর তারপর উৎপাদনের সহায়-সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত মালিকানার উদয়; সেই সূত্রে আদিতম শ্রেণীভেদের উদ্ভব; এবং এসবের প্রেক্ষাপটে আদিতম কর্তৃত্ব-তন্ত্রের এবং আরও পরে আরও শাস্ত্রভিত্তিক-বলপ্রয়োগমূলক সুসংহত রাষ্ট্রতন্ত্রের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর যে দুর্দান্ত অমূল্য পৌরাণিক ইতিহাস দাঁড় করানো হয়েছে তাতে শুধু 'মৌলবাদ' শব্দটির জায়গায় 'কর্তৃত্বনীতি' বা 'কর্তৃত্ব-তন্ত্র' বসালেই আমরা মানবজাতির আদিম ইতিহাসের নৈরাজ্যিক বিবরণ তথা বঙ্গভারতবিদ্যা থেকে আহরণ করা একটি *মুক্তিপরায়ন ইতিহাস-বীক্ষা* পেয়ে যাব।

আমরা তাহলে 'পূর্ববিধান', 'আইন', 'ন্যায়', এবং 'পুরাতন' ('সনাতন' নয় কিন্তু) এর পাটাতনের ওপর গড়ে ওঠা যে সমাজসত্তাকে কলিম খান 'মৌলবাদ' হিসেবে আখ্যায়িত করছেন তাকেই 'কর্তৃত্বনীতি' বলে শনাক্ত

করতে সক্ষম হলাম এবং এই নীতির মূল বৈশিষ্ট্যগুলোকে পেলাম। জানা গেল 'অবলীলা'র 'অভ্যেস'ই কর্তৃত্বনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য। নির্দিষ্ট গণ্ডির মধ্যে, মৃত অক্ষরের রচিত আইনের মধ্যে সে জীবনকে বেঁধে রাখতে চায় যেন কিছুতেই কর্তৃত্বনীতিকে কেউ চ্যালেঞ্জ করতে না পারে, নতুন কোনো পথের সন্ধানে যেন না নামে কেউ। দেখলাম যে এই নীতি কোনো সুস্থ-স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জীবন-নীতি নয়, এটি একটি 'বিকৃত মানবিক-জীবন-নীতি'। এই কর্তৃত্বনীতিই আজকের বিশ্বে 'আইনের শাসন' নাম ধারণ করে এসে হাজির হয়েছে, সে কথা বুঝতে কোনো অসুবিধা হওয়ার কথা নয়। এবারে দেখি কলিম খানের ব্যাখ্যা অনুসারে এর বিপরীতে স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক জীবন নীতি তথা 'শিবতার নীতি'র পৌরাণিক ভাষ্যটা কী? এবারও আমি 'মৌলবাদ' তুলে দিয়ে 'কর্তৃত্বনীতি' বা 'কর্তৃত্ব-তন্ত্র' বসিয়ে দিচ্ছি:

> কর্তৃত্ব-তন্ত্রের বিকৃত জীবন-নীতির বিপরীতে যে চিরন্তন মানবিক জীবন-নীতি বিদ্যমান, তাকে 'ন্যাচারাল পারফেকশন' বা 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি' [= শিবতা][৩১]-র নীতি বলে। এই পৃথিবীর অস্তিত্বের সঙ্গে বিশুদ্ধির এই নীতি ওতপ্রোত। এই নীতি অনুসরণ করেই জড়-জগৎ বিকাশ লাভ করে চলেছে; চিন্তক জীব রূপে মানুষের উদ্ভব যার অন্যতম প্রকাশ। ... মানুষ প্রকৃতির শ্রেষ্ঠ সন্তান বিধায় তার স্বভাবের মধ্যেই এই নীতি অনুসরণের স্বাভাবিক প্রবণতা বিদ্যমান। ... কর্ম থেকে এ জ্ঞান বিচ্ছিন্ন হয় নি।
>
> স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতিতে পূর্ববিধান অস্বীকার্য্য নয় কিন্তু স্বাধীনতার দাবীও স্বীকার্য্য। এই নীতি অনুসরণ করলে কর্মক্ষেত্রে 'পূর্ববিধান ও স্বাধীনতার দ্বৈরাজ্য' [রবীন্দ্রনাথ] চলে। পূর্ববিধান যতখানি অক্ষম, স্বাধীনতা সেখানে ততখানি নববিধানের উদ্ভাবন করে বসে। উভয়ে মিলেমিশে নতুন বিধান প্রসূত হয়, পরবর্তী কার্য্যক্ষেত্রে সেটাই পূর্ববিধানের ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। স্বাধীনতার সুযোগে, প্রয়োজনে, পুনরায় নববিধানের জন্ম হয়; চক্রটি চলতে থাকে। ফলতঃ কর্মনীতি ও কর্মফলে নিত্য-বিশুদ্ধিও চলতে থাকে। মানুষ আরও সঠিক, আরও নিখুঁত, আরও সুন্দরের টানে এগোতে থাকে। (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৪-১৫। স্বতঃস্পষ্ট মুদ্রণপ্রমাদগুলোকে ঠিক করে দেওয়া হয়েছে।)

তাহলে, দেখা যাচ্ছে, সারা বইয়ে নৈরাজ্য বলতে যে জিনিস বোঝানোর চেষ্টা করে এসেছি তা তো এই জিনিসই। কলিম খান কর্তৃক ব্যাখ্যাত এই

---

[৩১] কলিম খানের পাদটীকা: "শিবের শিবত্ব কী? মুনিগণের এই প্রশ্নের উত্তরে বায়ু কহিলেন— 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নাম শিবতা'। দ্র. শিবপুরাণ / বায়বীয় সংহিতা / ৪র্থ অধ্যায় / শ্লোক ২০" (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৫)

পৌরাণিক 'শিবতার নীতি' তথা 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি'র সাথে নৈরাজ্যের পার্থক্য কোথায়?

তো, এই কর্তৃত্ব-তন্ত্র মানবসমাজের জন্য কী পরিণাম বয়ে আনে, সে ব্যাপারে কলিম খানের দুর্দান্ত পর্যবেক্ষণ নজরে নিয়ে আসলে আমরা সেই পরিণামটিকে উপলব্ধি করার অবকাশ তো পাবই, উপরন্তু এই সুযোগে 'কর্তৃত্বনীতি' এবং 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি' দুটোকে আরো একটু ভালো করে বুঝে নিতে পারব। (আবারও কিন্তু আমি 'মৌলবাদ'-এর বদলে 'কর্তৃত্বনীতি' বা 'কর্তৃত্ব-তন্ত্র' বসাচ্ছি।)

> সত্যম্-শিবম্-সুন্দরমের[৩২] এই চক্রটিকে কর্তৃত্ব-তন্ত্র চলতে দেয় না। নববিধান উদ্ভবের সুযোগ স্বরূপ যে স্বাধীনতা, তাকে সে খর্ব করে। নিত্য নতুন উপায় আবিষ্কারের পথ সে রুদ্ধ করে। তখন জীবন প্রবাহ আর দুর্বার বেগবতী থাকতে পারে না, ওঠে না তাতে আর প্রাণের জোয়ার। বস্তুত বিশুদ্ধিবাদ পূর্ববিধানকে প্রয়োজনমত অমান্য করবার স্বাধীনতা দেওয়ার ঝুঁকি নিতে রাজি, কর্তৃত্ব-তন্ত্র রাজি নয়। নতুন কিছু করবার স্বাধীনতা ভুলের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না। এইখানে কর্তৃত্বনীতি জোর পায়। ভুলের বিপত্তিকে সে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে। কর্তৃত্ব-তন্ত্রের দাবী এই যে, তার ঐরূপে ঝুঁকি না নেওয়ার মধ্যে হিতাকাঙ্খা বিদ্যমান। ... স্বাভাবিক বিশুদ্ধি ঐরূপ হিতাকাঙ্খার মধ্যে প্রীতির অভাব ও কৃপা দেখে, যা অনুগ্রহের নামান্তর। তার যুক্তি হল 'যেখানেই অনুগ্রহ আসিয়া সকলের চেয়ে বড় আসনটা লয়, সেইখান হইতে কল্যাণ বিদায় গ্রহণ করে', তাছাড়া 'হিত করা অথচ প্রীতি না করা— মানুষকে সকলের চেয়ে নত করবার সেই তো উপায়' [রবীন্দ্রনাথ]। কেননা অনুগ্রহ মাত্রই অনুগ্রহকারী ও অনুগৃহীত উভয়কে পরস্পরের বিপরীতে সমান অনুপাতে অহঙ্কারী ও গ্লানিযুক্ত করে থাকে।
>
> ...
>
> 'চিরদিন যা চলে আসছে' তার সঙ্গে কর্তৃত্ব-তন্ত্র আপনাকে জুড়ে দেয়। 'প্রচলিতের স্রোতের টানে সে হালছাড়া ভাবে আত্মসমর্পণ করে, তাই সে পরাসক্ত'। 'চিরাভ্যাসের গণ্ডী'র বাইরে সে চলে না, চলতে দিতেও রাজি না। কিন্তু, **'পরাসক্তি থেকে আত্মকর্তৃত্বে' যাওয়ার** যে **'স্বাভাবিক মানবিক প্রবৃত্তি'** তাকে 'চিরাভ্যাসের গণ্ডী'র মধ্যে আবদ্ধ করলে, মানুষের 'মনুষ্যত্বের একেবারে মূলে ঘা লাগে'। নিত্য নতুন জ্ঞানের সংযুক্তিকে এইভাবে আটকে রাখলে, মানুষের জ্ঞানের দিকের গোড়াটা কাটা পড়ে। আর 'জ্ঞানের দিকের গোড়াটা কাটা পড়িলেই

[৩২] অর্থাৎ, 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধি নীতি'র (বর্তমান গ্রন্থকারের টীকা; কলিম খানের নয়)।

কর্মের দিকের ডালপালা আপনিই শুকাইয়া যায়, তখন আর বেশি কিছু করিতে হয় না, শূদ্রের [মানুষের] মাথা আপনিই নত হইয়া ব্রাহ্মণের [কর্তৃত্ব-তন্ত্রের] পদরজে আসিয়া ঠেকে'। [রবীন্দ্রনাথ / কালান্তর]

আত্মাভিমান মদমত্ত কর্তৃত্ব-তন্ত্র চিরাভ্যাসের গণ্ডীতে আবদ্ধ করে মানুষকে 'পশু'[৩৩]তে পরিণত করে এবং সেই 'পশুর কানে গায়ত্রীমন্ত্র' জপ করতে থাকে। তখন সে মানুষ আর প্রশ্ন করে না, কেবল 'অবিশেষে দেখে'। ক্রমে সে 'উত্তম পশু' ['যে নিত্য নিত্য দুর্গাপূজা শিবপূজা বিষ্ণুপূজা অবশ্যই করিয়া থাকে তাহাকে উত্তম পশু কহে' / দ্র. বঙ্গীয় শব্দকোষ / হ. চ. বন্দো.]-তে পরিণত হয়, যে একই রুটিনে জীবন অতিবাহিত করতে থাকে। সে তখন জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত একটি রুটিন ও Job Chart ভক্তিসহকারে রূপায়ন করতে থাকে। যেন সাত হাজার বছর আগে মনু, কিংবা আড়াই হাজার বছর আগে বুদ্ধ, কি দু হাজার বছর আগে যীশু অথবা দেড় হাজার বছর আগে হযরত কিংবা কোন অত্যাধুনিক 'ফ্রেন্ড্ ফিলসফার ও গাইড্' এর নামে কর্তৃত্ব-তন্ত্র ঐ Chart ছকে দিয়ে রাখে। সেই ছকে মানুষ মাত্রকেই জীবন কাটাতে হবে। জন্মলগ্ন থেকেই সে ঐ ছকের নিকট দায়বদ্ধ। মানুষের জীবনটা তার নিজের নয়। ছিনতাই হওয়া ট্যাক্সির মত তার 'জীবন-যাত্রা' হিতাকাঙ্খী কর্তৃত্ব-তন্ত্রের ইচ্ছা অনুসারে চলে; বিনা ভাড়ায়। বর্তমান ভূতের [= অতীতের] বেগার খাটতে থাকে। তখনও নিজের জীবনটা মানুষ নিজেই কাটায় বটে, কিন্তু নিজের ইচ্ছানুসারে নয়, নিজের বুদ্ধিতেও নয়; তার জীবন রথে অধিষ্ঠিত কর্তৃত্ব-তন্ত্রের ইচ্ছানুসারে। সেই কর্তৃত্ব-তন্ত্র নির্দেশ দেয়— 'শক্তি চালিও না, বুদ্ধি চালিও না, কেবল ঘানি চালাও। ..... প্রবুদ্ধমিব সুপ্ত .....'। যে শুয়ে আছে সেই বুদ্ধিমান। (কলিম খান,

---

৩৩ [কলিম খানের নোট:] পশু শব্দের অর্থ জানার জন্য হরিচরণ বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ের বঙ্গীয় শব্দকোষ খুললে অবাক হতে হয়। কেননা তাতে পশু শব্দে animal বোঝানো হয় নি। বলা হয়েছে ' যে অবিশেষে দেখে' সে-ই পশু। এই ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি বর্তমানে বিস্মৃত। সে বিধি কী রূপ, সেকথা পরে। এখন প্রশ্ন 'অবিশেষে' দেখা কেমন দেখা। ইংরেজিতে VIDE শব্দটি গেছে আমাদের 'বিদ্' থেকে, যদর্থ বিদিত হওয়া। এই 'বিদ্' বেদ শব্দের ভিত্তি। VIDE থেকে VISION হয়। বেদ বিভাজন বা জ্ঞান বিভাজন করে দিলে মানুষ 'অবিশেষে' দেখে। এ-এক প্রকার অন্ধত্ব। তাই De-vision বা Visionless একই ব্যাপার। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়– 'ক্যামেরা অন্ধ হইয়া দেখে'। এইরূপ অবিশেষে দেখতে বাধ্য করা হয় শ্রম বিভাজন করে। অস্ত্র কারখানায় পশু বানানোর এই পদ্ধতিটি খুব স্পষ্ট দেখা যায়। যাতে গোটা অস্ত্রটি কেউ বানাতে না পারে, প্রত্যেককে কেবল নির্দিষ্ট অংশবিশেষ বানাতে কাজে লাগানো হয়।

১৯৯৫: ১৫-১৭)

এই যে কলিম খান বললেন, "নতুন কিছু করবার স্বাধীনতা ভুলের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে না। এইখানে কর্তৃত্বনীতি জোর পায়। ভুলের বিপত্তিকে সে গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করে।"— এই ব্যাপারটা এখানে আলাদা ব্যাখ্যা ও মনোযোগের দাবী রাখে।

ভালো করে খেয়াল না করলে হঠাৎ করে মনে হতে পারে যে স্বাধীনতার নীতিই সমাজের যতসব ভুলভালের জননী। এই ধরনের শক্ত প্রচারণা কর্তৃপক্ষ/কর্তৃত্ব-তন্ত্রের দিক থেকে হাজার হাজার বছর ধরে জলবায়ুর মতো প্রাকৃতিক সত্য হিসেবে চালু আছে জনমনে। এই প্রচারণার বলেই স্বাধীনতা-নীতিকে সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে যাবতীয় সত্যিকারের স্বাধীনতা-চর্চার পথ সে যথাসম্ভব রুদ্ধ করে রাখতে পারে।

কিন্তু এ আসলে প্রচারণাই বটে। সত্য আলাদা। সত্য হলো: স্বাধীনতা যাবতীয় সৃজনশীলতার ধাত্রী। স্বাধীনতা মানুষের রচিত কোনো আইন না। কর্তৃত্ব-তন্ত্রই বরং গুটিকয় মানুষের তৈরি মনুষ্যস্বভাববিরোধী আইনী প্রতিষ্ঠান। স্বাধীনতা হচ্ছে প্রকৃতির আইন। কোনো কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের জন্য সে অপেক্ষা করে না। বরঞ্চ যাবতীয় কর্তা-কর্তৃপক্ষ-কর্তৃত্ব-তন্ত্রকে যতটা অস্বীকার করতে পারে, মানুষ ঠিক ততটাই স্বাধীনতার চর্চা করতে পারে, ততটাই সে সৃজনশীল হয়ে উঠতে পারে, এবং অবশ্যই ভুল করতে করতে।

স্বাধীনতা কেউ কাউকে দেয় না। নিজেকেই স্ব-অধীনতার চর্চা করতে হয়। নিজের-নিজেদের স্বাধীনতাকে নিজেরই-নিজেদেরই সর্বক্ষণ রক্ষা করতে হয়। যতক্ষণ আপনি নিজের স্বাধীনতাকে ডিফেন্ড করতে পারবেন, ততক্ষণই আপনার স্ব-অধীনতা। নিজের স্বাধীনতাকে নিজে সুরক্ষিত রাখতে যে মুহূর্তে আপনি ব্যর্থ হবেন, ঠিক সেই মুহূর্তেই আপনি পরের অধীন। সুতরাং, অন্যভাবে বললে, ভুল করার সুযোগের নামই স্বাধীনতা এবং তা মহান। এই মহান কারণেই, 'মহামতি' ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মতো কর্তৃত্বপরায়ন মানুষের নামে পর্যন্ত এই প্রবাদবাক্য প্রচলিত হয়েছে যে "যে ভুল করে না, সে কিছুই করে না"।[৩৪]

[৩৪] লেনিনের নামে প্রচলিত, বিশেষত লেনিনবাদী মহলে বহুল প্রচলিত, এই প্রবাদপ্রতিম বাক্যটির কোনো হদিস আমি বের করতে পারি নি। নেট ঘেঁটে, বিশেষত 'মার্কসিস্ট ইন্টারনেট আর্কাইভ' এর মধ্যকার লেনিন-আর্কাইভ খোঁজ করে পাওয়া ৬৩১টা ওয়েবপেজের একটিতেও এই জাতীয় কোনো কথা পেলাম না। কারো জানা থাকলে সাহায্য করবেন প্লিজ, বিশেষ মার্কসবাদী-লেনিনবাদীরা। সত্যি যদি লেনিন এরকম কথা লিখে না-ও থাকেন তবু লেনিনবাদী মহলে এই কথাটির প্রবাদবাক্যে

নিজে ভুল করার এই সুযোগটুকু স্বীকার না করলে হাজার হাজার সোভিয়েতকে কেন্দ্র করে সংগঠিত জনসাধারণ কর্তৃক ১৯১৭ সালের শুরুতেই জারতন্ত্র উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর অক্টোবর মাসে এসে 'সকল ক্ষমতা সোভিয়েতের হাতে' স্লোগান দিয়ে বলশেভিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সুযোগ লেনিন কখনোই পেতেন না। কিন্তু, নিজের জন্য ভুল করার সুযোগ রাখলেও রুশ দেশের কৃষক-শ্রমিক-জনতাকে তিনি ভুল করার কোনো সুযোগই দিতে চান নি। তিনি চেয়েছিলেন, তিনি এবং অনুগত অনুসারীরা যেহেতু বেশি বিজ্ঞ ও অগ্রসর 'ভ্যানগার্ড', সুতরাং তাঁরাই জনসাধারণকে 'সঠিক পথে' পরিচালনা করার ক্ষমতা রাখেন।

এই বইয়ের অন্যত্র (ষষ্ঠ অধ্যায়ে, ৬.২ অংশে) বলেছি, এখানে আবার মনে করিয়ে দেওয়া দরকার, ঠিক এই প্রশ্নেই রোজা লুক্সেমবার্গ জনসাধারণকে ভুল করার উপরোক্ত লেনিনীয় সুযোগটুকু দিতে চাইছিলেন। নিখিল রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টির বিশাল ভাঙনের ভেতর দিয়ে ১৯০৩ সালে প্রণীত লেনিনের 'গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা'পরায়ন তথা চরম কর্তৃত্বপরায়ন পার্টি-নীতিকেই রোজা, ১৯০৪ সালের এক রচনায়, প্রকৃত জনসাধারণের দ্বারা সাধিতব্য সত্যিকারের সামাজিক বিপ্লবের পথে প্রধান বাধা মনে করেছিলেন। পরিস্থিতির বিচারে নিতান্ত ঠোঁটকাটা খনার মতোই তিনি বলতে বাধ্য হয়েছিলেন: "সবচেয়ে চালাক একটা কেন্দ্রীয় কমিটির *অভ্রান্ততার* তুলনায় সত্যিকারের একটা বৈপ্লবিক আন্দোলনের করা *ভুলভ্রান্তি* সীমাহীন রকমের অধিক কাজের" (রোজা লুক্সেমবার্গ, ১৯০৪; বাঁকা হরফ আমার।) 'ট্রায়াল অ্যান্ড এরর' বা ভুল করতে করতে শেখাই প্রকৃত শেখার প্রধানতম প্রাকৃতিক নিয়ম বৈকি।

অতএব এই কেবলই কলিম খানের যে উদ্ধৃতিটা বিশেষ মনোযোগ ও

পরিণত হওয়ার ভেতর দিয়ে ভুল করার গুরুত্ব সম্পর্কে সম্যক উপলব্ধি করা যায় বৈকি। একটি জায়গায় দেখলাম লেনিন লিখছেন, "ভুল অবশ্য ভুলই। এর সমালোচনা করা দরকার এবং এর সংশোধনের জন্য লড়াই করা দরকার।" (লেনিন, ১৯১৯)

প্রসঙ্গত, গান্ধীর কাছে অবশ্য স্বাধীনতা মানে ভুল করার স্বাধীনতাও বটে। "স্বাধীনতা বলতে আপনি কী বোঝেন?" এক সাক্ষাৎকারে অস্ট্রীয় ফটোসাংবাদিক অ্যালিস শ্যালেকের এই প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীর বক্তব্য একেবারে সোজাসাপ্টা, তাঁর ব্যক্তিত্বের মতোই: "আমি চাই ভুল করার স্বাধীনতা, এবং ভুল শুধরানোর স্বাধীনতা, এবং নিজের পূর্ণ উচ্চতায় নিজেকে বিকশিত করার স্বাধীনতা, এবং হোঁচট খাওয়ার স্বাধীনতাও। ভর করে হাঁটার জন্য ক্র্যাচ চাই না আমি।" (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯২৮: ৩০১)

ব্যাখ্যার দাবীসহকারে পুনরায় হাজির করেছি খানিক উপরে সে প্রসঙ্গে বলি: "নতুন কিছু করবার স্বাধীনতা" যাঁরা চর্চা করেন, কখনোই তাঁরা "ভুলের সম্ভাবনাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার" করেন না; কখনোই না। 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি'তেই তাঁরা ভুল করেন এবং স্বাভাবিক পথেই ভুলটাকে শুধরে নিয়ে বিশুদ্ধ করে তোলেন। কর্তৃত্ব-তন্ত্রওয়ালারাই বরঞ্চ নিজেদের "ভুলের সম্ভাবনা"কে সব সময় "সম্পূর্ণ অস্বীকার" করেন। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে, ভুল করার ব্যাপারটিকে কর্তৃত্ব-তন্ত্র প্রকৃতপক্ষে গুরুত্ব দিয়ে আসলে কখনোই বিবেচনা করেন না। ভুলের গুরুত্ব যিনি বোঝেন, ভুলের বিপত্তির সত্যিকারের গুরুত্বও বোঝেন তিনিই, এবং তিনিই বোঝেন স্বাধীনতার গুরুত্ব।

কাজেই, কর্তৃত্বতান্ত্রিকেরা আসলে যেটা করেন, "ভুলের বিপত্তিকে" তাঁরা বিশেষ "গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা" করার ভান করেন মাত্র। অধিকন্তু: কর্তৃত্ববিরোধী, স্বাধীনতাশীল মানুষের "ভুলের বিপত্তিকে"ই শুধু তাঁরা বিবেচনায় নেন। স্বাধীনতাজনিত ভুলের কারণে গোটা সমাজের ক্ষতি হওয়ার ভয়টা তাঁদের সুপরিকল্পিত, কৃত্রিমভাবে উৎপাদিত, এবং সালাদ-মশলা-সহযোগে পরিবেশিত ভয়। এই ভয় দেখিয়েই জনসাধারণকে শাসন করতে পারে কর্তৃত্ব-তন্ত্র।

ভুল কি কর্তা-কর্তৃত্ব-কর্তৃপক্ষ নিজেরা করেন না?! অহরহই করেন। এবং সেই ভুলের মাশুল দিতে হয় গোটা সমাজকে। যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী তো চিরকাল *প্রধানত* কর্তাতন্ত্র-শাসকতন্ত্রের ভুল নীতিরই সৃষ্টি। উপরন্তু, যেহেতু গোটা সমাজকে পরিচালনা করার দায়িত্ব কর্তৃত্ব-তন্ত্র একা নিজের হাতে তুলে নেয়, সেহেতু তাঁদের একটা সামান্য ভুলও গোটা সমাজকে বিচলিত করে।

'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি'তে যেহেতু কোনো একক কর্তৃত্ব-তন্ত্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগই থাকে না, সুতরাং কোনো এক ব্যক্তির বা একটি গোষ্ঠীর (স্বাধীনতাজনিত) কোনো ভুলের কারণে গোটা সমাজকে আদৌ ভুগতে হয় না। কেবল অল্প কিছু মানুষ, প্রধানত যাঁরা ঐ ভুল করেছেন তাঁরা এবং তাঁদের বন্ধু-বান্ধব-আত্মীয়-গোষ্ঠীর লোকেরা, ভোগেন বড় জোর। আর, ঐ ভোগান্তির অভিজ্ঞতা থেকে খুব সহজেই তাঁরা নিজেদের ভুলটিকে শুধরেও নিতে পারেন। শুধু তা-ই নয়, তাঁদের ভুলের এবং ভুল শুধরে নেওয়ার অভিজ্ঞতা থেকে অন্যরাও সেই ভুল আর না করার সুযোগটুকু অন্তত পান।

অন্য দিকে, যেমনটা কেবলই বলেছি, নিজেদের ভুল কর্তৃত্ব-তন্ত্র কোনোদিনই আন্তরিকভাবে স্বীকার করে না। তা করলে জনমনে তার গ্রহণযোগ্যতা ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা কর্তৃত্বওয়ালারাও যদি ভুলই করেন, তাহলে আর সকল ক্ষমতা-সম্পদ-পরিচালনার অধিকার শুধু তাঁদের হাতে থাকবে কোন যুক্তিতে, তাই না? সুতরাং, এতে করে খোদ কর্তৃত্ব-তন্ত্রের

অস্তিত্বেরই হুমকির মুখে পড়ার সুযোগ থেকে যায়। কেননা এই স্বাধীনতা খোদ কর্তৃত্ব-তন্ত্রকেই অবৈধ প্রতিপন্ন করে ফেলার সুযোগ তৈরি করে। এইখানেই তার আসল ভয়।

অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে খেয়াল করা দরকার এইখানে যে কর্তৃত্ব-তন্ত্র নিজেই কিন্তু পূর্ববিধান নয়। পূর্ববিধানকে আশ্রয় করে, আঁকড়ে ধরে, তার ঘাড়ে চিরকালের জন্য চেপে বসে, খোদ পূর্ববিধানকেই ধ্বংস করতে উদ্যত হয় কর্তৃত্ব-তন্ত্র— চিরন্তন বিধানে তাকে পর্যবসিত/অধঃপতিত করতে উদ্যত হয়। ব্যাপারটা মোটেও এরকম নয় যে পূর্ববিধান মানে কর্তৃত্ব-তন্ত্র, আর নববিধান মানে স্বাধীনতা। নববিধানের সুযোগ না থাকলে তো খোদ 'পূর্ববিধান' কথাটারই কোনো মানে থাকে না। এই কারণেই, স্বাধীনতা ও পূর্ববিধান কখনোই পরস্পরের বিরোধী নয়। বরং পূর্ববিধান ও নববিধানের যুগলবন্দীতেই গড়ে ওঠে 'স্বাধীনতার নীতি' তথা 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি'। প্রকৃত স্বাধীনতাচর্চাকারীরা সর্বদাই জানেন: "নিয়ম ভাঙতে গেলেও তাকে নিয়মেরই সাহায্য নিতে হয়। নিয়মহীনতায় তার জীবনে ছেদ পড়ে, প্রবাহ নিশ্চিত রূপে ব্যাহত হয়। এইরূপ ছেদ, বিপরীতে গড্ডলিকা-প্রবাহকে সমর্থন জানায়।" (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৪) সুতরাং, কর্তৃত্বপরায়ন মার্কসীয় লিবারাল বিশ্ববীক্ষার কারণেই বটে, কলিম খান যে ধরেই নেন, নৈরাজ্যবাদ মানে "আগের কোনো কিছুই মানব না, এই গোঁয়ার্তুমি", সে কথা ঠিক নয়। বরং উল্টো। নৈরাজ্য কখনোই নিয়মহীনতা নয়। প্রুধোঁ যেমনটা বলতেন, নৈরাজ্যই প্রাকৃতিক-স্বাভাবিক নিয়ম আর সরকার বা কর্তৃত্ব-তন্ত্র মানে গণ্ডগোল, সত্যিকারের নিয়মহীনতা। (কলিম খানের এই ভ্রান্ত নৈরাজ্যবোধ নিয়ে একটু পরেই বিস্তারিত কথা বলব আবার।)

. এ প্রসঙ্গে আরেকটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। এই যে কিছুক্ষণ আগে বললাম, "স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতিতে ... কোনো একক কর্তৃত্ব-তন্ত্রের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগই থাকে না"— কোন যুক্তি-প্রণালীতে এরকম সিদ্ধান্তে পৌছানো গেল? যুক্তি-প্রণালীটা এই রকম: অনড়তা তথা অচলায়তনই কর্তৃত্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠার শর্ত। মানুষেরা নিজেরা যখন নিজেকে পরিচালনা করতে ব্যর্থ হয়, কেবল তখনই কর্তৃত্ব-তন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে। সমাজ-প্রাণের নদী যখন উচ্ছল বেগে প্রবাহিত হয়, তখন সেখানে কোনো অনড়-অচল-চিরন্তন পূর্ববিধান দাঁড়াতে পারে না; স্রোতে ভেসে যায়। নতুন ঢেউ পুরনো ঢেউকে থামতে দেয় না। এরই নাম 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি'। সুতরাং, এই নীতিতে কোনো একক কর্তৃত্ব-তন্ত্রের হাতে অনড় ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়ার সুযোগ কোথায়? 'স্বাধীনতা-নীতি' বা 'শিবতার নীতি' নিজে কোনো অনড় প্রতিষ্ঠান নয়। এটি একটি নীতি, পদ্ধতি, পন্থা।

'স্বাধীনতা-নীতি' যদি নিজে কখনও নিজেকে 'স্বাধীনতা-তন্ত্র' নামের একটা অনড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করে, তাহলে সেখানে আর স্বাধীনতা থাকে না; সেটা তখন আসলে 'স্বাধীনতা'র নাম ভাঙিয়ে খাওয়া ছদ্মবেশী 'কর্তৃত্ব-তন্ত্র'। এই জন্যই নৈরাজ্যকে আমরা 'অরাজপন্থা' বলে ডাকতে অধিকতর সচ্ছন্দ বোধ করি। অন্য দিকে, কর্তৃত্ব-তন্ত্র তখনই কর্তৃত্ব-তন্ত্র, শুধুমাত্র যখন সে নিজেকে একটা অনড় প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে। অর্থাৎ, 'কর্তৃত্বনীতি' নিজেকে 'কর্তৃত্ব-তন্ত্র' নামের একটা 'চিরস্থায়ী' প্রতিষ্ঠানে পরিণত করার মাধ্যমেই কেবল টিকে থাকতে পারে, যদিও তা আসলে কোনোদিনই বিশুদ্ধ কোনো অচলায়তন হয়ে বিরাজ করতে পারে না— অন্তত, আর কিছু না হলেও, লেনিন নামক নতুন রাজা এসে জার নামক পুরনো রাজার গদিতে আসীন হয়। ফলে, অন্তত এভাবে হলেও, খাঁচার মেঝে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হতে থাকে; স্বাধীনতার সীমা বাড়তে থাকে— 'খাঁচা' নামক পূর্ববিধান যদিও তখনও টিকেই থাকে। এক ধাক্কায় কখনও "অনন্ত অসীম স্বাধীনতা" (কলিম খান, ১৯৯৫: ১৪) বলে কোনো জিনিস কোথাও গড়ে তোলার চিন্তা নৈরাজপন্থীরা কখনোই করে না। স্বাধীনতা মানেই পরিপ্রেক্ষিতগত স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই স্থান-কাল-পাত্র সাপেক্ষে স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই আপেক্ষিক স্বাধীনতা। স্বাধীনতা মানেই স্বাধীনতার আপেক্ষিক সীমাটাকে তিল তিল করে প্রসারিত করার স্বাধীনতা। তবে, যে জিনিসটা সত্যিই অনন্ত, অসীম, অদ্বিতীয়, চিরন্তন তা হলো জগৎজোড়া, সর্বভূতে, স্বাধীনতাশীলতার নীতি। এরই নাম 'স্বাভাবিক বিশুদ্ধির নীতি', তথা নৈরাজ্য।

যা-ই হোক, কলিম খানকে অনুসরণ করে এগিয়ে গেলে আমরা প্রাচীনতম ভারতবর্ষে আদি কর্তৃত্ব-তন্ত্র তথা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার, এবং তার রূপ-রূপান্তর-পরিবর্তনের, যে সার্বিক, বিস্তারিত, এ যাবত অনাবিষ্কৃত ইতিহাস পাই তা সামগ্রিকভাবে তুলে ধরার কাজ সম্পাদন করার জায়গা এই বই নয়। এখানে শুধু ইশারায় বলে রাখা গেল। ভবিষ্যতে সে কাজ, এবং আরো অজস্র ধারায় বঙ্গ-ভারতীয় ইতিহাসের স্বাধীনতা-অসমতা-বিদ্রোহ-প্রতিরোধগত পর্যালোচনা করার কর্তব্য, সম্পাদন করতে না পারলে আমরা একটা 'মুক্তিপরায়ন ইতিহাসবীক্ষা' দাঁড় করাতে পারব না।

৭.৬ রাজা, রাষ্ট্র ও নৈরাজ্য

কলিম খান অবশ্য, নিজের মার্কসীয়-লিবারাল বিশ্ববীক্ষার কারণেই সম্ভবত, 'নৈরাজ্য' শব্দটিকে গতানুগতিকভাবে 'বিশৃংখলা' এবং 'কট্টরতা' অর্থে বিভ্রান্তিপূর্ণভাবে নিন্দা করেছেন (প্রথম অধ্যায় > "মৌলবাদ: তত্ত্ব", প্রথম

অংশ > "অর্থাপত্তি", কলিম খান, ১৯৯৫: ১৪)। তাঁর মতো ভাষাতাত্ত্বিকের পক্ষে 'নৈরাজ্য', 'রাজ', 'বিরাজ', 'রাজ্য', 'রাজা', 'রাজন', 'সম্রাট', এমনকি 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি শব্দের বুৎপত্তি খেয়াল না করাটা দুর্ভাগ্যজনকই বলতে হবে।[৩৫]

কলিম খানের আলোচ্য গ্রন্থটি নিবিড়ভাবে অধ্যয়নের কারণেই আমি হরিচরণের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* কিনতে প্রাণিত হয়েছিলাম — এবং এই শব্দকোষের বুৎপত্তিসমূহের ওপরই কলিম খানের পুরো ভাষাতত্ত্বটি ছত্রে ছত্রে দাঁড়িয়ে আছে (বিশেষত দ্রষ্টব্য: কলিম খান, ২০০১: ৭৭)। এবারে খোদ কলিম খানের পদ্ধতি অনুসরণ করেই আমরা দেখতে পাব — সেই *বঙ্গীয় শব্দকোষ* অনুযায়ীই — 'নৈরাজ্য', 'রাজ', 'বিরাজ', 'রাজ্য', 'রাজা', 'রাজন', 'সম্রাট', 'রাষ্ট্র' প্রভৃতি শব্দের আদিতে আছে 'রাজ্' নামের ধাতুটি (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এই 'রাজ্'-এর অর্থ হচ্ছে, "শোভা, দীপ্তি" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এ থেকে উৎপত্তি লাভ করা 'রাজ' শব্দটির অর্থ, "শোভা পাওয়া, দীপ্তি পাওয়া"; "প্রকাশ পাওয়া, বিদ্যমান থাকা" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)। এইভাবে, 'বিরাজ' শব্দের অর্থ "শোভমান, শোভিত", "দীপ্যমান, দীপ্ত"; কিংবা "শোভা পাওয়া, শোভিত হওয়া"; "শোভা করিয়া অবস্থান করা", "বিদ্যমান থাকা, উপস্থিত থাকা" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৫৬৭)। আবার, 'সম্রাট' শব্দের একটা অর্থ 'রাজা' তো বটেই, এর বুৎপত্তিগত গোড়ায় আছে "সম্ + √ রাজ + কিপ", অর্থাৎ "যিনি মণ্ডলেশ্বর ও রাজগণের শাসক, তিনি সম্রাট" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ২১৫৮)। সুতরাং, বোঝাই যাচ্ছে: যিনি শোভা পান, যিনি দিপ্তী পান, যিনি প্রকাশ পান, যিনি বিদ্যমান থাকেন, তিনিই হন রাজা (—হরিচরণ)। এক কথায়, 'রাজা' মানে "যিনি দীপ্তি পান" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯০৭)।

তাহলে, 'রাজা' ছাড়া বাকি সব মানুষ কি শোভা পান না, দিপ্তী পান না, প্রকাশ পান না, বিদ্যমান থাকেন না? নিশ্চয়ই পান, নিশ্চয়ই থাকেন। কিন্তু 'রাজা' ছাড়া অন্যসব লোকের — আমজনতার — শোভা, দিপ্তী, প্রকাশ, বিদ্যমানতা প্রভৃতির 'আইনত' কোনো মূল্য নাই। বলা রীতিমতো বাহুল্য, আইন মানে এখানে (এবং এখনও পর্যন্ত সর্বত্রই) রাজার আইন, রাষ্ট্রের আইন। 'রাজা' ছাড়া অন্যসব ব্যক্তিও যদি শোভা পান, দিপ্তী পান, প্রকাশিত হন, বিদ্যমান থাকেন, তাহলে আর 'রাজা'র সাথে সবার পার্থক্য কী থাকে?

---

[৩৫] আমার বিশ্বাস, এ বিষয়ে সামনাসামনি বসে তাঁর সাথে কথা বললে তিনি তাঁর মত বদলাবেন বৈকি। কারণ নববিধানকে স্বীকার করার শক্তি যে তাঁর আছে, তার প্রমাণ তাঁর রচনার ছত্রে ছত্রেই আছে, যদিও মার্কসীয় লিবারাল বিশ্ববীক্ষার পূর্ববিধানের পিছুটানও তাঁর কিছুতেই পিছু ছাড়ে না যে, সেই ভয়ও আছে।

এই তো সেই কারণ, যে জন্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর "আমরা সবাই রাজা"র একটা সমতা-সহযোগিতা-স্বাধীনতাভিত্তিক সমাজের কল্পনা করতে পেরেছিলেন। সত্যিই তো, 'রাজা'ই যদি বলতে হয়, তাহলে তো আমরা সকলেই রাজা, কেননা আমাদের সকলেরই নিজ নিজ ধরনের শোভা, দিপ্তী, প্রকাশ এবং বিদ্যমানতা, বিরাজমানতা আছে; আর আমরা সবাই যদি রাজা না হই তাহলে অন্য এক বা একাধিক লোককেই বা মানুষ রাজা বলে মানবে কেন? সুতরাং, তখনই আসে নৈরাজ্যের প্রশ্ন। কেননা, যে রাজ্যে বা যে রাষ্ট্রে এক 'রাজা' ছাড়া আর কারো অস্তিত্বের, বিদ্যমানতার, বিরাজমানতার স্বীকৃতিই নাই, সেই রাজ্য দিয়ে কার লাভ? শুধু রাজাদের লাভ। (এ কথা কে না জানে, রাজতন্ত্রের সর্বনিম্নপদস্থ দারোয়ানটিও স্থানকালপাত্র-মতো নিজেই খোদ রাজা; আগা-পাছ-তলা এই রাজাদের সিস্টেম বা বন্দোবস্ত বা তন্ত্রের নামই তো দাঁড়িয়েছে রাজতন্ত্র।) এখানে গোলামির পদ ছাড়া আমাদের জন্য তো কোনো জায়গাই নাই। রাজাকে দেশ লিখে দাও, তারপর দেশের মালিক রাজাকে খাজনা দাও, আর রাজপেয়াদার লাঠির বাড়ি খাও— এই আমাদের কর্তব্য। তাহলে তো নৈরাজ্যই ভালো, রাজতন্ত্রের বদলে অ-রাজতন্ত্রই ভালো। এই তো আমাদের অ-রাজতন্ত্র > অ-রাজ > অরাজ অথবা স্বরাজ।

এইবার এতক্ষণে এখানে বলি, বর্তমান গ্রন্থের অন্যতম প্রধান বিবেচ্য 'রাষ্ট্র' শব্দের উৎপত্তিও ঐ একই জায়গা থেকে— 'রাজ্' (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। 'রাষ্ট্র' শব্দটির গোড়ায় আছে: "√ রাজ্ + ত্র (স্ট্রন্)", যার অর্থ "রাজ্য" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। বোঝা যায়, রাজত্ব বা বিরাজত্ব জিনিসটা তাহলে কারো (এ ক্ষেত্রে রাজার) বিদ্যমানতা বা বিরাজ করার গাঠনিক কাঠামো, তারই নাম 'রাষ্ট্র'।

রাষ্ট্রের আরও একটা অর্থ "প্রচার, প্রকাশ" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)। রাজার বিরাজত্ব যখন প্রচারিত হয়, প্রকাশিত হয়, এবং সবাই সে ব্যাপারে সম্মত হয় তখনই 'রাষ্ট্র' উৎপত্তি লাভ করে, গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যায়। এই গ্রামময় রাষ্ট্র হয়ে যাওয়ার সাথেই ঐ 'ত্র' কথাটার সম্পর্ক, ঐ যে ওপরের "√ রাজ্ + ত্র" এর মধ্যে যেমনটা আছে। একটু ভেঙে বললে: 'ত্র' অর্থ "তরণ-রহন (এখনি তরিত হয়ে অন্য কোথাও চলে যাব, এই ভাব)" (কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী, ২০০৯: ৪৮৮)। তার মানে হলো, একক একজন 'রাজা'র একক, অদ্বিতীয় ও প্রশ্নাতীত বিরাজত্ব যখন বাকি সবাইকে 'তরিত' হয়ে কোথাও 'রহন' করে বা রহে বা স্থিতি-কাঠামো লাভ করে, তখন তার নাম হয় রাষ্ট্র।

সুতরাং, দাঁড়াচ্ছে এই যে 'রাষ্ট্র' জিনিসটা নিতান্তই একক 'রাজা'র একক ও অদ্বিতীয় বিদ্যমানতার সংস্থা। এ জিনিস কখনোই জনগণের হতে পারে

না। অতএব "জনগণের রাষ্ট্র" বলে কিছু হয় না। এবারে স্মরণ করুন: "জনগণের রাষ্ট্র" প্রশ্নে প্রথম আন্তর্জাতিকের ভেতরে 'মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রী'দের সাথে 'কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্রী'দের সেই রাষ্ট্রতর্ক, যা এই বইয়ের 'দ্বিতীয় পাঠ' এর উপজীব্য বিষয় ছিল। তাহলে, রাষ্ট্র-রাজা-রাজ্যের প্রশ্নে 'কর্তৃত্বনীতি'ওয়ালাদের বিপরীতে 'শিবতার নীতি'র পৌরাণিক ভাষ্যের সাথে বাকুনিন-গিওম-হিন্সদের নৈরাজ্যের কোনো মৌল পার্থক্য থাকে কি আর? আবার, রাষ্ট্র যেহেতু রাজার, জনসাধারণের নয়; এবং রাজাই কেবল বিদ্যমান থাকেন, আর কারো বিদ্যমানতা রাজতন্ত্রে স্বীকৃত নয়; সেই হেতু রাষ্ট্র জনগণের বিপরীত একটা সত্তা; এবং এই জন্যই, রাষ্ট্র শব্দের আরো একটা অর্থ: "উপদ্রব, মকরাদি, দুর্ভিক্ষ" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৯১৮)।

কিন্তু, 'সভ্যতা' নামক গত পাঁচ হাজার বছরের রাজতন্ত্রে-শাসনতন্ত্রে 'রাজা'-'রাষ্ট্র'-শাসনের স্বাভাবিকতার ধ্যানধারণার এতই বাড়বাড়ন্ত হয়েছে যে এগুলো সব ডালভাত তো বটেই, আলো-পানি-হাওয়ার মতো প্রশ্নাতীত প্রাকৃতিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে যেন। সুতরাং, এ যুগের রাজতন্ত্রের মালিক-গোলাম-পেয়াদা আর নবরত্নসভার সরকারী বুদ্ধিজীবীরা এতক্ষণে নিশ্চয় বলেই ফেলেছেন: তো, জনাব, দেশটা চলবে কী করে, চালাবেটা কে? তো, প্রাজ্ঞ-বিজ্ঞ-অজ্ঞ রাজাদের, তাঁদের বাচ্চাকাচ্চাদের, বাচ্চা-রাজাদের, বা রাজসন্তানদের এইরকম শিশুসুলভ প্রশ্নেরও সযত্ন উত্তর রচনা করতে হবে বৈকি, এবং সে উত্তর হতে হবে শিশুমনের উপযোগী, কেননা সে তো নিজে চিন্তা করবে না, খুঁজবে না, ভাববে না, শুধু মুখস্ত কথা বলবে, 'উত্তম পশু'র মতো কুলগুরু পুরুৎঠাকুরের শেখানো 'গায়ত্রী মন্ত্র' জপে যাবে, আর এক প্রশ্ন হাজারোভাবে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পেঁচিয়ে যাবে— রাজতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হবে যে, নইলে দেশটা চলবে কীভাবে?

ঠিক আছে, ভাবুন, তাকিয়ে দেখুন: খোদ এই মহাবিশ্বপ্রকৃতিকে পরিচালনা করার জন্য কি কোনো রাজা লাগে? রাজতন্ত্র লাগে? থানা-পুলিশ-পাইক-পেয়াদা-উজির-নাজির-হাকিম-হুকুম-কারাগার-মন্ত্রী-মিনিস্টার লাগে? লাগে না। এগুলো লাগে শুধু বিশ্বপ্রকৃতির তথা পদার্থ-শক্তি-প্রাণের সর্বোচ্চ অভিপ্রকাশ মানুষের বেলায়। বাঘ-ভাল্লুক-শেয়াল-কুকুর-ইঁদুরের যা লাগে না, 'আশরাফুল মখলুকাত' মানুষের তা লাগে। আশ্চর্য ঘটনা বটে। 'বনের রাজা', 'মাছের রাজা' থেকে শুরু করে 'বাতির রাজা' (ফিলিপস) পর্যন্ত সব বানোয়াট বিশ্বাস যে নিছকই রাজার দিপ্তী বাড়ানোর বুদ্ধিবৃত্তিক ছলনা, সে কথা বোঝা কি এতই কষ্ট? হ্যাঁ, কষ্টই বটে— অভ্যেস নাই যে! আমরা তো সব অভ্যেসের দাস। আর, 'রাজা' একটি অভ্যেসের নামই বটে। আনুষ্ঠানিক 'রাজতন্ত্র' তো

এখন বিলুপ্ত-প্রায় পদার্থ। তার বদলে গণপতি গণেশের[৩৬] গণতন্ত্রের উত্থানের হাওয়া বইতে লেগেছে গত শ দুয়েক বছর ধরে (তা সে যে আকারে যে প্রকারেই বিরাজ করুক না কেন)। তথাপি, তথাকথিত নিরক্ষর-অশিক্ষিতদের জন্য মাতব্বর-চেয়ারম্যান তো লাগেই সর্বোচ্চ শিক্ষালয়ের জন্যেও একজন বাদশাহী ভাইস-চ্যান্সেলর লাগে।

৭.৭ কর্তৃত্ব-তন্ত্রের আদি উৎপত্তি: মহাভারতে 'রাজা' এবং 'বুদ্ধিজীবী'র ধারণা

এতসব দীক্ষায়ন-প্রশিক্ষণ সত্ত্বেও কিন্তু 'রাজা' এবং 'রাজতন্ত্র'র বৈধতা ও যুক্তিসিদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের মনের খটকা সম্পূর্ণ দূরীভূত হয় না; মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা খচখচানি থেকেই যায়। হ্যাঁ, এই খটকাটা একেবারে আদি থেকেই ছিল বৈকি। প্রমাণ দেওয়া যেতে পারে *মহাভারত* থেকে।

চাইলে কেউ চমকে উঠতেও পারেন, কেননা রাজতন্ত্র এতটাই স্বাভাবিক যে আমরা এত দিন কেউ তেমন খেয়ালও করি নি: ঠিক এই প্রশ্নটাই তুলেছিলেন যুধিষ্ঠির, *মহাভারত*-এর মহাযুদ্ধের পরে। যুদ্ধের পরে তাঁর সর্বগ্রহণযোগ্যতার কারণে এবং অন্য সকলের অগ্রহণযোগ্যতার কারণে সকলেই যুধিষ্ঠিরকে 'রাজা' হওয়ার জন্য অন্তহীন কাকুতিমিনতি করেই চলেছিলেন। কিন্তু, যুধিষ্ঠির ছিলেন অনড়। 'রাজা' হতে চান নি তিনি মোটেও। তিনি বলছিলেন তিনি ধর্ম-জগতের লোক, রাজা তিনি হতে পারবেন না।[৩৭] *মহাভারত*-এর "শান্তিপর্ব্বে" অর্জুনকে তিনি বলছিলেন:

> এক্ষণে আমরা শত্রু বিনাশ করিয়া ক্রোধশূন্য হইয়াছি বটে, কিন্তু দুর্নিবার শোক আমাকে একান্ত ব্যাকুল করিতেছে। ... অতএব এক্ষণে আমি তোমাদিগকে আমন্ত্রণপূর্ব্বক মুনি হইয়া বনে প্রস্থান করিব। স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে, লোকে ত্যাগশীল না হইলে কদাচ সমগ্র ধর্ম্মলাভে সমর্থ হয় না। **আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি।** ... অতএব আমি সমস্ত রাজ্যসম্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক শোকদুঃখবিবর্জ্জিত

---

[৩৬] গণপতি গণেশ সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: "ট্রাইবাল সমাজের অসমাপ্ত বিলোপ: গণপতি", দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ।

[৩৭] রাজা-রাষ্ট্র-শাস্ত্র বনাম আল্লাহ-ভগবান-ধর্ম বিষয়ে আমার স্বগঠিত ধারণার পক্ষে তাহলে অতি প্রাচীন একটা সমর্থন মিলল বটে। দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের ১.১ অংশে আমার বিডিআর বিদ্রোহের বইয়ের (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১০: ১০) উদ্ধৃতি এবং ঐ বইয়ে পেশ করা এ সংক্রান্ত আলোচনা। [নিউটনের নোট: আদি লেখকের নয়।]

হইয়া অরণ্যে গমন করিব। আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাশ নাই। অতঃপর তুমিই নির্ব্বিঘ্নে এই পৃথিবী শাসন কর। (মহাভারত, ২০০১: ৪৯৬)

"আমি রাজ্যলোলুপ হইয়াই পাপপঙ্কে লিপ্ত হইয়াছি। ... আমার রাজ্য বা উপভোগ্য দ্রব্যে কিছুমাত্র অভিলাশ নাই।"— যুধিষ্ঠিরের এই একান্ত উপলব্ধির উত্তরে নিতান্তই রুষ্ট অর্জুনের বক্তব্য ছিল খুবই আক্রমণাত্মক ও সুস্পষ্ট, এবং তাতে চিরন্তন ক্ষত্রিয়ধর্ম তথা কর্তৃত্বধর্মের মহাসারকথাই ফুটে ওঠে:

> যদি রাজধর্ম্মে দ্বেষ প্রকাশ করিয়া আলস্যে কালহরণ করিবেন, তবে কি নিমিত্ত ধৃতরাষ্ট্রপক্ষীয় বীরগণকে বিনাশ করিলেন? **ক্ষাত্রধর্ম্মাবলম্বী ব্যক্তিরা মিত্রের প্রতিও ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা প্রকাশ করেন না। ... ক্ষত্রিয়গণ হিংসার্থই জন্মগ্রহণ করেন। হিংসাই তাঁহাদের একমাত্র অবলম্বন**, সুতরাং সেই সহজ-হিংসাধর্ম্মের ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তার নিন্দা করা ক্ষত্রিয়ের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। (মহাভারত, ২০০১: ৪৯৮-৪৯৯)

ক্ষত্রিয়/শাসক/রাজনীতিবিদ এবং তাদের শাসনযন্ত্র তো আজকের দিনেও এমনকি বন্ধুর প্রতিও "ক্ষমা, অনুকম্পা, কারুণ্য বা অনৃশংসতা" প্রকাশ করে না, তা তো সমকালীন জাতীয় আন্তর্জাতিক রাজনীতির দিকে তাকালেই বোঝা জলজ্যান্ত বোঝা যায়। 'রাজনীতিতে চিরস্থায়ী শত্রুমিত্র বলে কিছু নাই' জাতীয় কথা তো আর এমনিতেই রটে নাই। আদি ক্ষত্রিয় অর্জুন থেকেই এইসব ধারণার উৎপত্তি। কিন্তু, যুধিষ্ঠির তাঁর কথায় অনড়। রাজা হওয়ার যুক্তিপ্রণালী কিছুতেই তাঁর গ্রাহ্য হয় না— হওয়ার কথা না বলেই। সুতরাং, শেষ পর্যন্ত রাজ-রাজত্বের যুক্তিসিদ্ধতা কীসের ওপরে দাঁড়াচ্ছে সেইটাই আমাদের দেখার বিষয়। তো, অর্জুনের যে নিজের ক্ষত্রিয়ধর্ম নিয়ে গর্ব, সেই গর্ব নিয়ে 'দেবত্ব' অর্জন করা যায় না,"দেবলোকে" যাওয়া যায় না, সে কথাই তুলে ধরেন যুধিষ্ঠির। অনেক অনেক কথার পর অর্জুনকে এক পর্যায়ে তিনি বলেন:

> যে ভূমিপতি এই অখিল ভূমণ্ডলমধ্যে একাধিপত্য বিস্তার করেন, তাঁহারও এক ভিন্ন দ্বিতীয় উদর নাই। তবে তুমি কি নিমিত্ত বিপুল রাজ্যভোগের প্রশংসা করিতেছ? ... অতএব তুমি অগ্রে উদরকে পরাজিত কর, তাহা হইলেই তোমার সমুদয় পৃথিবী পরাজয় করা হইবে। ... রাজ্যলাভ ও রাজ্যরক্ষা এই উভয়েই ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম আছে; অতএব উহা পরিত্যাগ করিয়া মহদ্ভার হইতে বিমুক্ত হও। ... **যাহাদের বর্ণ ও আশ্রমাদির অভিমান থাকে, তাহারা পিতৃলোক, আর যাহারা অভিমানশূন্য, তাহারা দেবলোকে গমন করিয়া থাকে।** (মহাভারত, ২০০১: ৫০৫)

কি সাংঘাতিক কথা। দেখা যাচ্ছে, বর্ণপ্রথার শ্রেয়ত্বের ধারণার ওপর দাঁড়িয়ে আছে যে রাজতন্ত্র, খোদ সেই "বর্ণ ও আশ্রমের অভিমান" যুধিষ্ঠির আর বহন করতে প্রস্তুত নন। আর এই অভিমান না থাকলে 'রাজত্ব' অর্জন করা যায় না যে, সেই সত্যের প্রতি এভাবে তিনি ভাবি কালের মানুষের মনোযোগ আকর্ষণ করে বসে থাকেন। 'রাজত্ব' অর্জনের চেয়ে 'দেবত্ব' অর্জনের দিকেই তাঁর ঝোঁক। ফলত শোক, আক্ষেপ, অনুতাপ ও পাপবোধ কিছুতেই প্রশমিত হয় না, বারংবার উথলে উঠতে থাকে। বেদব্যাসের কাছে তিনি অতঃপর এই ভয়াবহ সত্য উচ্চারণ করতে ছাড়েন না যে 'রাজা' এবং 'ধর্ম', 'রাজত্ব' ও 'ধর্মবোধ' আসলে পরস্পরের বিরোধী:

> **ধর্ম্মচর্য্যা ও রাজ্যরক্ষা এই উভয় পরস্পর বিরুদ্ধ**, অতএব এক ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মরক্ষা ও রাজ্যভার গ্রহণ করিতে পারে, নিরন্তর এই চিন্তা করিয়া আমি মোহে বারংবার অভিভূত হইতেছি। (মহাভারত, ২০০১: ৫২৬)

পরিশেষে, নকুল-সহদেব-দ্রৌপদী-ভীমের এবং ঋষি দেবস্থান ও মহর্ষি ব্যাসদেবের, এবং সর্বোপরি স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের বহু বহু প্রকার, উপর্যুপরি, অনুরোধ-উপরোধ-যুক্তি-তর্ক-দৃষ্টান্ত ও উত্তেজনা-উক্তি এবং বিশেষত মহর্ষি বৈশম্পায়ন বেদব্যাস কর্তৃক প্রায়শ্চিত্ত পাওয়ার উপায় বর্ণনার পর যুধিষ্ঠির অবশ্য রাজা হিসেবে অভিষিক্ত হন কিন্তু সংশয় শোক তাঁর পিছু ছাড়ে না কিছুতেই। তখন বহু কিছুর পর মহর্ষি বৈশম্পায়নের পরামর্শে সবাই মিলে তাঁকে নিয়ে যান "সর্বজ্ঞ ধর্ম্মবেত্তা", "কুরুকুলপিতামহ বৃদ্ধ ভীষ্মের নিকট" যুধিষ্ঠিরের "ধর্ম্মগত সংশয় নিরাকরণ" করার জন্য, সবিস্তারে রাজধর্ম সম্পর্কে জানার জন্য। সেখানে ভীষ্ম কর্তৃক নানা রকম রাজধর্মবন্দনা এবং রাজার কর্তব্য-অকর্তব্য প্রভৃতি সম্পর্কে শোনার পরও যুধিষ্ঠির সংশয়মুক্ত হন না; তিনি এবার সেই সর্বাপেক্ষা মোক্ষম, একেবারে গোড়ার, প্রশ্নটি উত্থাপন করেন:

> পিতামহ! 'রাজা' এই শব্দটি কিরূপে সমুৎপন্ন হইল? রাজার হস্ত, গ্রীবা, পৃষ্ঠ, মুখ, উদর, শুক্র, অস্থি, মজ্জা, মাংস, শোণিত, নিশ্বাস, উচ্ছ্বাস, প্রাণ, শরীর, বুদ্ধি, ইন্দ্রিয়, সুখ, দুঃখ, জন্ম ও মরণ যেরূপ, প্রজাগণেরও তদ্রূপ। তবে রাজা কিরূপে একাকী অসংখ্য বিশিষ্টবুদ্ধি মহাবলপরাক্রান্ত পুরুষের উপর আধিপত্য করিয়া সমুদয় পৃথিবী পালন করিতে সমর্থ হয়েন? সকল লোকে কি নিমিত্ত রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে ...? (মহাভারত, ২০০১: ৫৪৫)

এ প্রশ্ন তো সনাতন স্বাধীনতাপরায়নেরই বটে। 'রাজা'র এবং 'প্রজা'র মধ্যে কী এমন দৈহিক-প্রাকৃতিক পার্থক্য আছে যে একজন মাত্র ব্যক্তি কোটি কোটি মানুষের রাজা হয়ে বসে থাকেন? আর লোকে তাঁকে মানেই বা কী কারণে? একটুক্ষণ পরেই, নিচে আমরা দেখব, গুরুতর এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্মদেব কিছুই লুকান না, ফাঁস করে দেন রাজতন্ত্রের গোড়ার গুমোর। তার আগে, বিশেষত বাঙালির অতি আদরের নীহাররঞ্জন রায়ের সুবিখ্যাত ইতিহাস-গ্রন্থের আশ্রয় নেওয়া যাক (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ৩১৬)। এই মহাগ্রন্থেও[৩৮] আমাদের সমাজে রাজা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি এবং রাষ্ট্রের সাথে সমাজের সম্পর্কের মূলসূত্রগুলো অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপকভাবে আলোচিত হয়েছে। সেই দিকটা একটু দেখে নিয়ে আবার যুধিষ্ঠিরের সামনে কথনরত ভীষ্মের কাছে ফিরে যাব।

নীহারের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত: সমাজের আদিতে কোনো 'রাজা' ছিল না; যা ছিল তার নাম সমাজ। আদিতে তাহলে কী ছিল? তাঁর মতে আদিতে ছিল স্বরাজ — "গ্রামে স্বরাজ্য" — "গ্রামে গ্রামবাসীদের অনেকটা স্বরাজ্য তো ছিলই" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০১)। সেই স্বরাজের বৈশিষ্ট্য ছিল আলাপ-আলোচনা-সমঝোতা-সহযোগিতার নীতি (তথা শিবতার নীতি, তথা ক্রপোৎকিনের বা এম. এন. রায়ের নৈরাজ্য, তথা মানব-প্রজাতির বিবর্তনসূত্রে পাওয়া নীতিবোধ-শ্রেয়োবোধ-সংহতির নীতি): "[ভূমি নিয়ে বিবাদ ইত্যাদি] গ্রামবাসীরাই পরামর্শ করিয়া মিটাইয়া ফেলিত" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০০)। তারপর, "জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ... কৃষিবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে ...

[৩৮] গুরুত্বপূর্ণ বহু সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এটি সত্যি আমাদের মহাগ্রন্থগুলোর একটি। এর সীমাবদ্ধতাগুলো এখানে আলোচ্য বস্তু নয়। পরে কখনো পৃথক কোনো রচনায় তা নিয়ে, আরো নানা দিক নিয়ে, আমাদের বাংলাদেশের ইতিহাসের ভেতর থেকে চমকে ওঠার মতো বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ উপস্থাপনের মধ্য দিয়ে আমাদের নিজেদের জন্য একটি মুক্তিপরায়ন ইতিহাসগত পর্যালোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করা যাবে। আপাতত শুধু সেই ইতিহাস-বীক্ষণের খুঁটিগুলো ইশারা আকারে পুঁতে রেখে যাচ্ছি। এখন তাই শুধু বলে রাখাই যথেষ্ট হবে যে ইতিহাস-গ্রন্থে কী লেখা আছে, তার চেয়ে বড় কথা হচ্ছে কে কীভাবে ইতিহাস পাঠ করি। নীহাররঞ্জন রায়কে পাঠ করার ক্ষেত্রে কথাটা প্রযোজ্য বটে। এতদিন সকলেই আমরা *বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব* বইটাকে পবিত্র গ্রন্থের মতো পড়ে গেছিই শুধু, কিন্তু সেখানে পরিবেশিত অচিন্তানীয় রকমের গুরুত্বপূর্ণ সব তথ্য ও মন্তব্যের মুক্তিমুখিন পর্যালোচনা দাঁড় করানোর কথা ভাবি নি। ওটা থেকে গেছে মার্কসীয় কর্তৃত্ব-তন্ত্রের অর্থে শাসক শ্রেণীর অর্থনৈতিক ইতিহাস-ব্যাখ্যার ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে যাওয়া ধ্যানধারণার একটি নমুনা, যার নবতর বিকাশ আমরা ঘটাতে পারি নি।

রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের বিবর্তন" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০০) ঘটতে লাগল; এবং "রাজা ও রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে সমাজযন্ত্রের একটা ঘনিষ্ট যোগ প্রতিষ্ঠিত হইতে লাগিল" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০০)। ক্রমেই 'রাজা' জিনিসটা 'সমাজ'কে প্রতিস্থাপন করতে থাকল, রাষ্ট্র গ্রাস করতে থাকল সমাজকে— অবশ্যই গায়ের জোরে, ক্ষত্রশক্তির জোরে, 'কর্তৃত্বনীতির'র প্রয়োগ ঘটিয়ে। ফলে, "সমাজের রক্ষক ও পালক হইলেন রাজা" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০০); "শান্তিরক্ষার মূল দায়িত্ব [হইল] তাঁহার" ((নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০০); "সমস্ত বিবাদ-বিসংবাদের মূল মীমাংসক [হইলেন] তিনি (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০০-২০১); "সকলের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পাত্র তিনি" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০১); এবং সর্বোপরি, "সকল ক্ষমতা, দায়িত্ব ও অধিকারের মূল উৎস [হইলেন] তিনি" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০১)। এভাবে, "মৌর্য আমলেই ... একটা কেন্দ্রীকৃত কর্মচারীতন্ত্র শাসনব্যবস্থা গড়িয়া উঠে ক্ষমতাসম্পন্ন চক্রবর্তী সম্রাটদের চেষ্টায় ও প্রেরণায়, এবং সমাজযন্ত্রের সঙ্গে এই রাষ্ট্রযন্ত্রের অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ স্বীকৃত হয়" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০১)। নীহাররঞ্জনের তীব্র চোখ ঠিকই খেয়াল করে যে "সমাজযন্ত্রের মধ্যে রাষ্ট্রযন্ত্রের পক্ষবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে এই চেতনা জনসাধারণকে অধিকার করিতে আরম্ভ করে যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই সমাজব্যবস্থার ধারক ও নিয়ামক। (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০১) এভাবে ধীরে ধীরে,

> বিবর্তনের যে স্তরে স্বীকৃত হইল যে, রাজা এবং রাষ্ট্রই ভূমির উপর অধিকারের উৎস এবং তিনিই ভূমি সংক্রান্ত বাদ-বিসংবাদের শেষ মীমাংসক, তাহার পর হইতেই ক্রমশ ধীরে ধীরে এই চেতনা গড়িয়া উঠিতে আরম্ভ করিল যে, রাজা ও রাষ্ট্র শুধু ভূমিব্যবস্থার নিয়ামক নহেন, দেশের ভূসম্পত্তির মালিকও। (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০১)

কিন্তু কীভাবে এটা সম্ভব হলো? কীভাবে, কেমন করে, কেন জনসাধারণ বা 'প্রকৃতিপুঞ্জ' মেনে নিল যে গোটা দেশের মালিক একজন রাজা? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলেই আসে সশস্ত্র ক্ষত্রিয় বাহিনীর প্রশ্ন (সে কথা মাত্রই বলেছি), আর আসে শাস্ত্রের প্রশ্ন, কেননা শুধু অস্ত্রের জোরে শাসন কায়েম করা যায় না, সম্মতিও উৎপাদন করতে হয়; তার মানে, শাসন কায়েমের জন্য লাগে 'শস্ত্র' বা শাস্ত্রও।[৩৯] এইভাবে আসে রাষ্ট্রের সাথে অস্ত্রশস্ত্রের প্রশ্নটা।

---

[৩৯] অরাজপন্থার পথিকেরা চিরকালই এই ব্যাখ্যাই হাজির করেছেন কর্তৃত্বতন্ত্র উৎপত্তির ঘটনাকে বোঝার ক্ষেত্রে। উদাহরণস্বরূপ দ্রষ্টব্য: ক্রপোৎকিন, ১৮৮৬।

নীহাররঞ্জনের ঐতিহাসিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, "অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতারা" তথা রাজ-বুদ্ধিজীবীরাই এই সম্মতি উৎপাদনের দায়িত্বভার বহন করেন (আজও যেমনটা করছেন তাঁরা)। তাঁর নিজের ভাষায়, "যাহাই হউক, মৌর্যযুগের ও পরবর্তী কালের অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতারাও রাজা ও রাষ্ট্রই যে ভূসম্পত্তির মালিক তাহা প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইতে লাগিলেন" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০২)। আর, ঠিক এই প্রসঙ্গটাকে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন কলিম খান তাঁর *দিশা থেকে বিদিশায়* গ্রন্থের "ভাষায় ঔপনিবেশিকতা: প্রাচীন ভারতে ম্যানেজমেন্ট ও বাৎসায়নের কামসূত্র" নামের দুর্দান্ত প্রবন্ধে:

> শাস্ত্র শব্দের অর্থ 'শাসনসাধন', অর্থাৎ যার দ্বারা শাসন করবার কাজটি সাধন করা যায়, অর্থাৎ কিনা শাস্ত্র মানে শাসনের হাতিয়ার। ভারতীয় কোষকারগণ জানাচ্ছেন যে শব্দের এই প্রকার অর্থ কারো স্বকপোলকল্পিত নয়, শব্দটির ভিতরেই তা পাওয়া যায়। যে সকল বর্ণ নিয়ে শব্দটি গড়ে উঠেছে, তারাই ঐরূপ অর্থ ধারণ করে রেখেছে। শব্দের বুৎপত্তি থেকে সে কথা আমরা জানতে পারি। কোষকারগণ তাই শব্দের অর্থ প্রদান কালে প্রথমেই বুৎপত্তি উল্লেখ করে থাকেন। এক্ষেত্রে যেমন √ শাস্ + ত্র (স্ট্রন্) ণ। ... তাই শ্রদ্ধেয় শ্রীহরিচরণ বন্দোপাধ্যায় তাঁর 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' গ্রন্থে যথারীতি প্রথমে 'শাস্ত্র' শব্দের বুৎপত্তি দেখিয়ে, তারপর 'শাসনসাধন' অর্থটি সরবরাহ করেছেন। ...
>
> ...
>
> ... যার দ্বারাই শাসন ক্রিয়াটি সাধন করা যাবে তাকেই বলা হবে শাস্ত্র। অর্থাৎ কিনা শাস্ত্র কোনও নির্দিষ্ট বস্তু নয়, উক্ত ক্রিয়াটি যেই সাধন করে সেই শাস্ত্র। সেটি একটি বই না লাঠি তা বিচার্য নয়। ...
>
> ...
>
> ... আমাদের অস্ত্রের পাশাপাশি ছিল শস্ত্র ... আর 'অস্ত্রশস্ত্র' আমাদের এমন উত্তরাধিকার যে আমরা কথায় কথায় শব্দটি ব্যবহার করে থাকি। শস্ত্রবিদ্যা আমাদের অধ্যয়নেরও বিষয় এবং তা বহু প্রাচীন কাল থেকেই। আর সেই সকল শস্ত্রের আধার বলেই [এ সংক্রান্ত] গ্রন্থগুলিকে শাস্ত্র বলা হয়ে থাকে। (কলিম খান, ১৯৯৯: ৯৩-৯৪)

সুতরাং, নীহাররঞ্জন রায় এবং কলিম খানের বরাতে বোঝা যাচ্ছে, এইসব অর্থশাস্ত্র ও স্মৃতিশাস্ত্র রচয়িতারা (অর্থাৎ আদিতম বুদ্ধিজীবীরা) রাজার, এবং রাজকর্তৃত্বের সামাজিক ভিত্তি রচনা করেছেন শাস্ত্রপ্রচারের মাধ্যমে এবং শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এক্ষুণি আমরা আবার মহাভারত-ইতিহাসে ফিরে গিয়ে দেখব, *মহাভারত*-ও বলছে যে রাষ্ট্র ও বর্ণাশ্রমের সামাজিক প্রতিষ্ঠা ঘটান

এঁরাই। এঁরা তাহলে একাধারে রাজার কর্তৃত্বের বৈধতা দেন, এবং রাজতন্ত্রের অনুকূল সামাজিক প্রতিষ্ঠান, রীতিনীতি, ও আচার-অনুষ্ঠান গড়ে তোলেন। এভাবে এঁরাই গ্রামময় রাষ্ট্র গড়ে তোলেন। এঁরাই কেন্দ্রীয় রাজার আসল বৈধতা দেন। এঁরাই প্রজাদের মধ্যে সম্মতি উৎপাদন করেন। মানুষ মেনে নিতে শেখে যে দেশ, দেশের মানুষ, মাটি, জল, পাতাল ও অন্তরীক্ষের মালিক একমাত্র রাজা। কিন্তু, এত কিছু করেও মানুষ তার আদি গ্রাম-স্বরাজ সম্পূর্ণ ভুলে গেল না। "এক সময় সমাজই যে ভূমি ব্যবস্থার নিয়ামক ছিল, সে স্মৃতিও একেবারে বিলুপ্ত হইয়া গেল না; থাকিয়া থাকিয়া সে স্মৃতি স্মৃতিশাস্ত্রের পাতায়, টীকাকারের ব্যাখ্যায়, প্রচলিত ব্যবহারের মধ্যে উঁকিঝুঁকি মারিতে লাগিল।" (নীহাররঞ্জন রায়, ১৪০২: ২০২)।

বলা বাহুল্যই বটে— এইসব যৌথস্মৃতির নিশানা *মহাভারত*-ও বহন করছে বৈকি। *মহাভারত*-ও আমাদের ভূ-অঞ্চলের যৌথস্মৃতিরই অন্যতম স্মারকগ্রন্থ। তাই, একটু ভিন্ন আঙ্গিকে হলেও, এমনকি 'রাজা'র দিক থেকে হলেও, মহাজ্ঞানী ভীষ্মদেব সেই স্মৃতিকথা অত্যন্ত সুস্পষ্ট ভাষায় বয়ান করেন কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধ-পরবর্তী কলিযুগের আদি রাজা যুধিষ্ঠিরের কাছে। এই পৃথিবীর আদিতে যে অরাজ ছিল তার, এবং সেই অরাজকে বলপ্রয়োগ ও শাস্ত্রপ্রয়োগের মাধ্যমে উচ্ছেদ করে প্রতিষ্ঠিত নয়া রাজতন্ত্রের, আদি বৃত্তান্ত। তো, এভাবে ভীষ্মদেব যা জানান তার মানে দাঁড়ায় এই:

আদি সেই অরাজকে ভেঙে ফেলে দেবতারা যে আদি দেবতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেন তা ছিল মনুষ্যশ্রমনির্ভর। ভীষ্মবয়ানে পরিষ্কার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে যে, মানুষের প্রদত্ত 'হোমাদি' স্বরূপ অন্নেই দেবতাদের গ্রাসাচ্ছাদন হতো; এবং সেটাকেই দেবতারা বেদের নাম দিয়ে 'ধর্ম' বলে মেলা দিন চালিয়েছেন। কিন্তু মনুষ্যসমাজ এক পর্যায়ে যখন তা আর মানল না, তখন দেবকুলের মুখে এই মর্মে অন্নাভাবের হাহাকার শোনা গেল: নরলোকে আর বেদ নাই; নরলোকে আর ধর্ম নাই; সব বিনষ্ট হয়ে গেছে: "মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে"; শুধু তাই নয়, সেই অন্নাভাবের পরিণামে দেবতারা আর দেবত্বই বজায় রাখতে পারছেন না বলে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে আক্ষেপ করছেন: "অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম"।

তার মানে কি এই নয় যে 'দেবত্ব' বা বৈষম্য টিকিয়ে রাখার শর্তই হচ্ছে 'প্রিভিলেজ' বা বিশেষাধিকার-তন্ত্র, অর্থাৎ অন্যের (মানুষের) শ্রমে বসে বসে খাওয়া। বসে খাওয়ার 'বিশেষ অধিকার' না থাকলে দেবতাও আর দেবতা থাকেন না, তাঁর অন্নাভাব ঘটে, তিনি মনুষ্যদশাপ্রাপ্ত হন। দেখুন, কিছুই বলতে বাকি রাখছে না *মহাভারত*।

তো, ব্রহ্মা যেন নরলোক থেকে বেদ ও 'ধর্ম' ধ্বংস হতে না দেন; একটা কিছু উপায় যেন তিনি "**বুদ্ধি**" খাটিয়ে, "**স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে**" বের করেন— দেবতাগণের এই সম্মিলিত নালিশ এবং আহাজারির মুখে ব্রহ্মা তাঁদের আশ্বস্ত করেন: নো টেনশন, মনুষ্যজাতিকে বেদ ও 'ধর্ম' মানতে আবার বাধ্য করা হবে। কিন্তু কীভাবে? রাজা-প্রথার জোরে; রাজতন্ত্রের জোরে। কিন্তু রাজতন্ত্র চলবে কীসের জোরে? রাজতন্ত্র চলে কীসের জোরে? কেন— শাস্ত্রের জোরে! স্বয়ং ব্রহ্মা সে উপায় বের করেন "**বুদ্ধিবলে**"। আদিতম 'শাস্ত্র' রচনা করে বসেন 'প্রজাপতি' ব্রহ্মা— সৃষ্টি করেন তিনি 'প্রকৃষ্ট রূপে জাত' বিশেষ ধরনের মানুষকে যারা অতঃপর 'প্রজা' হিসেবে পরিচিত হবে।

আদিতম 'বুদ্ধিজীবী'র সন্ধান তাহলে *মহাভারত* থেকেও পাওয়া গেল— তিনি খোদ ব্রহ্মা। জানা গেল: তাঁর কাজ হচ্ছে শাসকদের অনুকূলে বৈষম্য ও বিশেষাধিকারতন্ত্র টিকিয়ে রাখা— প্রজাকে বুঝিয়ে-সুজিয়ে, এবং তাতে কাজ না হলে শাস্ত্রের জোর, শাস্তির জোর ও ভয়ের জোর খাটানোর 'প্রেসক্রিপশন' দিয়ে। এভাবে অবশেষে, বুদ্ধির জোরে এবং গায়ের জোরে দুর্দান্ত ও দুর্দমনীয় মানুষদেরকে শান্ত ও দমিত করার ব্যবস্থা হলো: তাঁদেরকে এই পৃথিবীতে রাজার রাজত্ব মানানো হলো, রাজবশীভূত করা হলো আদিতম শাস্ত্রের জোরে; এবং 'দণ্ড'ই হচ্ছে এই ভূ-ভারতের আদিতম শাস্ত্র। আর সেই শাস্ত্র চলে রাজা এবং রাজবুদ্ধিজীবীর[৪০] যুগলবন্দিতে। এবার তাহলে সেই চাঞ্চল্যকর ইতিহাসের সারবিবরণী শোনা যাক কুরুকুলপিতামহ সর্বজ্ঞ বৃদ্ধ ভীষ্মের মুখেই:

> ভীষ্ম কহিলেন, "ধর্ম্মরাজ! সত্যযুগে প্রথমে যেরূপে রাজত্বের সৃষ্টি হয়, তাহা অবহিত হইয়া শ্রবণ কর। **সর্ব্বপ্রথমে পৃথিবীতে রাজ্য, রাজা, দণ্ড বা দণ্ডার্হ ব্যক্তি কিছুই ছিল না**। মনুষ্যেরা একমাত্র ধর্ম্ম অবলম্বনপূর্ব্বক পরস্পরকে রক্ষা করিত। মানবগণ এইরূপে কিছু দিন কালযাপন করিয়া পরিশেষে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণ নিতান্ত কষ্টকর বোধ করিতে লাগিল। ঐ সময় মোহ তাহাদিগের মনোমন্দিরে প্রবিষ্ট হইল। মোহের আবির্ভাব-বশতঃ ক্রমশঃ জ্ঞান ও ধর্ম্মের লোপ হইতে লাগিল এবং মানবগণ ক্রমে ক্রমে লোভপরতন্ত্র, পরধনগ্রহণতৎপর, কামপরায়ন, বিষয়াসক্ত ও কার্য্যাকার্য্যবিবেকশূন্য হইয়া উঠিল। অগম্যাগমন, বাচ্যাবাচ্য, ভক্ষ্যাভক্ষ্য ও দোষাদোষের বিচার কিছুমাত্র রহিল না। নরলোক এইরূপে কুমার্গগামী

---

[৪০] স্মরণ করুন: বর্তমান রায়-নৈরাজ-গ্রন্থের একেবারে শুরুতে 'নবি' এবং রাজ-উচ্ছিষ্টভোজী 'বুদ্ধিজীবী'দের মধ্যকার মৌলিক বৈপরিত্য নিয়ে আলোকপাত করা নোম চমস্কির সেই বাইবেল-আলোচনা (দ্রষ্টব্য: বর্তমান বইয়ের শুরুতে ১.১ অংশ; পৃষ্ঠা ৪-৬)।

হইলে বেদ বিনষ্ট ও ধর্ম্ম এককালে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

"তখন দেবগণ নিতান্ত শঙ্কিতচিত্তে লোকপিতামহ ভগবান ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিয়া কৃতাঞ্জলিপুটে কহিলেন, 'ভগবন্! লোভমোহাদি প্রভৃতি নীচবৃত্তিসমুদয় নরলোকস্থ সনাতন বেদ গ্রাস করাতে আমরা ভীত হইয়াছি। বেদ ধ্বংস হওয়াতে ধর্ম্মও বিনষ্ট হইয়াছে। **অতঃপর আমরা মনুষ্যের ন্যায় অবস্থা প্রাপ্ত হইলাম**। মানবগণ হোমাদি কার্য্যদ্বারা উর্দ্ধবর্ষী বলিয়া বিখ্যাত ছিল এবং আমরা বারিবর্ষণাদিদ্বারা অধোবর্ষী বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলাম; কিন্তু **এক্ষণে মানবদিগের ক্রিয়াকলাপ উচ্ছিন্ন হওয়াতে আমাদিগের অন্নাভাব হইয়াছে**। অতএব যাহাতে আপনার প্রভাব সম্ভবত এই প্রাকৃতিক নিয়ম ধ্বংস না হয়, আপনি **স্বীয় বুদ্ধিপ্রভাবে** তাহার সদুপায় উদ্ভাবন করুন।'

"তখন ভগবন্ কমলযোনি সুরগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, 'হে দেবগণ! **তোমরা ভীত হইও না; আমি অচিরাৎ উহার উপায় চিন্তা করিতেছি**।' প্রজাপতি দেবগণকে এই কথা বলিয়া **বুদ্ধিবলে একখানি লক্ষ অধ্যায়যুক্ত নীতিশাস্ত্র রচনা করিলেন**। ...

"ভগবান্ পদ্মযোনি ঐ নীতিশাস্ত্র প্রণীত করিয়া ইন্দ্র প্রভৃতি দেবগণকে হৃষ্টমনে কহিলেন, 'সুরগণ! আমি ত্রিবর্গ সংস্থাপন ও লোকের উপকার-সাধনের নিমিত্ত বাক্যের সারস্বরূপ এই নীতিশাস্ত্র উদ্ভাবন করিয়াছি। ইহা পাঠ করিলে **নিগ্রহ ও অনুগ্রহ** দর্শনপূর্ব্বক লোকরক্ষা করিবার বুদ্ধি জন্মিবে। **এই শাস্ত্রদ্বারা জগতের যাবতীয় লোক দণ্ডপ্রভাবে পুরুষার্থফল-লাভে সমর্থ হইবে; অতএব ইহার নাম দণ্ডনীতি হইল**। ... (মহাভারত, ২০০১: ৫৪৫-৫৪৬)

এতটা সুস্পষ্ট কথা আর কী হতে পারে। পরিষ্কারভাবেই দেখা যাচ্ছে, ভূ-ভারতের আদিতম নীতিশাস্ত্রটি হলো 'দণ্ডনীতি'; এবং যুধিষ্ঠিরকে পিতামহ ভীষ্মদেব আরো বলেছিলেন, "দণ্ডপ্রভাবেই জনসমাজে নীতি ও ধর্ম্মের প্রচার হইয়াছে" (মহাভারত, ২০০১: ৫৪৫-৫৪৬)। তার মানে, 'দণ্ডনীতি'ই যে কর্তৃত্ব-তন্ত্রের আদিতম নীতিশাস্ত্র, শুধু তা-ই নয়, এ জিনিস জনসমাজে প্রচলিত নীতিবোধের জনক বটে। এবং এই নীতিবোধের প্রধান দুই অস্ত্রশস্ত্র হচ্ছে "নিগ্রহ ও অনুগ্রহ"। এ-ই হলো সেই 'নিমিত্ত', যে নিমিত্তে "সকল লোকে ... রাজার প্রসাদলাভের আকাঙ্ক্ষা করে"। নইলে যে মার খেতে হবে, নিগৃহীত হতে হবে। তার চেয়ে অনুগ্রহ-তাড়নাই বাস্তবোচিত। ঐ যে কলিম খান রবীন্দ্রনাথের দোহাই দিয়ে বলছিলেন, সে কথা ঠিকই: নিগ্রহ তো বটেই, উপরন্তু অনুগ্রহও মানুষকে ক্ষুদ্র করে ফেলে, "মানুষকে সকলের চেয়ে নত" করে ফেলে। তো, 'দণ্ডনীতি' জিনিসটি তাহলে 'কর্তৃত্বনীতি' ছাড়া আর কী?

এই দণ্ডনীতি কী বস্তু, সমাজ-সংসারে এর কাজ কী তাও সবিস্তারে বুঝিয়ে বলেছিলেন অর্জুন, যুধিষ্ঠিরকে, যুধিষ্ঠির যখন কিছুতেই রাজা হতে চাচ্ছিলেন না। নিচে এক ধাক্কায় দীর্ঘ উদ্ধৃতি না দিয়ে ভেঙে ভেঙে, নিজের মন্তব্য উপস্থাপন করতে করতে, এগোনো যাক:

> দণ্ড প্রজাদিগকে শাসন ও রক্ষণাবেক্ষণ করিয়া থাকে। **সকলে নিদ্রায় অভিভূত হইলেও দণ্ড একাকী জাগরিত থাকে**। পণ্ডিতেরা দণ্ডকে প্রধান ধর্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। দণ্ড ধর্ম, অর্থ ও কাম রক্ষা করে বলিয়া উহা ত্রিবর্গ নামে অভিহিত হইয়া থাকে। (মহাভারত, ২০০১: ৫০২)

এসব কথা আজকের সংসদীয় গণতন্ত্র ও আইনের শাসনের অত্যাধুনিক প্রবক্তাদের মুখে শোনাও যা, 'সভ্যতা'র ঊষালগ্নে — যখন আইনের বা দণ্ডের শাসন কেবল সুপ্রতিষ্ঠা লাভ করছে সেই সময়কার — অন্যতম মূল দণ্ড বা আইন প্রয়োগকারী সত্তা অর্জুনের মুখে শোনাও তা-ই। কেননা, আইনের শাসন তথা দণ্ডনীতি প্রতিষ্ঠার নামই 'সভ্যতা', এবং সত্যিকারের সভ্যতার নামে এই জিনিসই চলছে গত পাঁচ হাজার বছরের 'কর্তৃত্বতান্ত্রিক সভ্যতা' জুড়ে। এই দণ্ডনির্ভর সভ্যতায় দণ্ডই "প্রধান ধর্ম" বটে, তবে তা 'মনুষ্যধর্ম' নয় 'শাস্ত্রধর্ম', তার মানে 'রাজা'র ধর্ম, এবং সেই কারণেই, বিপরীত দিক থেকে, 'প্রজা'র ধর্মও বটে।[৪১] আইনের ধর্মই তো দণ্ড। শাসনের ধর্মই তো দণ্ড। এই আইনের শাসনকে কখনও সত্যিকারের মনুষ্যধর্মের নামে চালানো যায় না। একে চালাতে হয় শাস্ত্রধর্মের নামে; এবং পুনরাবৃত্তি করতেই হবে, আদিতম শাস্ত্রধর্মের নামই দণ্ডশাস্ত্র বা দণ্ডধর্ম বা কর্তৃত্বনীতি বা কর্তৃত্বধর্ম। এই জিনিসটিকেই কর্তৃত্বধর্ম মানুষের ধর্ম এবং প্রকৃতির ধর্ম বলে চালাতে চায়। তাই, যুধিষ্ঠিরকে অর্জুন বলছেন, ভয়ের রাজত্বই হচ্ছে দণ্ডনীতির প্রাণ:

> দণ্ডপ্রভাবে ধন ও ধান্য রক্ষিত হয়। ... অনেকানেক পাপপরায়ন পামরেরা রাজদণ্ডভয়ে, অনেকে যমদণ্ডভয়ে, অনেকে পরলোকভয়ে এবং অনেকে লোকভয়ে পাপানুষ্ঠান করিতে পারে না। অনেকে কেবল

---

[৪১] তুলনীয়: এই বইয়ের ১.১ অংশে কর্তৃত্ব, শাস্ত্র ও ধর্ম বিষয়ক আমার উদ্ধৃতিটি (পৃষ্ঠা ৪); অথবা আমার খোদ *বিদ্রোহের সপ্তস্বর* বইটির প্রথম সংস্করণ (সেলিম রেজা নিউটন, ২০১০) অথবা আশু-প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় সংস্করণের ১.৩ থেকে ১.৬ পর্যন্ত "কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা-সিস্টেমের নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত নিয়মকানুনের নামই রাজনীতি", "সমাজ-নিয়ন্ত্রণের দুই কৌশল: বলপ্রয়োগ এবং সম্মতি উৎপাদন"; "শাস্ত্র এবং ধর্ম: যথাক্রমে রাজনীতি ও সমাজের এলাকা", এবং "আইন ও রাজনীতি শুধু বলপ্রয়োগের জোরে চলতে পারে না" নামাঙ্কিত অংশগুলো।

> দণ্ডভয়েই পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে না। ফলতঃ সংসারে প্রায় সমুদয় কার্য্যই দণ্ডভয়ে নির্ব্বাহ হইতেছে। ... **ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক ইহারা দণ্ডের ভয়ে স্ব স্ব পথে অবস্থান করিতেছেন। ভীত না হইলে কেহই যজ্ঞানুষ্ঠান, দান ও নিয়ম প্রতিপালন করিতে ইচ্ছা করে** না। (মহাভারত, ২০০১: ৫০২)

এবং, 'প্রধান সেনাপতি' অর্জুনের বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। দণ্ডনীতি মানেই হচ্ছে দমন-নীতি এবং শাসন-ত্রাসনের নীতি: "দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে"। আর, কার জন্য কোন দণ্ড সমুচিত তার মোক্ষম বিধানও প্রস্তুত:

> দণ্ড সংসার রক্ষা না করিলে সমুদয়ই গাঢ় অন্ধকারে নিমগ্ন হইত। দণ্ড দুর্দান্তদিগকে দমন ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিদিগকে শাসন করিয়া থাকে। **দমন ও শাসন করে বলিয়াই উহা দণ্ড নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।** ব্রাহ্মণের তিরষ্কার, ক্ষত্রিয়ের বেতন প্রদান না করা, বৈশ্যের রাজসমীপে দ্রব্যজাত সমর্পণ এবং শূদ্রের সর্ব্বস্বাপহরণই সমুচিত দণ্ড। (মহাভারত, ২০০১: ৫০২)

কি সুনির্দিষ্ট, কি তীব্রসূচিমুখ এই দণ্ডনীতি— সেই প্রাচীন কাল থেকেই। আর, শাসনের প্রশ্নে সে কাউকেই ছাড়ে না। শাসনযন্ত্রের হাতে তথা, শাসকের হাতে, রাষ্ট্রযন্ত্রের ম্যানেজারদের হাতে ব্রাহ্মণ থেকে শূদ্র পর্যন্ত কারো কোনো নিস্তার নাই। পার্থক্য আছে বৈকি। ব্রাহ্মণের জন্য "তিরস্কার"ই যথেষ্ট; আর শূদ্রকে শায়েস্তা করার জন্য চাই তার "সর্বস্ব অপহরণ" করা। কিন্তু এই শ্রেণীবৈষম্যের বাইরেও এখানে আমরা অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা প্রশ্নের মুখে এসে দাঁড়াই, এবং সেই প্রশ্নে মার্কসবাদীদের সাথে নিরাজপন্থীদের মৌলিক মতপার্থক্যটির কথা স্মরণ না করে পারি না, এবং দেখি *মহাভারত* নিরাজপন্থার দাবীর সত্যতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে (যদিও ওকালতি করছে মার্কসবাদের পক্ষে, মানে কর্তৃত্বনীতির সপক্ষে)। সামান্য ভেঙে বলা যাক।

৭.৮ রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্কসবাদ এবং অরাজপন্থার দৃষ্টিভঙ্গীগত তুলনা: অন্তর্বর্তীকালীন রাষ্ট্রের প্রকৃতি ও আবশ্যিকতা প্রসঙ্গে

মুক্তিপরায়ন ইতিহাসবীক্ষা মানে শুধু অতীত ইতিহাসের পর্যালোচনা করা নয়; বিদ্যমান রাক্ষস-রাষ্ট্রকে মোকাবেলা করে ভবিষ্যতে একটি স্বাভাবিক-মানবিক সমাজ-রচনার রূপকল্পগত বিনির্মাণের দিকটিও তার অন্তর্গত। মার্কসবাদীরা

যখন বলপ্রয়োগের মাধ্যমে পুঁজিবাদী-পুঁজিপতিদের কাছ থেকে রাজনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে 'সামাজিক মালিকানা'র নামে উৎপাদনের সমস্ত ধন-সম্পত্তি-সহায়-সম্পদকে তথাকথিত 'জনগণের রাষ্ট্রের' রাষ্ট্রীয় মালিকানায় (তথা রাষ্ট্র-ম্যানেজারদের হাতে, তথা আমলাতন্ত্রের হাতে) নিয়ে নেওয়াকেই 'বিপ্লব' বলে ভাবেন, তখন তাঁরা যে যুক্তিপ্রণালী দ্বারা চালিত হন তাতে করে রাষ্ট্র এমন একটি সত্তা হিসেবে বিবেচিত হয় যার নিজের স্বকীয় কোনো বৈশিষ্ট্য নাই; অর্থাৎ, যে বা যারা রাষ্ট্র চালায় তার বা তাদের বৈশিষ্ট্যই রাষ্ট্রের বৈশিষ্ট্য। তা-ই যদি হয়, তাহলে রাষ্ট্র যখন পুঁজিপতিদের হাতে থাকে তখন তা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র, আর রাষ্ট্র যখন তথাকথিত মার্কসবাদী 'সমাজতন্ত্রী'দের হাতে থাকে তখন তা 'সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র'। সুতরাং, এই যুক্তিপ্রণালী মোতাবেক, মার্কসবাদীরা এই 'সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের' দমন-ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে সমাজ থেকে পুঁজিপতিদেরকে, আর পুঁজিপতিদের সৃষ্ট আর্থ-সামাজিক বৈষম্যকে, তথা শ্রেণীবিভক্ত সমাজ-বিন্যাসকে সবলে উচ্ছেদ করতে সক্ষম হবেন বলে ভাবেন। (দ্রষ্টব্য: ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস, ১৮৭২)

একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, মার্কসবাদীদের এই যুক্তিপ্রণালী মূলত অর্থনীতিবাদী (তথা অর্থনৈতিক নির্ধারণবাদ-প্রণোদিত) যুক্তিপ্রণালী। এই যুক্তিপ্রণালী অনুসারে, রাষ্ট্র হচ্ছে একটা শ্রেণী কর্তৃক আরেকটা শ্রেণীর ওপর নিপীড়ন চালানোর একটা নিরপেক্ষ মেশিন। কোন শ্রেণী ক্ষমতায় আছে তার ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের চরিত্র কী হবে। সুতরাং, সমাজ-পরিচালক পুঁজিপতিদের অর্থনৈতিক ক্ষমতা কেড়ে নিলে এবং তাঁদের (অর্থনৈতিক) শ্রেণীটিকে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করলেই রাষ্ট্রের আর্থ-রাজনৈতিক চরিত্র বদলে যায়। তখন তা আর পুঁজিবাদী রাষ্ট্র থাকে না; এবং সেই সাথে রাষ্ট্রের নিপীড়ক চরিত্রটিও আপনাআপনিই বদলে যায়। তা পরিণত হয় 'জনগণের রাষ্ট্রে' বা 'শ্রমিকশ্রেণীর রাষ্ট্রে'; সুতরাং তা জনগণের ওপর নিপীড়ন তো করেই না, বরং জনগণেরই (তথা শ্রমজীবী জনতার) স্বার্থ দেখে।

অন্য দিকে, অরাজপন্থা বা নৈরাজ্যের সাধকেরা রাষ্ট্রকে একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্যধারী সত্তা হিসেবে বিবেচনা করেন, যা তার পরিচালকদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক বা মতাদর্শগত চরিত্রের ওপর নির্ভর তো করেই না, উল্টোটাই বরঞ্চ ঘটে (হুডল্ফ হকার, ২০১১)। এই যুক্তিপ্রণালী মোতাবেক, রাষ্ট্রের উৎপত্তিই ঘটেছে কেন্দ্রীভূত ক্ষমতার দমননীতির ওপর তথা *মহাভারত*-কথিত দণ্ডনীতির ওপর ভিত্তি করে। এর অস্তিত্বই টিকে আছে, এই বইয়ের 'উৎসর্গলিপি'তে (বর্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠা v দ্রষ্টব্য) উৎকীর্ণ মহাত্মা গান্ধীর বিবরণী মোতাবেক, সহিংসতা ও ভয়ের ওপর: "সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র; ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু

আত্মাবিহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না— কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই তো সহিংসতার কাছে ঋণী" (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)। সুতরাং, রাষ্ট্রের 'সিংহাসনে' কোন 'মহৎ' ব্যক্তিবর্গ বসে আছেন, তাতে কিছু যায়-আসে না। রাষ্ট্রের চরিত্র যা থাকে তা-ই থেকে যায়, যদি না তার দণ্ডপ্রয়োগের (তথা বলপ্রয়োগের) সহিংস প্রতিষ্ঠানগুলোকে প্রথম ধাক্কাতেই পরিপূর্ণভাবে উচ্ছেদ না করা হয় ("নৈরাজ্যবাদ বিষয়ক টোকাসমূহ", নোম চমস্কি, ২০০৫: ১২১) । আমাদের ভারতবর্ষের সেই যে পুরাতন প্রবাদ আছে, "যে যায় লঙ্কায় সে-ই হয় রাবণ", সেটাই এই মুক্তিপরায়ন রাষ্ট্রতত্ত্বের সারকথা।

তো দেখুন, হিংসাই (হিংসা: হনন করিবার ইচ্ছা) যে রাষ্ট্রের তথা দণ্ডনীতির প্রধান ধর্ম, সে কথা যে শুধু মহাত্মা গান্ধীর মতো স্বাধীনতা-স্বাভাবিকতাপরায়ন চিন্তকেরাই বলছেন তা নয়, শাসক-'সভ্যতা'র ইতিহাসগ্রন্থ *মহাভারত*-ও সেই সাক্ষ্যই দিচ্ছে, অর্জুনের জবানিতে:

> আর দেখুন, অন্যের মর্ম্মচ্ছেদন, দুষ্কর কার্য্যসাধন এবং মৎস্যঘাতীর ন্যায় **লোকের প্রাণসংহার না করিলে বিপুল ঐশ্বর্য্য, কীর্ত্তি ও প্রজালাভ হয় না**। দেবরাজ বৃত্রাসুরকে সংহার করিয়াই ইন্দ্রত্ব লাভ করিয়াছিলেন।[৪২] দেখুন যেসকল দেবতা অসুরঘাতী, লোকে তাঁহাদিগকে ভক্তিসহকারে অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। রুদ্র, কার্ত্তিকেয়, ইন্দ্র, অগ্নি, বরুণ, যম, কাল, মৃত্যু, কুবের, সূর্য্য এবং বসু, মরুৎ, সাধ্য ও বিশ্বদেবগণ ইহারা সকলেই অসুরঘাতী; মনুষ্যেরা ইঁহাদিগের প্রবল প্রতাপ স্মরণপূর্ব্বক ইঁহাদিগকে নমস্কার করে। ব্রহ্মা বিধাতা প্রভৃতি সুরগণের নিকট সকলে প্রণত হয় না। শান্তিপরায়ন ইন্দ্রিয়নিগ্রহশীল উদাসীন দেবগণ কেবল কতকগুলি স্বর্ব্বকার্য্যানুষ্ঠানতৎপর লোক কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া থাকেন। আর দেখুন, এই জীবলোকে কেহ হিংসা না করিয়া জীবন ধারণ করিতে পারে না। বলবান জীবগণ দুর্ব্বল জন্তুদিগের হিংসা করিয়া প্রাণধারণ করিতেছে।[৪৩] নকুল মূষিককে, মার্জ্জার নকুলকে, কুকুর মার্জ্জারকে, চিত্রব্যাঘ্র্য কুকুরকে এবং মনুষ্য সেই চিত্রব্যাঘ্রকে ভক্ষণ করিয়া থাকে। বিধাতা স্বয়ং স্থাবরজঙ্গমাত্মক পদার্থসমূদয়কে জীবের জীবনধারণোপযোগী অন্ন স্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন, এই নিমিত্ত **বিজ্ঞেরা হিংসাসহকারে**

[৪২] এ সংক্রান্ত সুবিস্তারিত আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: শামসুজ্জোহা মানিক এবং শামসুল আলম চঞ্চল, ২০০৩।

[৪৩] লক্ষ্যণীয়: অর্জুনের মুখে আমরা হকার-ক্রপোৎকিনের আলোচনা করা সেই সামাজিক ডারউইনবাদের প্রাচীনতর প্রতিধ্বনি শুনতে পাই। (দ্রষ্টব্য: এই বইয়ের ৪.৫.২ এবং ৫.১.১ অংশ।)

জীবিকানির্ব্বাহ করিতে কিছুতেই সংকুচিত হয়েন না। (মহাভারত, ২০০১: ৫০২-৫০৩)

রাষ্ট্র-রাজতন্ত্র-ক্ষত্রিয়ের দিক থেকে ভয়াবহ রকমের প্রাণসংহারী হিংসার সমর্থনে অর্জুনের এই সহিংস যুক্তিমালা নিয়ে নতুন করে আর কিছু বলার নেই। এই সমস্ত কথা প্রসঙ্গে বরং যে প্রশ্নটা এখানে আরো বড় করে মনে না পড়ে পারে না তা হলো: সহিংস বলপ্রয়োগের জন্য অবশ্য-প্রয়োজনীয় দাঁত-নখ-পেশীশক্তির আমূল উচ্ছেদ ঘটালেও কি 'রাষ্ট্র' তার হিংসাধর্ম থেকে মুক্ত হতে পারবে না? অন্য ভাষায় বললে: 'রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান' হিসেবে এত কালের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থেকে সরে এসে সত্যিকারের গণশক্তির সামাজিক উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে নিজের আমূল রূপান্তর ঘটিয়ে একটি 'আর্থ-সামাজিক বন্দোবস্ত' হিসেবে গড়ে ওঠাটা কি রাষ্ট্রের পক্ষে একেবারেই অসম্ভব? অসম্ভবই যদি হয় তাহলে তো যেকোনো মৌলিক সামাজিক রূপান্তরের ক্ষেত্রেই পরিবর্তনকামী গণশক্তিকে প্রথম ধাক্কাতেই 'রাষ্ট্র'কে উচ্ছেদ করতে অবশ্য-অবশ্যই পারতে হবে। কিন্তু, একটু ভাবলেই বোঝা যাবে, আরো সুদীর্ঘ কালব্যাপী প্রচেষ্টার ভেতর দিয়ে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-ভূগোল-ইতিহাস নির্বিশেষে সমস্ত পৃথিবী জুড়ে একটা সর্বজনীন রাষ্ট্রহীন সামাজিক বন্দোবস্ত চালু না হওয়া পর্যন্ত আপনি চাইলেও শুধুমাত্র একটা ভূখণ্ডে বা দেশে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন না। এই প্রশ্নটাই চমস্কি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন ১৯৭০ সালে লিখিত তাঁর দুর্দান্ত রচনায় ("নৈরাজ্যবাদ বিষয়ক টোকাসমূহ", নোম চমস্কি, ২০০৫: ১২১)। চমস্কির সুবাদেই জানা গেল, তিনিই প্রথম মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রী নন, যিনি এই সমস্যাটির কথা তুলছেন। তাঁরই কাছে হদিস পাওয়া গেল যে:

> অরাজক শ্রমিকতন্ত্রী[৪৪] ফার্নান্দ পেলুতিয়ের জানতে প্রশ্ন তুলেছিলেন: [৪৫]"অল্পস্থায়ী যে রাষ্ট্রটার শরণাপন্ন আমাদেরকে হতে হবে আবশ্যিকভাবে

---

[৪৪] 'অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট' অর্থে। [নিউটনের নোট: আদি লেখকের নয়।]

[৪৫] পেলুতিয়েরের এই কথাটুকু চমস্কি নিয়েছিলেন জেমস জল এর *দ্য অ্যানার্কিস্টস* বই থেকে। সেই সাথে পেলুতিয়েরের আদি রচনার হদিসও জানিয়ে রেখেছিলেন; এটা ছিল ১৮৯৫ সালের একটি রচনা: "L'Anarchisme et les syndicats ouvriers", *Les Temps nouveaux*, 1895। একই সাথে, একটি টীকা দিয়ে চমস্কি এ-ও জানিয়ে রেখেছিলেন যে ফরাসি ভাষায় রচিত পেলুতিয়েরের পুরো লেখাটা পাওয়া যাবে ফ্রান্সের মুক্তিপরায়ন সমাজতন্ত্রী ড্যানিয়েল গুয়েরিন কর্তৃক সংকলিত ও সম্পাদিত এবং ১৯৯৮ সালে একে প্রেস কর্তৃক প্রকাশিত "নৈরাজ্যবাদ বিষয়ক একটি চমৎকার ঐতিহাসিক সংকলন" *Ni Dieu, Ni Maitre* (বাংলায়

এবং অপরিহার্যভাবে, সেটাকেও কি অবশ্য-অবশ্যই একটা যৌথতাপন্থী জেলখানাতে[৪৬] পরিণত হয়েই টিকে থাকতে হবে? এটা কি মুক্তিপরায়ন একটা সংগঠন হিসেবে গড়ে উঠতে পারে না, যে সংগঠনটা সর্ব প্রকার রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানকে মিটিয়ে দেওয়ার মধ্য দিয়ে নিজেকে শুধু উৎপাদন ও উপভোগ বিষয়ক চাহিদাগুলোর ভেতরেই পুরোপুরিভাবে পরিসীমিত করে রাখবে?" ("নৈরাজ্যবাদ বিষয়ক টোকাসমূহ", নোম চমস্কি, ২০০৫: ১২১)

তো, এই পরিপ্রেক্ষিতে চমস্কির কথা হলো:

এই প্রশ্নের উত্তর জানার ভান আমি করি না। কিন্তু মনে হয় এটা স্পষ্টই যে কোনো-না-কোনোভাবে এর একটা ইতিবাচক উত্তর যদি না থাকে, তাহলে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক একটা বিপ্লবের পক্ষে বাম ধারার মানবিকতাধর্মী আদর্শগুলো অর্জন করার খুব বেশি সুযোগ থাকবে না। এই সমস্যাটাকেই মার্টিন বুবার একদম চোখাভাবে তুলে ধরেছিলেন, যখন তিনি লিখেছিলেন: "ছোট যে গাছটাকে একেবারে মুড়িয়ে দিয়ে লাঠিতে পরিণত করা হয়েছে, সেই গাছ থেকে আবার পত্রপল্লব বিকশিত হয়ে উঠবে প্রকৃতির কাছ থেকে এমনটা কেউ প্রত্যাশা করতে পারেন না।"[৪৭]

বললে: *কোনো ঈশ্বর নয়, কোনো প্রভু নয়*) এর ভেতরে। তো, জেমস জলের ইংরেজি অনুবাদটুকু না নিয়ে সেই 'একে প্রেস'ই পরে বইটার যে ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করে (ড্যানিয়েল গুয়েরিন, ২০০৫: ৪০৯-৪১৫), সেখান থেকে আমি এই উদ্ধৃতিটার ইংরেজি অনুবাদটুকু নিয়ে সেইটারই বঙ্গানুবাদ এখানে পেশ করেছি। [নিউটনের নোট: আদি লেখকের নয়।]

[৪৬] সংশ্লিষ্ট সম্পাদকীয় টীকায় ড্যানিয়েল গুয়েরিন (২০০৫: ৬৯০) জানিয়ে রেখেছেন যে "যৌথতাপন্থী জেলখানা" বলতে পেলুতিয়ের বুঝিয়েছিলেন "রাষ্ট্রতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র"কে (ড্যানিয়েল গুয়েরিন, ২০০৫: ৬৯০)। এই ব্যাখ্যাটুকু গুয়েরিন হাজির করেছেন পল দেলেসালে'র (Paul Delesalle) *Emile Pouget's Life as an Activist* নামের একটি বইয়ের দোহাই দিয়ে। [নিউটনের নোট: আদি লেখকের নয়।]

[৪৭] নোম চমস্কির টীকায় এই উদ্ধৃতির হদিস হিসেবে মার্টিন বুবারের *ইউটোপিয়ার পথ* (*Paths in Utopia*) বইটার ১২৭ পৃষ্ঠার কথা বলা আছে।

৭.৯ মুক্তিপরায়ন রবীন্দ্রনাথ

এই বইয়ের শুরুতেই, "কৈফিয়ৎ ও কৃতজ্ঞতা" অংশে আমি বলেছিলাম, "রায়ের মতো আরো অজস্র উদাহরণ-ইশারা খোদ বঙ্গ-ভারতেই আছে" (পৃষ্ঠা xvii)। এরকমই একটি উদাহরণ হচ্ছেন খোদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তাঁর সাহিত্যের, বিশেষত নাটক ও প্রবন্ধ-সাহিত্যের, প্রায় সর্বত্র এই সাধনার ছাপ স্বতঃস্পষ্ট। ইতোমধ্যে কলিম খানের পুরাণ-কথনে ঠাকুরের যেসব খণ্ড উদ্ধৃতি দেখেছি তাতে করে ঠাকুরের মুক্তিপরায়ন চিন্তাধারার ইঙ্গিত ফুটে ওঠে। এখানে আমি আরো কিছু ইশারাই পেশ করব মাত্র।

রবীন্দ্রনাথের *সমাজ* গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশে "আদিম সম্বল" রচনাটিতে (http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/16123) দেখছি তিনি বলছেন মানবপ্রকৃতি সম্পর্কিত কতকগুলো আদি বিশ্বাসের কথা—রায়ের মতোই, চমস্কি-হকার-ক্রপোৎকিন প্রমুখ নৈরাজ্যবাদীদের মতোই, এবং হোমবল্ট প্রমুখ ধ্রুপদী আলোকায়ন-চিন্তকের মতোই যে:

> ... বিশ্বাসের বল থাকা চাই। বিশ্বাস বলিতে কতকগুলা অমূলক বিশ্বাস কিংবা গোঁড়ামির কথা বলি না। কিন্তু কতকগুলি ধ্রুব সত্য আছে, যাহা ... জীবনের মূলধন, যাহা চিরদিনের ... সম্পত্তি ...।[৪৮]
>
> যেমন একটা আছে স্বাধীনতার প্রতি বিশ্বাস; অর্থাৎ আর-একজন কেহ ঘাড় ধরিয়া আমার কোনো স্থায়ী উপকার করিতে পারে এ কথা কিছুতে মনে লয় না, আমার চোখে ঠুলি দিয়া আর-একজন যে আমাকে মহত্ত্বের পথে লইয়া যাইতে পারে এ কথা স্বভাবতই অসংগত এবং অসহ্য মনে হয়; কারণ, যাহাতে মনুষ্যত্বের অপমান হয় তাহা কখনোই উন্নতির পথ হইতে পারে না। আমার যেখানে স্বাভাবিক অধিকার সেখানে আর-একজনের কর্তৃত্ব যে সহ্য করিতে পারে সে আদিম মনুষ্যত্ব হারাইয়াছে।

এটুকু বলেই ক্ষান্ত হচ্ছেন না তিনি। 'মানবের ধর্ম' যে আত্মকর্তৃত্ব ও স্বাধীনতা সে কথা তিনি ঐ একই রচনায় বলছেন:

> যুক্তির চক্ষু উৎপাটন করিয়া, জীবনধর্মের গতিমুখে বাঁধ বাঁধিয়া দিয়া, মানুষের স্বাধীনতাসর্বস্ব সম্পূর্ণ বাজেয়াপ্ত করিয়া একটি সমাজকে কলের মতো বানাইয়া তাহা হইতে নির্বিরোধে নিয়মিত কাজ আদায় করিতে পার, কিন্তু মনুষ্যত্বের দফা নিকাশ।

---

[৪৮] এই কিছুক্ষণ আগে নোম চমস্কি যে "স্বাভাবিক বিশ্বাস"-এর কথা বলছিলেন তার সাথে রবীন্দ্রনাথের এই 'ধ্রুব সত্য' বিশ্বাসের কথা অনায়াসে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে।

> কাজের চেয়ে মানুষ শ্রেষ্ঠ। কলে কাজ হয় কিন্তু কলে মানুষ হয় না। এইরূপ স্বাভাবিক বিশ্বাস লইয়া যে... কাজ করিতে আরম্ভ করে সে-ই কাজ করিতে পারে। সে অনেক ভুল করিবে কিন্তু তাহার মানুষ হইবার আশা আছে।
>
> ...
>
> সেখানে চিন্তা যুক্তি আত্মকর্তৃত্ব এবং সেইসঙ্গে ভ্রম বিরোধ সংশয় প্রভৃতি মানবের ধর্ম লোপ পাইয়া যাইবে, কেবল কলের ধর্ম, কাজ করা, তাহাই চলিতে থাকিবে।
>
> কিন্তু নির্ভুল কল এবং ভ্রান্ত মানুষের মধ্যে যদি পছন্দ করিয়া লইতে হয় তবে মানুষকেই বাছিতে হয়। ভ্রম হইতে অনেক সময় সত্যের জন্ম হয়, কিন্তু কল হইতে কিছুতেই মানুষ বাহির হয় না।
>
> মনুষ্যের সকল প্রকার স্বাধীনতা অপহরণ করিয়া আমাদের সমাজের যে কী আশ্চর্য শৃঙ্খলা দাঁড়াইয়াছে এই কথা লইয়া যাঁহারা গৌরব করেন, তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের প্রতি অশ্রদ্ধা প্রকাশ করেন।
>
> স্বাধীনতা সম্বন্ধে যেমন, সত্য সম্বন্ধেও তেমনই। অল্প বয়সে অমিশ্র সত্যের প্রতি যেরূপ উজ্জ্বল শ্রদ্ধা থাকে কিঞ্চিৎ বয়স হইলে অনেকের তাহা ম্লান হইয়া যায়। যাঁহারা বলেন, সত্য সকলের উপযোগী নয় এবং অনেক সময় অসুবিধাজনক এবং তাহা অধিকারীভেদে ন্যূনাধিক মিথ্যার সহিত মিশাইয়া বাঁটোয়ারা করিয়া দেওয়া আবশ্যক, তাঁহারা খুব পাকা কথা বলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু এত পাকা কথা কোনো মানুষের মুখে শোভা পায় না।

ঐ *সমাজ* গ্রন্থের 'পরিশিষ্ট' অংশেই তিনি "কর্মের উমেদার" রচনায় (http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/16119) দুঃখ করে বলছেন:

> আমরা কলের কাজ করিবার জন্য একেবারে কলে তৈয়ারি হইয়াছি । মনু পরাশর ভৃগু নারদ সকলে মিলিয়া আমাদের আত্মকর্তৃত্ব চূর্ণ করিয়া দিয়াছেন; পশুর মতো নিজের স্বাভাবিক চক্ষুতে ঠুলি পরিয়া পরের রাশ মানিয়া কী করিয়া চলিতে হয় বহুকাল হইতে তাহা তাঁহারা শিখাইয়াছেন, এখন আমাদিগকে যন্ত্রে জুতিয়া দিলেই হইল । শরীর কাহিল বটে, যন্ত্রের তাড়নায় প্রাণান্ত হইতে পারে, কিন্তু কখনো বিদ্রোহী হইব না। কখনো এমন স্বপ্নেও মনে করিব না যে, স্বাধীন চেষ্টার দ্বারা আমাদের এ অবস্থার কোনো প্রতিকার হইতে পারে।

তাঁর *কর্তার ইচ্ছায় কর্ম* গ্রন্থে (http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/14771; http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/14772) রবীন্দ্রনাথ সুনির্দিষ্টভাবে বলছেন ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আত্মকর্তৃত্বের প্রয়োজনীয়তার কথা অত্যন্ত তীব্র ভাষায়,

আমাদের সমাজে, আমাদের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের ধারণায়, দুর্বলতা যথেষ্ট আছে সে-কথা ঢাকিতে চাহিলেও ঢাকা পড়িবে না। তবু আমরা আত্মকর্তৃত্ব চাই। অন্ধকার ঘরে এককোণের বাতিটা মিটমিট করিয়া জ্বলিতেছে বলিয়া যে আর-এক কোণের বাতি জ্বালাইবার দাবি নাই এ কাজের কথা নয়।

ঐ কর্তার ইচ্ছায় কর্ম গ্রন্থটিতেই (http://www.rabindra-rachanabali .nltr.org/node/14771; http://www.rabindra-rachanabali.nltr. org/node/147 72) রবীন্দ্রনাথ আরো ভেঙে বলছেন, "কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার"। এখানে তিনি পার্লামেন্টারি গণতন্ত্রের গলদ নিয়েও কথা তুলেছেন এম. এন. রায়ের মতোই। শুধু তা-ই নয়, "রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের অন্যায় প্রকাশ"ও তাঁর চোখ এড়ায় নি। সেই সাথে তিনি এখানে বুঝিয়ে বলেছেন আত্মকর্তৃত্বের গুরুত্ব:

> মানুষের পক্ষে সকলের চেয়ে বড়ো কথাটাই এই যে, কর্তৃত্বের অধিকারই মনুষ্যত্বের অধিকার। নানা মন্ত্রে, নানা শ্লোকে, নানা বিধিবিধানে এই কথাটা যে-দেশে চাপা পড়িল, বিচারে পাছে এতটুকু ভুল হয় এই জন্য যে-দেশে মানুষ আচারে আপনাকে আষ্টেপিষ্টে বাঁধে, চলিতে গেলে পাছে দূরে গিয়া পড়ে এইজন্য নিজের পথ নিজেই ভাঙিয়া দেয়, সেই দেশে ধর্মের দোহাই দিয়া মানুষকে নিজের 'পরে অপরিসীম অশ্রদ্ধা করিতে শেখানো হয় এবং সেই দেশে দাস তৈরি করিবার জন্য সকলের চেয়ে বড়ো কারখানা খোলা হইয়াছে।
>
> আমাদের রাজপুরুষেরাও শাস্ত্রীয় গাম্ভীর্যের সঙ্গে এই কথাই বলিয়া থাকেন, 'তোমরা ভুল করিবে, তোমরা পারিবে না, অতএব তোমাদের হাতে কর্তৃত্ব দেওয়া চলিবে না।'
>
> আর যাই হোক মনু-পরাশরের এই আওয়াজটা ইংরেজি গলায় ভারি বেসুর বাজে, তাই আমরা তাঁদের যে-উত্তরটা দিই সেটা তাঁদেরই সহজ সুরের কথা। আমরা বলি, ভুল করাটা তেমন সর্বনাশ নয় স্বাধীনকর্তৃত্ব না পাওয়াটা যেমন। ভুল করিবার স্বাধীনতা থাকিলে তবেই সত্যকে পাইবার স্বাধীনতা থাকে। নিখুঁত নির্ভুল হইবার আশায় যদি নিরঙ্কুশ নির্জীব হইতে হয় তবে তার চেয়ে না হয় ভুলই করিলাম।
>
> আমাদের বলিবার আরো কথা আছে। কর্তৃপক্ষদের এ কথাও স্মরণ করাইতে পারি যে, আজ তোমরা আত্মকর্তৃত্বের মোটর গাড়ি চালাইতেছ কিন্তু একদিন রাত-থাকিতে যখন গোরুর গাড়িতে যাত্রা শুরু হইয়াছিল তখন খালখন্দর মধ্য দিয়া চাকা দুটোর আর্তনাদ ঠিক জয়ধ্বনির মতো শোনাইত না। পার্লামেন্ট বরাবরই ডাইনে বাঁয়ে প্রবল ঝাঁকানি খাইয়া

এক নজির হইতে আর এক নজিরের লাইন কাটিতে কাটিতে আসিয়াছে, গোড়াগুড়িই স্টীমরোলার-টানা পাকা রাস্তা পায় নাই। কত ঘুষঘাষ, ঘুষাঘুষি, দলাদলি, অবিচার এবং অব্যবস্থার মধ্য দিয়া সে হেলিয়া হেলিয়া চলিয়াছে। কখনো রাজা, কখনো গির্জা, কখনো জমিদার, কখনো বা মদওয়ালাও স্বার্থ বহিয়াছে। এমন এক সময় ছিল সদস্যেরা যখন জরিমানা ও শাসনের ভয়েই পার্লামেন্টে হাজির হইত। ... আমেরিকার রাষ্ট্রতন্ত্রে কুবের দেবতার চরগুলি যে-সকল কুকীর্তি করে সেগুলো সামান্য নয়। ড্রেফুসের নির্যাতন উপলক্ষ্যে ফ্রান্সের রাষ্ট্রতন্ত্রে সৈনিক-প্রাধান্যের যে অন্যায় প্রকাশ পাইয়াছিল তাহাতে রিপুর অন্ধশক্তিরই তো হাত দেখা যায়। এসকল সত্ত্বেও আজকের দিনে এ-কথায় কারও মনে সন্দেহ লেশমাত্র নাই যে, আত্মকর্তৃত্বের চির-সচলতার বেগেই মানুষ ভুলের মধ্য দিয়াই ভুলকে কাটায়, অন্যায়ের গর্তে ঘাড়মোড় ভাঙিয়া পড়িয়াও ঠেলাঠেলি করিয়া উপরে ওঠে। এইজন্য মানুষকে পিছমোড়া বাঁধিয়া তার মুখে পায়সান্ন তুলিয়া দেওয়ার চেয়ে তাকে স্বাধীনভাবে অন্ন উপার্জনের চেষ্টায় উপবাসী হইতে দেওয়াও ভালো।

ভারতবর্ষ গ্রন্থের "মন্দির" নামের রচনায় (http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/8368) গৌতম বুদ্ধের দোহাই দিয়ে ঠাকুর মানুষের স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তার কথা আবারও বলছেন। এ কথা এখানে এইজন্য টুকে রাখছি যেন বোঝা যায় কেন আমি সংঘকেও নৈরাজ্যের একটি স্বাভাবিক অভিপ্রকাশ হিসেবে বিবেচনা করি। এখানে তিনি গৌতম বুদ্ধের "আত্মশক্তি" প্রচারের দিক এবং মানুষে-মানুষে অসমতা দূরীভূত করার দিকটিতেই নজর দিচ্ছেন:

ভারতবর্ষে বুদ্ধদেব মানবকে বড়ো করিয়াছিলেন। তিনি জাতি মানেন নাই, যাগযজ্ঞের অবলম্বন হইতে মানুষকে মুক্তি দিয়াছিলেন, দেবতাকে মানুষের লক্ষ্য হইতে অপসৃত করিয়াছিলেন। তিনি মানুষের আত্মশক্তি প্রচার করিয়াছিলেন। দয়া এবং কল্যাণ তিনি স্বর্গ হইতে প্রার্থনা করেন নাই, মানুষের অন্তর হইতেই তাহা তিনি আহ্বান করিয়াছিলেন।

মনে পড়ে, রাশিয়ায় সামান্য কয় দিন ঘুরে এসেই তিনি এক দিকে রুশ বিপ্লবের শক্তির দিক সম্পর্কে, এবং অন্য দিকে বলশেভিক রাষ্ট্রপ্রণালীর বিপদের দিক সম্পর্কে, দুর্দান্ত স্পষ্ট উপলব্ধি অর্জন করতে এবং নির্ভয়ে-নিঃসঙ্কোচে তা প্রকাশ করতে পেরেছিলেন:

এর মধ্যে যে গলদ কিছুই নেই তা বলি নে; **গুরুতর গলদ** আছে। সেজন্যে একদিন এদের বিপদ ঘটবে। সংক্ষেপে সে গলদ হচ্ছে,

> **শিক্ষাবিধি দিয়ে এরা ছাঁচ বানিয়েছে—কিন্তু ছাঁচে-ঢালা মনুষ্যত্ব কখনো টেঁকে না—সজীব মনের তত্ত্বের সঙ্গে বিদ্যার তত্ত্ব যদি না মেলে তা হলে হয় একদিন ছাঁচ হবে ফেটে চুরমার, নয় মানুষের মন যাবে মরে আড়ষ্ট হয়ে, কিম্বা কলের পুতুল হয়ে দাঁড়াবে।** (রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৪০২ বঙ্গাব্দ: ৫৫৬)

আগেই দেখিয়েছি, রাশিয়ার এই পরিস্থিতি সম্পর্কে এম. এন. রায়ের, রোজা লুক্সেমবার্গের মতো বৈপ্লবিক মার্কসবাদীদের এবং নৈরাজপন্থীদের পর্যবেক্ষণের ঘনিষ্টতা কতটা। এখন দেখা যাচ্ছে রাবীন্দ্রনাথের পর্যবেক্ষণও তাঁদের কাতারে দিব্যি সামিল হয়ে যায়। মনুষ্য সমাজের জন্য ফ্যাসিবাদের ও বলশেভিজমের মারাত্মক বিপদ সম্পর্কে রীতিমতো সতদ্রেষ্টার মতো 'বেদবাক্য' রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। রাশিয়ার চিঠি তো তার নমুনা বটেই কিন্তু সেটাই একমাত্র নয়, বা শেষ নয়। জার্মানি-প্রবাসী দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়কে ৩১শে জুলাই ১৯৩১ তারিখে কলকাতা থেকে লেখা চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখছেন, "ফাসিজ্‌ম এবং বল্‌শেভিজ্‌ম ... দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ", দুটোই তাঁর কাছে "মানুষখেগোর দল", দুটোই তাঁর কাছে "দানোয়-পাওয়া" মানুষজনের দল:

> জর্মানিতে ব্যাভেরিয়ার ভাবগতিক ভাল লাগছে না। যেখানে দারিদ্রে মানুষ দুর্বল সেইখানেই যেমন মারী মড়ক জোর পায় তেমনি আজকালকার য়ুরোপে দুর্ভিক্ষ যতই ছড়িয়ে পড়ছে ততই **ফাসিজ্‌ম এবং** বল্‌শেভিজ্‌ম জোর পেয়ে উঠছে। **দুটোই অস্বাস্থ্যের লক্ষণ।** **মানুষের স্বাধীনবুদ্ধিকে জোর করে মেরে তার উপকার করা যায় এ-সব কথা সুস্থচিত্ত লোকে মনে ভাবতেই পারে না।** পেটের জ্বালা বাড়লে তখনি যত দুর্বুদ্ধি মানুষকে পেয়ে বসে। বল্‌শেভিজ্‌ম ভারতে ছড়াবে বলে আশঙ্কা হয় — কেননা অন্নকষ্ট অত্যন্ত বেড়ে উঠেছে — মরণদশা যখন ঘনিয়ে আসে তখন এরা যমের দূত হয়ে দেখা দেয়। মানুষের পক্ষে মানুষ যে কি ভয়ংকর তা দেখলে শরীর শিউরে ওঠে — মারের প্রতিযোগিতায় কে কাকে ছাড়িয়ে যাবে সেই চেষ্টায় আজ সমস্ত পৃথিবী কোমর বেঁধেছে — মানুষের হাত থেকে বাঁচবার জন্যেই মানুষ কেবলই ভয়ংকর হয়ে উঠছে — এর আর শেষ নেই — খুনোখুনির ঘূর্ণিপাক চলল।
>
> **আর যাই করিস এই-সব মানুষখেগো দলের সঙ্গে খবরদার মিশিস** নে। য়ুরোপ আজ নিজের মহত্ত্বকে সব দিকেই প্রতিবাদ করতে বসেছে। আমাদের দেশের লোক — বিশেষ বাঙালি — আর কিছু না পারুক, নকল করতে পারে — তাদের অনেকে আজ য়ুরোপের ব্যামোর নকল করতে লেগেছে। এই নকল মড়কের ছোঁয়াচ থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে

> চলিস। নিশ্চয় তোদের ওখানে এই-সমস্ত **দানোয়-পাওয়া** ভারতবাসী অনেক আছে, তাদের কাছে ভিড়িস নে, আপন মনে কাজ করে যাস। (সেলিনা জেসমিন, ২০০৯: ২৫৮; মোটা হরফ আমার।)

মুক্তিপরায়ন রবীন্দ্রনাথকে আমরা আবিষ্কার করি এমনকি তাঁর *সঙ্গীতচিন্তা* গ্রন্থে। এতে "সঙ্গীতের মুক্তি" নামের রচনায় পাণ্ডিত্যপরায়ন গান-ব্যাকরণের কুস্তিগিরি থেকে গানের মুক্তি প্রসঙ্গে অসাধারণ এক পর্যালোচনায় তিনি মনুষ্য-স্বাধীনতাকে মনুষ্য-সৃজনশীলতার সাথে মিলিয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন তার সামান্য একটি টুকরা থেকেও দেখতে পাওয়া যায় ঠাকুরের স্বাধীনতাশীলতার আগুন, এবং সেই আগুন সৃজনশীলতার সাথে এমনকি শাসনতন্ত্রের সম্পর্ককেও বিবেচনার মধ্যে নেয়:

> **আত্মপ্রকাশের ... সৃষ্টিই স্বাধীনতা**। ঈশ্বরের রচিত এই সংসার অসম্পূর্ণ বলিয়া একদল লোক নালিশ করে। কিন্তু যদি অসম্পূর্ণ না হইত তবে **আমাদের অধীনতা চিরন্তন হইত**। তা হইলে যা-কিছু আছে তাহাই আমাদের উপর প্রভুত্ব করিত, আমরা তার উপর একটুও হাত চালাইতে পারিতাম না। অস্তিত্বটা গলার শিকল পায়ের বেড়ি হইত। **শাসনতন্ত্র যতই উৎকৃষ্ট হোক, তার মধ্যে শাসিতের আত্মপ্রকাশের কোনো ফাঁকই যদি কোথাও না থাকে, তবে তাহা সোনার দড়িতে চিরউদ্‌বন্ধন**। (রবীন্দ্র-রচনাসমগ্র > প্রবন্ধ > সংগীতচিন্তা > সংগীতের মুক্তি: http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/9176; গুরুত্বচিহ্ন আমার।)

শাসনতন্ত্রের ফাঁসের দিকে নজর দেওয়ার পাশাপাশি আইন-আদালত-সরকার এবং জনসাধারণের মধ্যকার কর্তৃত্বপরায়ন সম্পর্ক নিয়ে কথা তোলেন তিনি। রাষ্ট্র যে নিতান্তই জনবিরোধী একটি প্রতিষ্ঠান, রাষ্ট্র যে নিতান্তই রাষ্ট্র-ম্যানেজারদের বিশেষাধিকার সংরক্ষণের একটি প্রতিষ্ঠান, এবং রাষ্ট্রের সামনে মানুষ যে নিতান্তই অসহায় এইসব নৈরাজ্যপ্রবণ পর্যবেক্ষণে ভরপুর *রবীন্দ্ররচনাবলী*। এখানে শুধু উস্কানি দিয়ে যাওয়াই আপাতত আমার কাজ:

> ... **পুলিসের একজন চৌকিদারও একজন মানুষমাত্র নয়, সে একটা প্রকাণ্ড শক্তি**। একটি পুলিসের পেয়াদাকে বাঁচাইবার জন্য মকদ্দমায় গবর্মেন্টের হাজার হাজার টাকা খরচ হয়। অর্থাৎ **আদালত-মহাসমুদ্র পার হইবার বেলায় পেয়াদার জন্য সরকারি স্টীমার, আর গরিব ফরিয়াদিকে তুফানে সাঁতার দিয়া পার হইতে হইবে, একখানা কলার ভেলাও নাই**। (রবীন্দ্র-রচনাসমগ্র > প্রবন্ধ > কর্তার ইচ্ছায় কর্ম: http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/14760। গুরুত্ব আমার।)

রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে এখন থামব। তার আগে তার একটি মহাবাক্য উদ্ধার করতে চাই। এই বাক্যে আশ্চর্য হই জার্মানীর গুস্তাভ ল্যান্ডারের সাথে ঠাকুরের চিন্তার সাযুজ্য দেখে। বিশেষ স্বতন্ত্র একটি রোমান্টিক ঘরানার এবং একাধারে আধ্যাত্মিক ঘরানার নৈরাজ্যচিন্তক এবং ফ্যাসিবাদের হাতে শহীদ লড়াকু ল্যান্ডারের ছিল নিজস্ব অরাজ-চিন্তাধারা। রাষ্ট্রকে তিনি আসমানি কোনো পদার্থ বলে ভাবতেন না। রাষ্ট্রকে তিনি ব্যক্তি-মানুষের বা সমাজের বহিঃস্থ একটি জিনিস মনে করতেন না। তিনি বলতেন, রাষ্ট্র তো কোনো দালান নয়, একে তাই গুঁড়িয়ে দেওয়া যায় না। তিনি বলতেন, আমরাই রাষ্ট্র: আমরা নাগরিকেরাই রাষ্ট্র। রাষ্ট্র আমাদের মধ্যকার বিশেষ এক ধরনের সম্পর্ক। এই সম্পর্কটাকে বদলানো না গেলে রাষ্ট্রকে ধ্বংস করা যাবে না।

গুস্তাভের একটু উদ্ধৃতি দিতে চাই। এই উদ্ধৃতির খোঁজ এবং খোদ গুস্তাভ ল্যান্ডারের নাম আমি বলতে গেলে প্রথম বারের মতো পাই উইকিলিকসের সম্পাদক জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জের কাছ থেকে। নিচের উদ্ধৃতিটা অ্যাসাঞ্জেরও প্রিয় উদ্ধৃতি। অ্যাসাঞ্জ তাঁর "মজার মজার প্রশ্ন" ("ইন্টারেস্টিং কোয়েশ্চেন") নামের ব্লগের (http://web.archive.org/web/20071020051936/http://iq.org/) একদম মাথায় নিজের ফটোর ঠিক নিচেই এই উদ্ধৃতিটা দিয়ে তারপর নিজের লেখা শুরু করেছেন। এখানে উদ্ধৃতিটা আমি অ্যাসাঞ্জের ব্লগ থেকে দিচ্ছি না, গুস্তাভের বই থেকে তুলে ধরছি:

> একটা টেবিল উল্টে ফেলা যায় এবং একটি জানালা ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা যায়। কিন্তু যাঁরা মনে করেন যে রাষ্ট্রও এমন একটা পদার্থ বা প্রতিমা যাকে উল্টে ফেলা যায় বা ভেঙে গুঁড়ো করে ফেলা যায়, তাঁরা আসলে সোফিস্ট এবং শব্দ-উপাসক মাত্র। রাষ্ট্র আসলে একটা সামাজিক সম্পর্ক। রাষ্ট্র হচ্ছে মানুষে-মানুষে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ একটা উপায়। একে ধ্বংস করা যেতে পারে নতুন সামাজিক সম্পর্করাশি সৃজন করার মধ্য দিয়ে, অর্থাৎ একে অপরের সাথে ভিন্ন উপায়ে সম্পর্ক-স্থাপন-করা মানুষজনের মধ্য দিয়ে।
>
> চূড়ান্ত রাজতন্ত্র বলেছিল: আমিই রাষ্ট্র। আর, আমরা যাঁরা নিজেদেরকে চূড়ান্ত রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কারারুদ্ধ করেছি, সেই আমাদেরকে অবশ্যই এই সত্য উপলব্ধি করতে হবে: **আমরাই রাষ্ট্র**! আমরা রাষ্ট্র হিসেবেই থেকে যাব, যতক্ষণ না আমরা আলাদা কিছু হতে পারছি: যতক্ষণ না আমরা এমন ধরনের কোনো প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করতে পারি যা মানুষের জন্য একটি সত্যিকারের সম্প্রদায় ও একটি সত্যিকারের সমাজ গড়ে তুলবে। ("দুর্বল রাষ্ট্রনায়ক, দুর্বলতর জনগণ!" গুস্তাভ ল্যান্ডার, ১৯১০: ২১৪; মোটা হরফ আমার।)

অবশ্যই ভিন্নতর পরিপ্রেক্ষিতে, রবীন্দ্রনাথের মুখে আমরা গুস্তাভেরই প্রতিধ্বনি শুনি: "**আসল সত্য, আমাকে লইয়াই গবর্মেন্ট। এই সত্য সমস্ত রাজপুরুষের চেয়ে বড়ো।**", আর, আমাদের মনে পড়ে যায়, গুস্তাভের অচেনা ছিলেন না রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর* এবং রক্তকরবী নাটকের অনুবাদ গুস্তাভ করেছিলেন জার্মান ভাষায় (অনুবাদের হদিসের জন্য দ্রষ্টব্য: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৮; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১৯১৯।

তাহলে দেখতে পাচ্ছি, নৈরাজ্যের নিত্যতার যে ধারণা আমি এখানে তুলে ধরতে চেয়েছি, আমাদের সূর্যের সমান রবীন্দ্রনাথও সেই ধারণারই অন্যতম উজ্জ্বল প্রকাশ। রাষ্ট্রশক্তির বিপরীতে যে আত্মশক্তি ও সমাজশক্তির উদ্বোধনের সাধনা করে গেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সারা জীবন ধরে, সেই সাধনার এখনও-অসাধিত সচেতন তল্লাশি আমাদের অরাজপন্থার কর্তব্য হয়ে রইল।

৭.১০ তন্ত্র সংঘ তাও জেন সহজ সুফি ও নৈরাজ্য

বর্তমান অধ্যায়ের ৭.৩ অংশে তন্ত্র, সংঘ, তাও, জেন, সহজ/সহজিয়া, বাউল-বৈষ্ণব, শাক্তশৈব এবং সুফি-ইসলামের বঙ্গভারতীয় ধারাগুলোর সাথে নৈরাজ্যের সারসত্তাগত মিলের কথা বলে রেখেছিলাম। এইসব ধারার অন্তরঙ্গে যে নৈরাজসত্তা ক্রিয়াশীল বলে আমার মনে হয় তার অত্যল্প পরিচয় এখানে খুব সংক্ষেপে হাজির করে চলে যাব। তন্ত্র শিবশক্তির নামে প্রচলিত আছে প্রাচীন কাল থেকেই। শিবসাধনার পাশাপাশি শাক্তসাধনাও তন্ত্রেরই ঘরানাভুক্ত। আর, খোদ শিবতার নীতির কথা ইতোমধ্যে বেশ খানিকটা বলে রেখেছি এই অধ্যায়েরই ৭.৫ অংশে। তন্ত্রসাধনা মানুষের মুক্তির সাধনাই বটে। ভয়, লজ্জা, ঘৃণা, কাম, প্রভৃতি অষ্টপাশ থেকে বের হয়ে এসে মুক্তপুরুষ তথা মুক্তমানুষ হয়ে ওঠাই তন্ত্রের সাধনা। তন্ত্র মনে করে পরমাপ্রকৃতি মানুষকে স্বপরিচালিত হয়ে ওঠার মতো করেই বিকশিত করে তুলেছেন। সুতরাং কোনো রকম শাসন-শাস্ত্র-বিধিবিধান মানুষের জন্য অপ্রয়োজনীয়। তন্ত্র তাই শাস্ত্রবিরোধী, বেদবিরোধী।

'তন্ত্র' শব্দটা এসেছে 'তনোতি' এবং 'ত্রয়োতি' নামের দুটো মূল থেকে: 'তনোতি' শব্দের ঝোঁক "বিস্তার ঘটানো", "প্রসারিত করে তোলা", "অতিক্রম করে যাওয়া"র দিকে; আর 'ত্রয়োতি'র অর্থমুখ "মুক্তি" ও "স্বাধীনতা"র দিকে (দ্রষ্টব্য: "তন্ত্র", উইকিপিডিয়া; এবং www.esoteric online.net)। হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়ের *বঙ্গীয় শব্দকোষ* পরীক্ষা করলেও দেখা যাবে, 'তন্ত্র' শব্দটা বুৎপত্তিগতভাবেও 'তন্ + ত্র' (হরিচরণ, ১৯৯৬-ক: ১০১৯)। 'তন্' ধাতুটির অর্থ সত্যিই 'তনোতি'-সংশ্লিষ্ট যার অর্থ 'বিস্তার,

ব্যাপ্তি, প্রসারণ', এবং এর সাথে তুলনীয় 'tenuis' নামক ল্যাটিন শব্দটির অর্থও ঐ একই সংক্রান্ত (হরিচরণ, ১৯৯৬-ক: ১০১৮)। এর সাথে মিলিয়ে দেখা যেতে পারে *আত্মিক যৌনতা: দুই জনের তন্ত্র* নামক গ্রন্থটির একেবারে গোড়াতেই উপস্থাপিত ৪ প্রকারের স্বাধীনতার ধারণাকে— দেহ, মন, হৃদয় এবং আত্মার স্বাধীনতা; আপনার দেহই আপনার স্বাধীনতা, আপনার মনই আপনার স্বাধীনতা, আপনার হৃদয়ই আপনার স্বাধীনতা, এবং আপনার আত্মাই আপনার স্বাধীনতা; এবং শুধু তা-ই নয়, এই তন্ত্রসাধকেরা বলছেন: "এই চার স্বাধীনতা খতিয়ে দেখার ক্ষেত্রে তন্ত্র আপনাকে সাহায্য করে এবং তন্ত্র এদেরকে আপনার বাস্তবতায় পরিণত করতে সাহায্য করে; এবং তা শুধু আপনার সম্পর্কনিচয়ে নয়, বরং আপনার জীবনের সমস্ত এলাকায়ই বটে" (কোপল্যান্ড এবং লিংক, ২০০৩: ১২–১৩)। তাহলে দেখা যাচ্ছে, তন্ত্রকে মনুষ্য-স্বাধীনতার ব্যক্তিক ও আর্থ-রাজনৈতিক-সামাজিক ধারণা ও অনুশীলনসমূহের প্রেক্ষাপট থেকে পৃথক করে দেখার সুযোগ থাকছে না। উপরন্তু, কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তীর বরাতে ও বিশ্লেষণ অনুযায়ী হরিচরণের অভিধান মোতাবেক তন্ত্র-ধারণার সাথে এমনকি "স্বরাজ্যবিষয়ক চিন্তা"ও সংশ্লিষ্ট বটে (কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী, ২০০৯: ৪৫৭)।

এই বইয়ের ৭.৩ অংশে কেন আমি 'পাষণ্ড'বৃন্দের কথা বলেছিলাম 'পাষণ্ড' শব্দটির অধিকতর উপযুক্ত অর্থের দিকে তাকালে তা বোঝা যাবে বৈকি। 'পাষণ্ড' শব্দটার অর্থ: "বেদ-বিরুদ্ধাচারবান সর্ব্ববর্ণচিহ্নধারী; বেদ-ব্যবহার-বাহ্য সর্ব্বাশ্রমচিহ্নধারী; সর্ব্বলিঙ্গী"; "জৈনবৌদ্ধকাপালিকাদি"; "বেদনিন্দক, বেদাচারহীন কাপালিকাদি" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ১৩২৪)। 'কাপালিক' কথাটাও খেয়াল করা যেতে পারে: "যাহারা নরকপালে ভক্ষণাদি করে, শৈব যোগী বিশেষ। [ইহারা নরকপালের ভূষণ ধারণ করে। ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান করে এবং নরকপালে ভোজন ও পান করে। ব্রহ্মার শিরচ্ছেদজন্য পাপমোচনের নিমিত্ত কালভৈরব শিবাদেশে কাপালিকব্রত গ্রহণ করেন। কালভৈরব প্রথম কাপালিক।" (হরিচরণ, ১৯৯৬-ক: ৬০০)

কানে কানে বলে রাখি, লোকে তান্ত্রিকদেরকেই কাপালিক বলে আসছে যুগ যুগ ধরে। আর এটাও জানিয়ে রাখি, শিবেরই আরেক নাম 'কাপালী', কাপালী মানেও তান্ত্রিক (হরিচরণ, ১৯৯৬-ক: ৬০০)। তন্ত্রের সাথে শিবের যোগ এবং ব্রহ্মার সাথে তন্ত্রের/শিবের বিয়োগ একটু খেয়াল করবেন দয়া করে। বিরাট কাহিনীর গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে কিনা? সেই ঐতিহাসিক পুরাণ-কাহিনী তথা ইতিহাসের চাঞ্চল্যকর আলোচনার জন্য দ্রষ্টব্য: কলিম খান, ১৯৯৫। তা তো হলো, কিন্তু ঐ 'কালভৈরব'টা কে? ইনি সেই সত্তা/ব্যক্তি "যাহা হইতে কালের ভীরুতা"; ইনি "যমের ভীতিকর কাশীস্থ শিবাংশজাত

ভৈরববিশেষ। [শিবের কোপ হইতে ইহার উৎপত্তি। গর্ব্বপ্রকাশহেতু ব্রহ্মার পঞ্চম মস্তক ইনি শিবাদেশে বাম হস্তের অঙ্গুলিনখে ছিন্ন করিয়া ব্রহ্মহত্যাপাপমোচনার্থ ব্রহ্মকপালধারণ-পূর্ব্বক কাপালিকব্রত গ্রহণ করেন। তদবধি ব্রহ্মার চারি মুখ (কাশী খণ্ড, ৩১শ অধ্যায়)।]" (হরিচরণ, ১৯৯৬-ক: ৬১৬-৬১৭)

এখানে আরেকটু বলে রাখি, তন্ত্র সম্পর্কে আমার প্রাথমিকতম ধারণা পরিগঠনের উৎস-পাঠ হিসেবে দ্রষ্টব্য: প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায়, ১৯৮৩। তবে ঐ বইটাতে আমার নিজস্ব উপলব্ধি-ব্যাখ্যা হুবহু পাওয়া যাবে না। ব্যাখ্যা-উপলব্ধি আমার; কিন্তু মহাগুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক ধারণাগুলো ঐ বইয়ের থেকে পাওয়া। আর, আমার পাঠ-সংগ্রহে অন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ বইও আছে: স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ০০০০; স্যার জন উড্রোফে, ১৯১৩; অ্যামুকোস এবং ম্যাড্রেক ১৯৯২; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-ক; দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ; ফিউয়েরস্টেইন, ১৯৯৮; হাগ বি. আরবান, ২০০১; হাগ বি. আরবান ২০০৩। এ ছাড়া ওশো'র কিছু বই: *বিজ্ঞান ভৈরবতন্ত্র* (১ম খণ্ড), *বিজ্ঞান ভৈরবতন্ত্র* (২য় খণ্ড), *তন্ত্রদৃষ্টি* (১ম খণ্ড), *তন্ত্রদৃষ্টি* (২য় খণ্ড), *তন্ত্র: চূড়ান্ত উপলব্ধি* (বইগুলোর পিডিএফ-ডাউনলোডের জন্য দ্রষ্টব্য: http://www.messagefrommasters.com/Ebooks/Osho_Books_on_Tantra_&_Mantra.htm)।

লোকায়ত দর্শন বোঝাতে বসে 'সংঘ' নিয়ে কথা বলতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবেই 'সহজ'-এর উৎপত্তি নিয়ে কথা তুলেছেন দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় "তন্ত্রের উৎস: আদিম উর্বরতা-জাদু" প্রবন্ধে:

> 'সহজ' শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল, যা জন্মেছে বা যা একটা কিছুর জন্মের সঙ্গে উৎপন্ন হয়। আমরা আগে দেখেছি, 'তন্ত্র' কথাটির শব্দার্থের পেছনেও এই জাতীয় একটি ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যায়, যা হল প্রজনন ও উৎপাদন পরস্পর সম্বন্ধযুক্ত। 'সহ-জ' কথাটির মধ্যেও ঐ একই ইঙ্গিত দেখতে পাওয়া যায় না? (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ: ৮৯)

বঙ্গীয় শব্দকোষেও 'সহজ' শব্দটার অর্থ: "জন্মের সহিত জাত; সহোত্থিত, স্বভাবজ, নৈসর্গিক; স্বাভাবিক" এবং "প্রকৃতিস্থ, সুস্থ" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ২১৭২)। তারপর বঙ্কিমচন্দ্রের 'অনুশীলন' রচনাটি থেকে মোক্ষম উদাহরণ-বাক্য চয়ন করেছেন হরিচরণ: "যাহা আমাদের সঙ্গে জন্মিয়াছে, তাহা সহজ।" (হরিচরণ, ১৯৯৬-খ: ২১৭২)। এ থেকেই এসেছে ফকির লালনের 'সহজ মানুষ' এর ধারণা, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের মধ্যকার তান্ত্রিক সাধকদের 'সহজিয়া'র ধারণা, 'সহজ সাধনা'র চর্চা। ইশারা পরিষ্কার। বুদ্ধ এবং তার

স্বাধীনতা-সংঘ-সাম্যের ধারণা নিয়ে এখানে শুধু ওশো'র কিছু বইয়ের হদিস রেখে যাওয়া যাক: *ধম্মপাদ* (১ম থেকে ১২তম খণ্ড), *অতিক্রমনের নিয়ম* (১ম থেকে ৪র্থ খণ্ড), *হৃদয়-সূত্র*, *হীরক-সূত্র* (http://www.messagefrom masters.com/Ebooks/Osho_Books_on_Buddha_and_Buddhist_M asters.htm)।

নিজের *লোকায়ত দর্শন* বইয়ের দ্বিতীয় খণ্ডে "মাতৃপ্রধান সংস্কৃতির স্মারক: গৌরী", "সাংখ্য: আদিম বস্তুবাদ ও বস্তুবাদী দর্শন", "তন্ত্রের উৎস: আদিম উর্বরতা-জাদু", "সংঘ ও নিয়তি: সমাজবাস্তব ও স্বপ্নমোহ" প্রভৃতি মহামূল্যবান প্রবন্ধে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় (২০০০-খ) সংঘ-সাংখ্য-সহজ-সহজিয়া-তন্ত্র ইত্যাদি নিয়ে যে আলোচনা করেছেন তা আমাদের নৈরাজ্যের নিত্যতার ধারণাকে সমর্থন করার মতো প্রচুর তথ্য ও ব্যাখ্যা হাজির করে রেখেছে, যদিও দেবীপ্রসাদের কহতব্য বিষয় আমার থেকে অনেক আলাদা। দেবীপ্রসাদের ঝোঁক হচ্ছে তন্ত্র-তাও-সাংখ্য-সংঘ ইত্যাদির মার্কসবাদী-অর্থনীতিবাদী উৎপাদনপ্রণালীগত বিশ্লেষণ খাড়া করা, আর আমার ধান্দা হচ্ছে এ সবের অরাজপন্থাগত বিচার দাঁড় করানো যেখানে স্বাধীনতা-প্রেম-সমতা-স্বপরিচালনার দিকগুলি প্রধান।

তাও এর সঙ্গে তন্ত্রের সাযুজ্য প্রসঙ্গে দেবীপ্রসাদের পর্যবেক্ষণ প্রণিধানযোগ্য। তাঁর নিজের মতো করে তিনি যা বলেছেন তা যেন আমাদের নৈরাজ্যের নিত্যতার ধারণারই আরেকটি রূপভেদ:

> আমাদের যুক্তি যদি ঠিক হয় — অর্থাৎ কৃষিকেন্দ্রিক আদিম জাদুবিশ্বাস থেকেই যদি তন্ত্রের সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের উদ্ভব হয়ে থাকে — তাহলে ঐ সৃষ্টিতত্ত্ব ও দেহতত্ত্বের অনুরূপ চিন্তাধারার পরিচয় অন্যান্য কৃষিভিত্তিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও খুঁজে পাওয়া উচিত এবং তা পাওয়া যায়ও। পলিনেশিয়ার মাওরিদের চিন্তাধারার সঙ্গে তন্ত্রের মিল চোখে পড়ে, তাদের ধারণাতেও বিশ্বসৃষ্টির সূত্রপাত মানবীয় প্রজননের অনুরূপ পদ্ধতিতে — অর্থাৎ পুরুষ ও নারীর মৈথুন থেকেই হয়েছিল। প্রাচীন মিশর ও মেসোপোটামিয়ার সৃষ্টি উপাখ্যানগুলির ক্ষেত্রেও ঐ একই কথা খাটে ... (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ: ৯৬)

খেয়াল করেছেন তিনি যে তান্ত্রিক "বামাচারের অপর একটি নাম চীনাচার" (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ: ৯৭)। চীনাচার বলতে যে তাও-সাধনা তা বুঝিয়ে বলার অপেক্ষা রাখে না:

> প্রাচীন চীনের চিন্তানায়করা সৃষ্টির সূত্রপাত হিসেবে Yang (পুরুষ) এবং Yin [নারী]-এর যৌনমিলন কল্পনা করেছিলেন। শুধু তাই নয়,

মানবদেহকে ব্রহ্মাণ্ডের সংক্ষিপ্ত সার বলে কল্পনা করার পরিচয়ও পাওয়া যায়। (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ: ৯৭)

বস্তুত তাও ধর্মের সঙ্গে তন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক নীডহ্যামের দৃষ্টি এড়ায়নি, এবং সাদৃশ্যের বিষয়গুলি তিনি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে উল্লেখ করেছেন (দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ: ৯৮)।

দেবীপ্রসাদকে নির্ভর করতে হয়েছিল বৃটিশ ঔপনিবেশিক গবেষকদের কলোনিয়াল দৃষ্টিভঙ্গিগত তথ্য-ব্যাখ্যার ওপর। এখনকার নৈরাজপন্থীদের পোস্টকলোনিয়াল বিচারভঙ্গি খোদ তাওসাধনার চর্চাকারীদের যেসব আদি টেক্সট উদ্ধার করার দিকে মনোযোগ দিয়েছেন সেখানে আমরা তাওয়ের কর্তৃত্ব-তন্ত্রবিরোধী বৈশিষ্ট্যকেই উজ্জ্বলতর দেখতে পাই। উদাহরণত রবার্ট গ্রাহাম (২০০৫: ১-১১) তাঁর বইয়ের প্রথম খণ্ডের প্রথম অধ্যায়ে "দাসত্ব ও স্বাধীনতা সংক্রান্ত আদি রচনাসমূহ" অংশে খৃষ্টপূর্ব ৩০০ সালের দিককার আদি তাও সাধক বাও জিঙ্গিয়ান-এর রচিত "প্রভুও নয়, প্রজাও নয়" নামের যে রচনাটির ইংরেজি অনুবাদ পেশ করেছেন তাতে মুক্তিপরায়ন নৈরাজপন্থার অন্যতম আদি নিদর্শন মেলে। ওশো কর্তৃক প্রণীত তাও সম্পর্কিত সাম্প্রতিক কিছু নৈরাজ্যপ্রবণ রচনার হদিস এখানে দিয়ে জেনের দিকে চলে যাব— *তাও: পথহীন পথ* (১ম খণ্ড), *তাও: পথহীন পথ* (২য় খণ্ড), *তাও: সোনালী দুয়ার*, (১ম খণ্ড), *তাও: সোনালী দুয়ার* (২য় খণ্ড); *তাও: সেই তিন সম্পদ* (১ম খণ্ড), *তাও: সেই তিন সম্পদ* (২য় খণ্ড), *তাও: সেই তিন সম্পদ* (৩য় খণ্ড), *তাও: সেই তিন সম্পদ* (৪র্থ খণ্ড), *তাওয়ের পথ* (১ম খণ্ড), *তাওয়ের পথ* (২য় খণ্ড), *গোপনীয়তার গুপ্ত কথা* (১ম খণ্ড), *গোপনীয়তার গুপ্ত কথা* (২য় খণ্ড)। বইগুলোর পিডিএফ-ডাউনলোডের জন্য দ্রষ্টব্য: http://www.messagefrommasters.com/Ebooks/Osho_Books_on_Tao.htm।

অন্য দিকে, তাও-এরই আরেকটি ভাষ্য বলতে গেলে জেন চিন্তাধারা এবং দেহসাধনার জেন ধারা। "স্বাধীনতা এবং নিষেধ" এবং "ক্ষমতা এবং আত্মসমর্পণ" এর ভেতরকার টানাপোড়েনই (ফিলিপ তোশিও সুডো, ২০০০: ২৪) জেন ধারার মুখ্য একটি জায়গা। "তোমার কল্পনাপ্রতিভাকে মুক্ত করে দাও। কল্পনাপ্রতিভা যেখানে, সেখানেই সৃজনশীলতা; যেখানে সৃজনশীলতা, সেখানেই সৃজন; আর যেখানে সৃজন, সেখানেই যৌনতা" (ফিলিপ তোশিও সুডো, ২০০০: ২৬)। এই সমস্তটার পেছনে আছে স্বাধীনতার ধারণা। "কঙ্কাল" নামের এক রচনায় জেন নারী-সাধু ইকিউ লিখেছিলেন, "আঙ্গিকের কাঠামো থেকে নিজেকে মুক্ত করো এবং ফিরে যাও সত্তার মূল ভূমিতে" (উদ্ধৃত: ফিলিপ তোশিও সুডো, ২০০০: ৭৩)। তন্ত্র এবং তাওয়ের মতোই, স্বাধীনতা-আনন্দ-ভালোবাসার মহাকাব্যিক প্রকাশ দেখতে পাই জেন-ধারণায়:

> অঙ্গকাঠামো থেকে আমরা নিজেদেরকে মুক্ত করি ভালোবাসার মাধ্যমে: শরীরকে ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে খোদ শরীরের অস্থায়িত্বকে অতিক্রম করার মাধ্যমে। আমরা আমাদের সারসত্তাকে শরীর হিসেবে দেখি না। শরীরই যদিও ধারণ করে যৌনশক্তিকে, কিন্তু আমরা দেখি খোদ যৌন শক্তিটাকেই যা চিরন্তন। আমাদের সারসত্তা আগুনের মতো। কিন্তু প্রায়শই আমরা ভুল করি: নিজেদেরকে দেখি মোমবাতি হিসেবে। (ফিলিপ তোশিও সুডো, ২০০০: ৭৩)

আসলে প্রেম-ভালোবাসা-যৌনতাকে মুক্ত-স্বাধীন করে তোলাই জেন সাধনার প্রধান কথা (উদ্ধৃত: ফিলিপ তোশিও সুডো, ২০০০: ১১৯)। স্বাধীনতা ছাড়া তাঁদের ভালোবাসা নাই, যৌনতা নাই (উদ্ধৃত: ফিলিপ তোশিও সুডো, ২০০০: ১৩৬)। আপাতত আর আলোচনা না বাড়িয়ে খোদ জেন-অ্যানার্কি বিষয়ক কিছু রচনার কথা এখানে শুধু উল্লেখ করে রাখি: কেরি থর্নলি, ১৯৯১; ম্যাক্স ক্যাফার্ড, ২০০৬; জেমস ব্রাউন, ২০০৯। ওশো দেখিয়েছেন, তন্ত্রের মতো এবং নৈরাজ্যের মতোই জেনও শাস্ত্রবিরোধী, "জেন-এর কোনো থিওরি নাই, এটা বাস্তবের প্রতি অগ্রসর হওয়ার একটি নন-থিওরেটিক্যাল অ্যাপ্রোচ" (ওশো, http://www.oshozen.net/osho-zen-has-no-theory-it-is-a-nonth eoretical-approach-into-reality/)। ওশোর কাছে জেন "শিশুদের মতো স্বাভাবিক-প্রাকৃতিক নিষ্পাপ অদূষিত মানুষদের" সাধনার পথ; "প্রকৃতির স্বতঃস্ফূর্ততা এবং স্ব-নিয়মের" পথই জেনের পথ (http: //www.oshozen.net/osho-patanjali-is-for-unhealthy-people-an d-zen-is-for-very-natural-people/)। জেন-পথিকদের মতো করে বললে, "হ্যাঁ একটা প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত তো আছেই, কিন্তু সেই বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে বিদ্রোহও খোদ ঐ প্রাকৃতিক বন্দোবস্তেরই অংশ; তোমার স্বভাব-প্রকৃতিকে অনুসরণ করাটাই প্রাকৃতিক বন্দোবস্ত" (http://zarathustra sgoat.tripod.com/zenanarchy.html)। জেনের পথ তাই নৈরাজ্যের নিত্যতারই পথ। "জেন খোদ নৈরাজ্যবাদের তুলনায় অধিকতর নৈরাজ্যপ্রবণ" (ম্যাক্স ক্যাফার্ড, ২০০৬)। সেই সাথে এখানেও বলে রাখি জেন এবং জেনের সাথে বুদ্ধকে মিলিয়ে প্রণয়ন-করা সাধু ওশো'র কিছু রচনার কথা: *পাখায় ওড়া পাখি*, *কমিউনিজম এবং জেন-আগুন, জেন-বাতাস*, *হঠাৎ বজ্র-সংঘাত*, *বুদ্ধ: হৃদয়ের শূন্যবৃত্তি*, *জোশু: সিংহের গর্জন*, *ঈশ্বর এখন মৃত: জেনই এখন একমাত্র জীবন্ত সত্য*, *পাইন বনের প্রাচীন গান*, *জেনের মতো বাঁচো*, *বোধিধর্ম: মহত্তম জেন শিক্ষক*, *কিয়োজ্যান: জেনের এক সত্য মানুষ*, *জলসিঞ্চিত ফুল*, *ন্যানসেন: পার্থক্যবিন্দু*, *আইজ্যান: নীলাকাশে নেই পায়ের*

কোনোই ছাপ, একটি বীজই পুরো পৃথিবীকে সবুজ বানিয়ে তোলে, না-কোনো জল না-কোনো চাঁদ, কোনো মন নয়: অনন্তের ফুল, শ্বেতপদ্ম, এই দেহই বুদ্ধ, সূর্য ওঠে সন্ধ্যায়, উৎসে ফিরে যাওয়া, জেন ইশতেহার: নিজের কাছ থেকে মুক্তি, আমি আমাকে উদযাপন করি, জেনের পথে হাঁটা জেনের পথে বসা, এ হলো হাজার বার: এ হলো জেনের সার, জেন: হেঁয়ালির পথ (১ম খণ্ড), *জেন: হেঁয়ালির পথ* (২য় খণ্ড), *জেন: হেঁয়ালির পথ* (৩য় খণ্ড), *সহজভাবে নাও* (১ম খণ্ড), *সহজভাবে নাও* (২য় খণ্ড), *জেন: অতিক্রান্ত সত্তার রহস্য ও কবিতা, জেন: অরণ্যের একলা পাখি কোকিল, জেন: মন থেকে মনহীনতার দিকে কোয়ান্টাম-লাফ, আদি মানুষ, ঘাস নিজেই জন্মায়, প্রথম মূলনীতি, অস্তিত্বের ভাষা, অত্যাশ্চর্য, জেন: হীরক-বজ্রপাত*। ওশো'র এই বইগুলোর পিডিএফ-ডাউনলোডের পাতা: http://www.messagefrommasters.co m/Ebooks/Osho_books_on_Zen_and_Zen_Masters.htm।

আলোচনা দীর্ঘ হয়ে পড়ছে। সুফি-ইসলামের অন্তর্জাত স্বাধীনতাবোধ, ভালোবাসা এবং সাম্য-সংহতি সম্পর্কে এখানে আর বিশেষ কথা তুলব না। ইসলামের নৈরাজ্য নিয়ে আপাতত শুধু কিছু রচনার উল্লেখ করে রাখি: ডেভিড বার্কার, ২০১২; মুহম্মদ আনোয়ার, ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ; হাসান মাহমুদ, ০০০০; পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন, ১৯৯৩; পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন, ১৯৯৫; একনাথ ঈশ্বরণ ১৯৯৯; রবার্ট ইয়োহানসেন, ১৯৯৭; রাজমোহন গান্ধী ২০০৪; হাকিম বে, ২০০৪; ওশো, "লা ইলাহা ইল্ আল্লাহ", ২০০৫: ৯-৩৭; ইসলামের সাথে নৈরাজ্যের সম্পর্ক বিষয়ক এক গাদা রচনা ও আলাদা আলাদা পরিপ্রেক্ষিতের জন্য দ্রষ্টব্য: অ্যানারকিজমো, "ইসলাম ও নৈরাজ্যবাদ", ২০০৫; হাকিম বে, ২০০৬; মোহামেদ যুহদি জেসার, ২০০৬; এম. এন. রায় ২০০৬-ক; হাসান মাহমুদ, ২০০৭; মোহামেদ জঁ ভেনুজ, "অ্যানার্কা-ইসলাম", ২০০৯; মোহামেদ জঁ ভেনুজ, ২০১০; উইকিপিডিয়া, "নৈরাজ্যবাদ ও ইসলাম", ২০১১; উইকিপিডিয়া, "উপনিবেশ-উত্তর নৈরাজ্যবাদ", ২০১২-ক; উইকিপিডিয়া, "নৈরাজ্যবাদ ও ইসলাম", ২০১২-খ; জুলাইবিব আইয়ুব ২০১২; মোহামেদ জঁ ভেনুজ ২০১৩।

এঁদের মধ্যে হাকিম বে'র রচনা ও কর্মতৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া হাকিম বে'র আসল নাম পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন। হাকিম বে তাঁর কলম-নাম। ইনি সুফি, তন্ত্র এবং নয়া-প্যাগানপন্থার সংমিশ্রণে তাঁর নিজের মতো করে আধ্যাত্মিক পথে 'অনটলজিক্যাল অ্যানার্কি' বা 'সত্তানুসন্ধানী নৈরাজ্য' নামে একটি পৃথক ধারার সন্ধান করছেন দীর্ঘকাল ধরে। এঁর একাধিক বই ও রচনা পাওয়া যাবে এখানে: হাকিম বে, ২০০৬। হাকিমের পরে বিশেষ করে বলতে হয়

মোহামেদ যুহদি জেসার'এর কথা। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অ্যারিজোনার এক চিকিৎসক। ২০০৩ সালে ইনি গঠন করেন 'অ্যামেরিকান ইসলামিক ফোরাম ফর ডেমোক্রেসি' (এআইএফডি)। আর, মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবে আব্দুল গাফফার খান মুসলমানদের যে অহিংস প্রত্যক্ষ তৎপরতা তথা 'মুসলিম ননভায়োলেন্ট ডাইরেক্ট অ্যাকশন' এর বিকাশ ঘটিয়েছিলেন পাকিস্তানে, বিশেষত সীমান্ত প্রদেশে, তা নিয়ে আলোচনা আছে এখানে, রবার্ট ইয়োহানসেন (১৯৯৭) এর রচনাটিতে।

এ ছাড়া ওশো'র সুফি-স্বাধীনতা বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ আরো কিছু রচনার কথা উল্লেখ করা দরকার। যেমন *সুফি: পথের মানুষ* (১ম ও ২য় খণ্ড), *বালুকণার প্রজ্ঞা* (১ম ও ২য় খণ্ড), *যথার্থ শিক্ষক* (১ম ও ২য় খণ্ড), *ঠিক ওরকমই*, *রহস্য*, *যতক্ষণ না মরছ* পাওয়া যাবে এখানে: http://www.messagefrommasters.com/Ebooks/Osho_Books_on_Sufi_Masters.htm।

আর নয়। যে মহাত্মার মহা-উদ্ধৃতিকে 'উৎসর্গ-লিপি'তে আশ্রয় করে এ বইয়ের সূত্রপাত ঘটেছিল, এবারে সেই মহাত্মা গান্ধীর শরণ নিয়েই এর ইতি টানার দিকে অগ্রসর হবো।

৭.১১ সত্যাগ্রহীর স্বরাজ অথবা মহাত্মা গান্ধীর রাষ্ট্রহীন সমাজ

নৈরাজ্যের নিত্যতা নিয়ে যাঁদের বিস্ময়জনিত আঘাতের ঘোর এখনও কাটে নি তাঁদের জন্য ধান ভানতে শিবের গীতের সুরাঘাত এখনও বাকি। আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে এই বইয়ের 'উৎসর্গ-লিপি'তে (পৃষ্ঠা v) উদ্ধৃত শৈব-তান্ত্রিক মুক্তি-সাধক মহাত্মা গান্ধীর চমকে দেওয়ার মতো সেই বাক্যটি? (গান্ধীর তন্ত্র-সাধনা প্রসঙ্গে প্রমাণ হিসেবে নয়, চিন্তার উস্কানি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক অ্যামারিটাস অধ্যাপকের রচনা দ্রষ্টব্য: নিক জিয়ার, ২০০৬। রাষ্ট্র সম্পর্কে গান্ধীর এই বিশ্লেষণ-ধারা প্রসঙ্গে আমরা কি আদৌ কিছু জানতাম? না, জানতাম না। কিন্তু গান্ধী বলতে আমরা স্রেফ 'দুধ-ভাত অহিংসা'র কথা মুখস্ত করি, ভুলে যাই 'সাহসীদের অহিংসা'র কথা (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪৬: ১২৯), 'অহিংস প্রতিরোধ'[৪৯] এর কথা। সেই গান্ধীর কাছ থেকে রাষ্ট্র সম্পর্কে এরকম তাক লাগিয়ে দেওয়ার মতো নৈরাজ্যপ্রবণ মতামত শুনতে আমরা, আমি অন্তত, প্রস্তুত ছিলাম না। অথচ খোদ কংগ্রেসের শুরুর দিককার সভাপতি স্যার শঙ্করন নায়ার ১৯২২ সালেই সুবিস্তারিত

---

[৪৯] স্মর্তব্য: "My desire is born of an unshakable faith in nonviolent resistance." (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-খ: ৫০৭)

তথ্যপ্রমাণসহ আস্ত একটা বই লিখে ফেলেছিলেন এ কথা প্রমাণ করার জন্য যে গান্ধী আসলে একজন অ্যানার্কিস্ট (স্যার শঙ্করন নায়ার, ১৯২২)। তাঁর অভিযোগ সত্য ছিল। তাঁর প্রমাণাদি গ্রাহ্য ছিল। আমি নিজে পরীক্ষা করে দেখেছি। আপনাদেরও তা করার সুযোগ আছে বৈকি। কিন্তু আমার এক দশকের নৈরাজ্য-অধ্যয়নের ধারাবাহিকতায় কয়েক বছর আগে যখন জোশ ফাত্তাল (২০০৬) এর "গান্ধী কি অ্যানার্কিস্ট ছিলেন?" নামের রচনাটা চোখে পড়ে, তখন আমার বিরাগই বরং উৎপন্ন হয়েছিল।

মার্কসীয় ডগমার সাথে অন্তরঙ্গ, ঐকান্তিক, সুদীর্ঘ সংসর্গ থাকার কারণে আগাগোড়াই আমি যেকোনো, বিশেষত অ্যানার্কিস্ট, ডগমা সম্পর্কে মহা-সাবধান ছিলাম। এর আগে, লেভ তলস্তয় খ্রিষ্টিয় ঘরানার অ্যানার্কিস্ট ধরনের চিন্তা করতেন বলে যাবতীয় নৈরাজ্য-ইতিহাসবিদের কাছে শুনেও বিরক্ত হয়েছিলাম, যদিও সেসব ইতিহাসবিদ (যেমন পিটার মার্শাল, ২০০৮: ৪২২-৪২৭) কেউই ফেলনা ছিলেন না। কিন্তু যখন সত্যি সত্যি তলস্তয়ের "রুশ উদারনীতিবাদীদের প্রতি একটি চিঠি" (তলস্তয় ১৮৯৬), "দেশপ্রেম ও সরকার" (তলস্তয়, ১৯০০-ক), "তুমি খুন করবে না" (তলস্তয়, ১৯০০-খ), "নৈরাজ্য প্রসঙ্গে" (তলস্তয় ১৯০০-গ), "জার এবং তাঁর সহকারীদের প্রতি" (তলস্তয়, ১৯০১), "শ্রমজীবী জনগণের প্রতি" (তলস্তয়, ১৯০২), গান্ধী-তলস্তয় পত্রবিনিময়-সংকলন (তলস্তয়, ১৯১০) ইত্যাদি রচনা পড়তে থাকলাম তখন হাঁ হয়ে যাওয়া ছাড়া পথ থাকল না। বিশেষ করে যখন ডেভিড স্টিফেন্স (১৯৯০) এর সম্পাদনা করা তলস্তয়-রচনা-সংকলন *সরকার মানে সহিংসতা* হাতে এল তখন একেবারে টাশকি খেয়ে গেলাম— তলস্তয়ের অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও স্বরচিত নৈরাজ্য-প্রবণতা সম্পর্কে আর সামান্যতম সংশয়ও থাকল না।

এমনকি তারপরও গান্ধী নৈরাজ্যবাদী ছিলেন কিনা তা নিয়ে জোশ ফাত্তালের উপরোক্ত অন্বেষণ আমাকে সংশয়েই রাখে। রচনাটিতে সেকেন্ডারি সোর্স থেকে কোট করা গান্ধীর এমনসব গা শিউরানো নৈরাজ্যিক কথা ছিল, যেগুলো গান্ধীর নিজের বইয়ে স্বচক্ষে দেখা ছাড়া শান্তি পাচ্ছিলাম না। এই বইয়ের 'উৎসর্গ-লিপি'র উদ্ধৃতিটাও ফাত্তালের কাছ থেকেই পাওয়া। তিনি সেটা পেয়েছিলেন ইগনাটিয়াস জেসুডাসান (১৯৮৭) এর গ্রন্থে। শেষ পর্যন্ত, ক-দিন আগে ভারত-সরকারের প্রকাশ করা মহাত্মা গান্ধীর ৯৮ খণ্ডের রচনা-সংগ্রহ (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৯৯) নেট থেকে ডাউনলোড করার পর ঐ উদ্ধৃতি-সম্বলিত মূল রচনাটা যখন চোখের সামনে জ্বলজ্বল করতে থাকল তখন আর হতাশার সীমা থাকল না। আমি নিরুপায় হয়ে গান্ধীর স্বরাজ-অরাজ-নৈরাজের দৃষ্টান্ত দেখতে থাকলাম পাতার পর পাতায়।

তো, কী প্রসঙ্গে রাষ্ট্রের সহিংস চরিত্র আর আত্মাহীনতার কথা তুলেছিলেন

গান্ধী? সেটা ছিল ১৯৩৪ সালের নভেম্বর মাসে তাঁর প্রাইভেট সেক্রেটারি নির্মল কুমার বসুর নেওয়া গান্ধীর একটি সাক্ষাৎকারে। প্রথমে সেটা *দ্য মডার্ন রিভিউ* পত্রিকায় এবং পরে *দ্য হিন্দুস্তান টাইমস* পত্রিকায় ছাপা হয়। সেটা মোটেও কোনো মুখ-ফস্কানো কথা ছিল না। কথা উঠেছিল খাদি দিয়ে পুঁজিবাদ ও পুঁজিপতিদেরকে ঠেকানো যাবে কিনা তাই নিয়ে। সে কথা গিয়ে ঠেকে ব্যক্তিগত সম্পত্তির সাথে অহিংসার সম্পর্ক প্রসঙ্গে। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অসমতা যেহেতু সমাজে হিংসা তৈরি করে, নির্মল বসু তাই জানতে চাইছিলেন সম্পত্তির ব্যক্তি-মালিকানার জায়গায় রাষ্ট্রীয় মালিকানা কায়েম করে তাহলে আমরা সহিংসতা কমিয়ে আনার চেষ্টা করব না কেন। উত্তরে গান্ধীর কথা তাঁর মুখ থেকেই শুনি:

> এটা ব্যক্তি-মালিকানার চেয়ে ভালো। কিন্তু সহিংসতার নিরিখেই— সেটাও আপত্তিকর। এটা আমার সুদৃঢ় বিশ্বাস যে রাষ্ট্র যদি সহিংসতা দিয়ে পুঁজিবাদকে দমন করে, তাহলে রাষ্ট্র নিজেই সহিংসতার চক্রে জড়িয়ে যাবে, এবং কখনোই তা অহিংসার জন্ম দিতে পারবে না। সহিংসতার ঘনীভূত ও সুসংহত রূপের প্রতিনিধিত্ব করে রাষ্ট্র। ব্যক্তির আত্মা থাকে, কিন্তু রাষ্ট্র যেহেতু আত্মাবিহীন একটা মেশিন, সেহেতু তা কখনোই সহিংসতা থেকে মুক্ত হতে পারবে না— কেননা এর খোদ অস্তিত্বটাই সহিংসতার কাছে ঋণী। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

এরকম সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা শোনার পর নির্মল বসু রাষ্ট্রের হাতে অন্তত কিছু ক্ষেত্রে "সহিংসতার ন্যূনতম প্রয়োগ" এর দায়িত্ব দেওয়ার ব্যাপারে নাছোড়। বিশেষ একটা উদাহরণ দিচ্ছেন তিনি। বলছেন: ধরুন, এক জন শিল্পী তাঁর ছেলের কাছে কিছু ছবি রেখে গেলেন। ছেলেটা কিন্তু ছবিগুলোর মূল্য বুঝল না। সে সেগুলো বেচে দিল বা নষ্ট করে ফেলল। এতে করে এক জনের আহাম্মকির জন্য পুরো জাতির একটা ক্ষতি হয়ে গেল। তখন কি গান্ধীর মনে হবে না যে ঐ ছেলের কাছ থেকে ছবিগুলো নিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সহিংসতার ন্যূনতম প্রয়োগ করাটা রাষ্ট্রের পক্ষে যুক্তিসঙ্গত? উত্তরে গান্ধী বলছেন:

> হ্যাঁ, রাষ্ট্র আসলে ঐ জিনিসগুলো নিয়ে নেবে, এবং আমার বিশ্বাস, [এক্ষেত্রে] রাষ্ট্র যদি সহিংসতার ন্যূনতম প্রয়োগ ঘটায় তবে সেটা যুক্তিসঙ্গতও হবে। কিন্তু এই ভয়টা সবসময়ই থেকে যায় যে রাষ্ট্রের সাথে যাঁরা ভিন্নমত পোষণ করবেন তাঁদের বিরুদ্ধে রাষ্ট্র হয়ত সহিংসতার অতিরিক্ত প্রয়োগই ঘটাবে। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

নিজেরই মনে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাই: এ কি গান্ধীর কথা শুনছি নাকি প্রুধোঁ, বাকুনিন, লুইজ মিশেল, গিওম, হিন্স, ক্রপোৎকিন, ম্যালাতেস্তা, এমা গোল্ডম্যানদের কথা শুনছি! কিন্তু এখানেই থেমে যাচ্ছেন না গান্ধী। বলছেন:

> ব্যক্তিগতভাবে যেটা আমি বেছে নেব সেটা রাষ্ট্রের হাতে ক্ষমতার ঘনীভবন নয় ...; কেননা আমার মতে, রাষ্ট্রের সহিংসতার চেয়ে ব্যক্তি-মালিকানাজনিত সহিংসতা কম ক্ষতিকর। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

এবার নির্মল কুমার বসুর প্রশ্ন:

> তাহলে কী বাপু আমরা ধরে নেব আপনার সাথে সমাজতন্ত্রীদের [পড়ুন 'বলশেভিক সমাজতন্ত্রীদের'] মৌলিক পার্থক্যটা এইখানে যে আপনার বিশ্বাস অনুযায়ী মানুষ যতটা না অভ্যাসের বশে জীবন চালায় তার চেয়ে বেশি চালায় আত্ম-নির্দেশনার সাহায্যে, আর তাঁরা বিশ্বাস করেন নিজ সিদ্ধান্তের তুলনায় অভ্যাস দিয়েই বরং জীবন চালায় মানুষ। তা-ই যদি হয় তাহলে কেন আপনি আত্মশুদ্ধির চেষ্টা চালাতে থাকেন যখন তাঁরা নাকি সচেষ্ট হন এমন একটা সিস্টেম গড়ে তুলতে যেখানে মানুষের অন্যকে শোষণ করার বাসনা চরিতার্থ করাটা অসম্ভব বলে বিবেচিত হবে? (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৮)

ইউরোপের উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গড়ে ওঠা 'শ্রমজীবী মানুষদের আন্তর্জাতিক সমিতি' তথা 'প্রথম আন্তর্জাতিক' এর ভেতরে মার্কসবাদীদের সাথে নৈরাজ্যবাদীদের রাষ্ট্রতর্ক তীব্র হয়ে উঠেছিল যে প্রশ্নে (এই বইয়ের 'দ্বিতীয় পাঠ' দ্রষ্টব্য), এ তো ঠিক সেই প্রশ্ন! এখানে তর্কের খাতিরে হলেও নির্মল কুমার বসু প্রতিনিধিত্ব করছেন মার্কসবাদীদের (আসলে বলশেভিক রাষ্ট্রতন্ত্রীদের), আর গান্ধী যেন প্রতিনিধিত্ব করছেন নৈরাজ্যবাদীদের। তো, নির্মল বসুর উপরের প্রশ্নটার উত্তরে গান্ধী:

> মানুষ যে আসলে অভ্যাস দিয়েই চলে সে কথা স্বীকার করে নিয়েও আমার মনে হয়, নিজের ইচ্ছাশক্তির অনুশীলনের সাহায্যে বাঁচাটাই তার জন্য অধিকতর ভালো। আমি আরো বিশ্বাস করি, মানুষ তাঁদের ইচ্ছাশক্তিকে এতটা দূর পর্যন্ত উন্নত করে তুলতে সক্ষম যে তার ফলে শোষণের ব্যাপারটা কমে এসে ঠেকবে একেবারে ন্যূনতম পর্যায়ে। রাষ্ট্রের ক্ষমতার বাড়বাড়ন্তকে আমি চরমতম ভয়ের চোখে দেখি, কেননা যদিও নাকি দেখতে মনে হয় যে শোষণের প্রশমন ঘটানোর মাধ্যমে রাষ্ট্র আমাদের মঙ্গল সাধন করছে, কিন্তু আসলে তা মানব-জাতির সর্বোচ্চ

ক্ষতি সাধন করে— ব্যক্তিসত্তার ধ্বংস ঘটানোর মাধ্যমে; অথচ যাবতীয় প্রগতির গোড়ায় আছে এই ব্যক্তিসত্তাই। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ৩১৯)

কিন্তু, গান্ধীর মতো সমাজ-শিক্ষকরা তো আর প্রতিদিন দুনিয়ায় জন্মান না, কালেভদ্রে আসেন। তাহলে মানুষের আত্মশুদ্ধির ব্যাপারে গান্ধীর মতো মানুষদের ব্যক্তি-প্রভাবের ওপর নির্ভর করে পরে খেই হারিয়ে ফেলার চাইতে বিশেষ কোনো প্রকার সমাজ-সংগঠন গড়ে তোলা এবং তার ওপর নির্ভর করাটাই কি বেশি কাজের নয়? — নাছোড় নির্মলের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন পিছু ছাড়ে না। তাতে করে আমাদের গান্ধীর 'স্বরাজ'কে আমার অরাজের সাথে মিলিয়ে বুঝতে সহজ হয়। গান্ধীর মতে:

> আমার কথা বাদই থাক। আপনাকে অবশ্যই স্মরণে রাখতে হবে, মানব-জাতির সমস্ত মহান শিক্ষকের প্রভাব তাঁদের জীবন অতিবাহিত হওয়ার পরেও থেকে গেছে। মুহম্মদ বুদ্ধ যিশুর মতো প্রত্যেক নবীর শিক্ষার মধ্যে একটা অংশ থাকে স্থায়ী ধরনের, আর আরেকটা অংশ থাকে যা তাঁদের সময়ের প্রয়োজন ও চাহিদার জন্য উপযোগী ধরনের। ... কিন্তু, তা যা-ই হোক, আপনি দেখতে পাবেন যে এইসব মানুষের প্রভাব তাঁরা চলে যাওয়ার পরও টিকে থেকেছে। অধিকন্তু, যা আমি অনুমোদন করি না তা হলো বলপ্রয়োগের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সংগঠন, যেমন রাষ্ট্র। তবে, স্বতঃস্ফূর্ত সংগঠন তো থাকতেই হবে। (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-ক: ১৩৯)

অধিকতর অধিকন্তু: গান্ধী যে 'আদর্শ সমাজ' এর স্বপ্ন দেখেন সেটা হচ্ছে 'রাষ্ট্রহীন সমাজ'-এর দিকে অগ্রসরমান পথ (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৪৬: ১২৯)। থামতে পারছি না, গান্ধীকে কোট করতে ভালো লাগছে:

> ... একটা আদর্শ সমাজে কি রাষ্ট্র-ক্ষমতা থাকবে কিংবা এরকম একটা সমাজ কি রাষ্ট্রহীন হবে? আমার মনে হয় এই প্রশ্নটা অবান্তর। আমরা যদি এরকম একটা সমাজ গঠন করার দিকে কাজ করে যেতে থাকি, অন্তত কিছুটা পর্যন্ত তো সেটা বাস্তবায়িত হতে বাধ্য এবং ততটা পর্যন্ত তো মানুষ তা থেকে উপকার পাবেই। ইউক্লিড সরলরেখার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন তাতে করে তার কোনো প্রস্থ থাকার কথা না, কিন্তু এখনও পর্যন্ত কেউ সে রকম কোনো সরলরেখা আঁকতে পারেন নি এবং কোনো দিন কেউ পারবেনও না। তার পরও আমরা জ্যামিতিতে উন্নতি ঘটাতে পারি শুধু মাত্র এই ধরনের একটা সরলরেখার কথা অনুমান করে নিয়েই। প্রত্যেকটা আদর্শের ক্ষেত্রেই কথাটা সত্য। (মোহনদাস করমচাঁদ

গান্ধী, ১৯৪৬: ১২৯)

৭.১২ সহিংস রাষ্ট্র, পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয় ও বঙ্গভারতীয় অরাজপন্থা

এই যে রাষ্ট্র — সংগঠন হিসেবে গান্ধী যাকে অনুমোদন করেন না, করেন না তার অন্তর্জাত সহিংসতার জন্য — সেই রাষ্ট্রের হাতেই খুন হয়েছিলেন, গায়েব হয়ে গিয়েছিলেন, আমাদের উজ্জ্বলতম অধ্যাপকদের একজন, হবিবুর রহমান। সেই রাষ্ট্র পাকিস্তান-রাষ্ট্র ছিল বলে শুধু নয়, সেই রাষ্ট্র সে মুহূর্তে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল বলেও নয়— সেই রাষ্ট্র একটি রাষ্ট্র ছিল বলেই বটে। কেননা রাষ্ট্র মানেই সদাবর্তমান, দৃশ্যমান বা অদৃশ্যমান, যুদ্ধ এবং খুন-খারাবি। স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে হবিবুর রহমানের মতো অধ্যাপকদের তেমন জন্মই হয় না, গায়েব আর হবেন কী, কিন্তু গায়েব হয়ে যেতে বসে খোদ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ই— ১৯৭৩ এর আইন যাকে বানিয়ে ফেলেছে রাষ্ট্রের ভেতরকার ক্ষুদে আরেকটি রাষ্ট্রে। আজ পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের পবিত্র আঙিনা জুড়ে দাপিয়ে বেড়ায় রাষ্ট্রের সরকারি বাহিনী ও প্রাইভেট ছাত্র-মিলিশিয়া, রাষ্ট্রীয় হালুয়ারুটি-সহিংসতার রঙবেরঙা ছাত্র-শিক্ষক-রাজনীতি (দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৭-খ)। আর ১৯৭১ সালের সেই মহান জনযুদ্ধের ৪০ বছর পুরতে না পুরতে রাষ্ট্রের পিছু পিছু এসে হয় কর্পোরেট বিশ্বব্যাঙ্কের 'হিক্কা প্রকল্প' (হেকেপ প্রজেক্ট)। আর মুক্তিযুদ্ধের রাষ্ট্রীয় নেতৃত্ব প্রদানকারী দলের প্রধানমন্ত্রী নির্দ্বিধায় গেয়ে যান আইএমএফ-বিশ্বব্যাঙ্কের নিওলিবারাল পাবলিক-প্রাইভেট-পার্টনারশিপ বা পিপিপি'র জয়গান– বুঝে নাকি না বুঝে তা আমরা বুঝতে পারি না। কিন্তু এইটুকু কে না বোঝে যে এই পিপিপি'র অর্থ হচ্ছে শিক্ষা-স্বাস্থ্য-কল্যাণকে কর্পোরেট-নিয়ন্ত্রিত অ-মুক্ত বাজারের হাতে সাধ করে তুলে দেওয়া। আমাদের আদরের শহীদ হবিবুর রহমানের এই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়কে (মৃত্যু স্বয়ং এসে হাজির হওয়ার পরও যার আঙিনা ছেড়ে তিনি পালিয়ে যান নি[৫০]) এই রাষ্ট্র-কর্পোরেট রাক্ষসের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য আমাদের আজকে চাই গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রায়-রহমানের মতো স্বাধীন ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন অন্তত কয়েক ডজন ব্যক্তি। কেবল স্বাধীন (স্ব+অধীন) যাপন ও অনুশীলনের সার্বক্ষণিক, আমৃত্যু প্রচেষ্টার ভেতর দিয়েই এরকম মাথা-উঁচু বিনয়ী ব্যক্তি গড়ে উঠতে পারে। একাধারে কর্তৃত্ব- ও শৃঙ্খলা-পরায়ন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ মানুষ অনেক আছেন কিন্তু অন্যের স্বাধীনতা ও

---

[৫০] এই পালিয়ে না যাওয়ার বিস্তারিত, গা শিউরানো বিবরণের জন্য দেখুন অধ্যাপক হবিবুর রহমানের স্ত্রীর মর্মস্পর্শী স্মৃতিকথা: "স্বামীর কথা" (শহীদ ইকবাল, ২০১১)।

আত্মমর্যাদাকে নিজের স্বাধীনতার আর আত্মমর্যাদার নিশ্চয়তা হিসেবে দেখার মতো মানুষ গড়ে ওঠার রসায়নটা একটু আলাদাই বৈকি।

তো, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র-ক্ষমতার বিপরীতে গান্ধী-রবীন্দ্রনাথ-রায়-রহমানের এই যে ব্যক্তিসত্তার 'আত্মনির্দেশনা'>আত্ম-অধীনতা>স্ব-অধীনতা>স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা অভিমুখিন চিন্তা-তৎপরতা— এরই নাম মুক্তিপরায়নতা, নৈরাজ্য। গান্ধীর জন্য যেটা স্বরাজ[৫১], আমার মতো অ্যানার্কিস্টের জন্য সেটাই অরাজ। এই অরাজপন্থার পথিক এম. এন. রায়ও। তাই, ব্যক্তি-প্রশ্নে, রাষ্ট্র-প্রশ্নে, সমাজ-প্রশ্নে নৈরাজ্যবাদ, গান্ধীবাদ, রবীন্দ্রনাথ আর এম. এন. রায় একাকার হয়ে যান। এই জন্যই দেখতে পাই, রায়-গান্ধী-তলস্তয়-রবীন্দ্রনাথের অতুলনীয় অনন্যতা-স্বকীয়তা-স্বাতন্ত্র্য সত্ত্বেও ব্যক্তি-রাষ্ট্র-সমাজ-চিন্তনের ক্ষেত্রে তাঁদের বিস্ময়কর রকমের মৌলিক সাদৃশ্যও একটি স্বাভাবিক ঘটনা এবং তা স্বভাবতই নৈরাজ্যপ্রবণ, নিত্যনৈরাজ্যের স্মারক। নৈরাজ্যবাদ আর ইউরোপের সম্পত্তি হয়ে থাকে না, হয়ে ওঠে বঙ্গ-ভারতীর সাধনা। এভাবেই আমরা ইউরো-মার্কিন নৈরাজ্যবাদের সমান্তরালে বঙ্গ-ভারতীয় অরাজপন্থার একটি স্বকীয় ধারার সন্ধান পেতে পারি, সেই ইঙ্গিতই আমার রায়-নৈরাজ্য পাঠের ভবিষ্যত দিশা। (কথাসূত্রে বলে রাখি, খোদ নৈরাজ্যেরই সহস্র শাখা-উপশাখা আছে। তার মধ্যে একটা হচ্ছে 'উপনিবেশ-উত্তর নৈরাজ্যবাদ' বা পোস্টকলোনিয়াল অ্যানার্কি; এবং ইউরোমার্কিন কেন্দ্রিকতা থেকে বেরিয়ে আসাটা এই উপনিবেশ-উত্তর নৈরাজ্যের একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য (দ্রষ্টব্য: হাকিম বে, ২০০৬ এবং রজার হোয়াইট, ২০০৪) এ প্রসঙ্গে আমার নিজের পুরাতন

[৫১] পরিস্থিতি বিচারে মনে হয় যেন গান্ধীর 'স্বরাজ'কে একটা কথার কথা হিসেবে ধরে নেওয়াটাই ইদানীংকার চল। কিন্তু তাঁর স্বরাজ মানে যেমন বৃটিশ উপনিবেশের হাত থেকে ভারত-রাষ্ট্রের অটোনমি, ভারতীয় সমাজের অটোনমি, তেমনি ব্যক্তির অটোনমিও বটে। এ নিয়ে গান্ধীকে নতুন করে পড়ার গুরুত্ব অপরিসীম। আপাতত শুধু উস্কানিমূলক দুই-একটা ইশারা-উদ্ধৃতি (অজস্র বাকি থাকল): "Our people hardly understand what swarajya means" (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯০৮: ৪৫৮)। "Real swarajya consists in restraint. He alone is capable of this who leads a moral life, does not cheat anyone, does not forsake truth and does his duty to his parents, his wife, his children, his servant and his neighbour. Such a man will enjoy swarajya wherever he may happen to live. A nation that has many such men always enjoys swarajya." (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯০৮: ৪৫৮)। "My conviction ... is that India will not win swaraj by depriving a single individual of his freedom of action" (মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী, ১৯৩৪-খ: ৫০৭)।

নোট থেকে পাঠোদ্ধারের অনুমতি প্রার্থনা করি:

> তদানিন্তন রাশিয়ার মতো পশ্চাৎপদ দেশে নৈরাজ্যবাদের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন পিতর ক্রপোৎকিন। অন্য রচনায় আমিও বলেছি, [দ্রষ্টব্য: সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৯-ক] আমাদের দেশের ইতিহাসে অচেতন অ্যানার্কি আছে। ভাষা আন্দোলনে, গণঅভ্যুত্থানে, মুক্তিযুদ্ধে, রূপকথায়, ফোকলোরে, হাজারো বিদ্রোহে, পুরানে, [তন্ত্রে,] সুফিতত্ত্বে নৈরাজ্যের স্পষ্ট আভাস আছে। শিবপুরাণে স্বাভাবিক বিশুদ্ধতার ধারণা [দ্রষ্টব্য: কলিম খান, ১৯৯৫: ১৪-১৫] নৈরাজ্যেরই ধারণা।
>
> ...
>
> বাকুনিন, হকার এবং নোম চমস্কির নৈরাজ্যবাদ স্রেফ ফলো না-করে আমাদের অরাজপন্থা আমাদের নিজেদেরই তৈয়ার করা বাংলাদেশে নৈরাজ্যবাদীদের কাজ। কাজটা প্রত্যক্ষ শ্রমিক আন্দোলন ধরে, সিনেমা ধরে, কবিতা, প্রবন্ধ, শিক্ষকতা, মিছিল, সমাবেশ, আলোচনা, ছবি আঁকা, গান— অজস্র ধারায় করা সম্ভব। সমমনাদের মধ্যে বৃহত্তর ফেডারেশন গড়ে তোলা সম্ভব।
>
> আমাদের মতো দেশে দীর্ঘ দিনের বাস্তব কাজের মধ্য দিয়ে নৈরাজ্যবাদের পৃথক পৃথক ভাষ্য গড়ে ওঠাটাও স্বাভাবিক। যা ইউরোমার্কিন নৈরাজ্যবাদের পর্যালোচনাও দাঁড় করিয়ে দেবে। (সেলিম রেজা নিউটন, ২০০৯-খ)

ঠিকই যে এম. এন. রায়কে বানানো হয়েছে দুধভাত-মানবাতবাদের আর্কাইভ-অবতার-ডাকটিকিট; হবিবুর রহমানকে পরিণত করা হয়েছে স্রেফ একটা ছাত্র হলে; আর গান্ধীকে তো মহাত্মা বানিয়ে, প্রতিরোধ-অসম্ভব অহিংসা বানিয়ে, ফটো করে তুলে রাখা হয়েছে সরকারি অফিসের দেওয়ালে দেওয়ালে। কিন্তু, বঙ্গদেশের মুক্তিপাগলদের কাছে গান্ধী, এম. এন. রায় আর হবিবুর রহমানরা বিন্দুমাত্র হারিয়ে যান নি। ঐ যে মাত্রই গান্ধী যেমনটা বলছিলেন, "মানব-জাতির সমস্ত মহান শিক্ষকের প্রভাব তাঁদের জীবন অতিবাহিত হওয়ার পরেও থেকে গেছে ... আপনি দেখতে পাবেন যে এইসব মানুষের প্রভাব তাঁরা চলে যাওয়ার পরও টিকে থেকেছে"— সেরকমই ছাইচাপা আগুনের মতো ধিকিধিক জ্বলছেন বঙ্গ-ভারতীয় মুক্তি-কালাপানি পেরুনো অগ্রপথিকেরা। একটু ফুঁ দিলেই উড়ে যাবে ছাই। চোখমুখ কিছুক্ষণ অন্ধকারে ঢেকে যাবে বৈকি; জ্বালাও করবে; কিন্তু তারপরই জ্বলে উঠবে আলো— মুক্তির আগুন।



বইপত্র-রচনার হদিস

আলী আনোয়ার ১৯৭৪

"র‍্যাডিক্যাল হিউম্যানিজম ও তার পটভূমি", *শহীদ হবিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ*, শিশিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় গণিত সমিতি, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস। এই গ্রন্থটির 'পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত সংস্করণ' পরে বের হয় ২০১১ সালের শহীদ বুদ্ধিজীবী দিবসে, *নয়নে তোমার বিশ্বছবি: শহীদ হবিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ* নামে, হবিবুর রহমান হলের প্রাধ্যক্ষ প্রফেসর শহীদ ইকবালের সম্পাদনায়। বর্তমান প্রবন্ধে ২০১১ সালের গ্রন্থটিই ব্যবহার করা হয়েছে।

আলেকজান্ডার বার্কম্যান ১৯৮৬

Alexander Berkman. *The Russian Tragedy*. Published as a book by Cienfuegos Press, Orkney, 1976, Then published by Phoenix Press, London, 1986, This Zabalaza Books edition was scanned directly from the Phoenix Press edition and published August 2008, Zabalaza Books, South Africa, www.zabalaza.net.

অ্যানারকিজমো ২০০৫

Anarkismo (2005), "Islam and Anarchism", http://www.anarkismo.net/newswire.php?story_id=977. This page was last modified on 20 July 2005. (Accessed on 18th December 2012).

অ্যামুকোস এবং ম্যান্ড্রেক ১৯৯২

AMOOKOS and Mandrake (1992). *Tantra Magick*. Publisher: D. B. Taraporevala Sons & Co. Pvt. Ltd. by arrangement with Mandrake.

ইগনাটিয়াস জেসুডাসান ১৯৮৭

Ignatius Jesudasan (1987). *A Gandhian Theology of Liberation*. Gujarat Sahitya Prakash: Ananda India, pp 236-237. Originally a Ph.D. thesis in Marquette University, USA, 1980. It is available here: Paper AAI8104805 (http://epublications.marquette.edu/dissertations/AAI8104805)

উইকিপিডিয়া ২০১১

Wikipedia (2011), "Anarchism and Islam", http://en.wikipedia.org

/wiki/Anarchism_and_Islam. The page was last modified on 18 October 2011. (Accessed on 18th December 2012).

উইকিপিডিয়া ২০১২-ক

Wikipedia (2012), "Post-Colonial Anarchism", http://en.wikipedia.org/wiki/Post-colonial_anarchism. This page was last modified on 19 July 2012. (Accessed on 18th December 2012).

উইকিপিডিয়া ২০১২-খ

Wikipedia (2012), "Anarchism and Religion", http://en.wikipedia.org/wiki/Anarchism_and_religion. This page was last modified on 29 August 2012. (Accessed on 18th December 2012).

একনাথ ঈশ্বরণ ১৯৯৯

Eknath Easwaran (1999). *Nonviolent Soldier of Islam*, 2nd Edition, Tomales, CA: Nilgiri Press.

এমা গোল্ডম্যান ১৯২৩

Emma Goldman. *My Disillusionment in Russia*. New York: Doubleday, Page & Company.

এমা গোল্ডম্যান ১৯২৪

Emma Goldman. *My Further Disillusionment In Russia*. New York: Doubleday, Page & Company.

এম. এন. রায় ১৯২২

M. N. Roy in collaboration with Abani Mukherji. *India in Transition*. Geneve: Edition de la Librairie J. B. Target.

এম. এন. রায় ১৯৪৬-ক

M. N. Roy. *New Orientation*. First published 1946. First Reprint 1982. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৪৬-খ

M. N. Roy. *Revolution and Counter-Revolution in China*. First published 1946. First Reprint 1986. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৪৭-ক

M. N. Roy. *New Humanism: A Manifesto*. First published 1947. Third Reprint 1981. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৪৭-খ

M. N. Roy. *Science and Philosophy*. First published 1947. Reprint 1984. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় এবং ফিলিপ স্প্র্যাট ১৯৪৭

M. N. Roy and Phillip Spratt. *Beyond Communism*. First published in 1947. Reprint 1981. Delhi: Ajanta Publications. Online version: http://issuu.com/ rahuljain/docs/beyond_communism.

এম. এন. রায় ১৯৪৮

M. N. Roy. *Reason, Romanticism and Revolution*. First published 1948. Reprint in one volume 1989. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৬০

M. N. Roy. *Politics, Power and Parties*. First edition 1960. Reprinted in 1981. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৬৪

M. N. Roy. *Memoirs*. First published 1964, Reprint 1984. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৬৮

M. N. Roy. *Men I Met*. First published 1968, First Reprint 1981. Delhi: Ajanta Publications.

এম. এন. রায় ১৯৯৯

M. N. Roy. *From Communist Manifesto to Radical Humanism*. (With a Foreword by Sibnarayan Ray.) Calcutta: Ranaissance Punlishers.

এম. এন. রায় ২০০০

M. N. Roy. *The Russian Revolution and the Tragedy of Communism*. (Translated from the original german text and edited with notes by Sibnarayan Ray.) Calcutta: Ranaissance Punlishers.

এম. এন. রায় ২০০৬-ক

ইসলামের ঐতিহাসিক ভূমিকা। বঙ্গানুবাদ: বদিউর রহমান। ফেব্রুয়ারি। ঢাকা: প্যাপিরাস।

এম. এন. রায় ২০০৬-খ

নয়া মানবতাবাদ: একটি ইশতেহার। বাংলা অনুবাদ: বদিউর রহমান। সেপ্টেম্বর। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ। (প্রথম প্রকাশ: নভেম্বর ১৯৭৮)

এমিল ডুর্খেইম ১৯৬৪

Emile Durkheim. *The Elementary Forms of the Religious Life: A Study in Religious Sociology*. London : George. Allen & Unwin.

এরিকো ম্যালাতেস্তা ১৯৯৩

Errico Malatesta, "Ends and Means", in Vernon Richards (ed.), Malatesta: His Life & Ideas, London: Freedom Press.

ওশো ২০০৫

Osho (2005), "La Illaha Ill Allah", *Truth Simply Is*, New Delhi: Full Circle Publishing.

কলিম খান ১৯৯৫

মৌল বিবাদ থেকে নিখিলের দর্শনে। কলকাতা: হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী।

কলিম খান ১৯৯৯

দিশা থেকে বিদিশায়: নতুন সহস্রাব্দের প্রবেশ বার্তা। কলকাতা: হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী।

কলিম খান ২০০০

ফ্রম এনলাইটেনমেন্ট টু ইমোশনাল বন্ডেজ: জ্যোতি থেকে মমতায়। কলকাতা: হাওয়া উনপঞ্চাশ প্রকাশনী।

কলিম খান ২০০১

পরমা ভাষার সংকেত: ক্রিয়াভিত্তিক শব্দার্থবিধি ও ভাষাতত্ত্বের নতুন দিগন্ত। ঢাকা: প্যাপিরাস।

কলিম খান ২০০২-ক

আত্মহত্যা থেকে গণহত্যা: আসমানদারি করতে দেব কাকে। কলকাতা: নান্দীমুখ সংসদ।

কলিম খান ২০০২-খ

পরমা ভাষার বোধন-উদ্বোধন। কলকাতা।

কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী ২০০৪

বাংলা বানান বাংলা ভাষা। কলকাতা।

কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী ২০০৬

বাংলা ভাষা: প্রাচ্যের সম্পদ ও রবীন্দ্রনাথ। কলকাতা।

কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী ২০০৮

অবিকল্পসন্ধান: বাংলা থেকে বিশ্বে। কলকাতা: দিবারাত্রির কাব্য।

কলিম খান এবং রবি চক্রবর্তী ২০০৯

বঙ্গীয় শব্দার্থকোষ (ক্রিয়াভিত্তিক-বর্ণভিত্তিক শব্দার্থের অভিধান)। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: ভাষাবিন্যাস।

কার্ল মার্কস, ১৮৮৭

Karl Marx. *Capital*. Volume 1; Part VII: The Accumulation of Capital; Chapter Twenty-Five: The general law of capitalist accumulation; Section 4: "Different Forms of the Relative Surplus-Population; The General Law of Capitalistic Accumulation". First english edition of 1887. Publisher: Progress Publishers, Moscow, USSR. Translated: Samuel Moore and Edward Aveling Í edited by Fredrick Engels. Online HTML Version: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1867-c1/ch25.htm#S4; PDF: http://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capi tal-Volume-I.pdf.

কেরি থর্নলি ১৯৯১

Kerry Thornley (1991), "Zenarchy", The Anarchist Library, http://theanarchistlibrary.org/library/kerry-thornley-zenarchy.pdf (accessed on 16 January 2013).

কোপল্যান্ড এবং লিংক ২০০৩

Pala Copeland and Ali Link (2003). Soul *Sex: Tantra for Two*. The Career Press, Inc., 3 Tice Road, PO Box 687, Franklin Lakes, NJ 07417, Online: www.careerpress.com; www.newpagebooks.com.

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ০০০০

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। সম্পাদক: নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। সুলভ সংস্করণ। কলকাতা: রাজেন্দ্র লাইব্রেরী। প্রকাশের সন এ বইয়ে মুদ্রিত ছিল না।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ ২০০৩

শ্রীশ্রীচৈতন্যামৃত। সম্পাদক: রাধাগোবিন্দ নাথ। ১ম খণ্ড। ভূমিকা। ষষ্ঠ মুদ্রণ। কলকাতা: সাধনা প্রকাশনী।

ক্রপোৎকিন ১৯০২

Peter Kropotkin. *Mutual Aid: A Factor of Evolution*. First published 1902. Reprint of 1914 edition Edited and with an Introduction by Paul Avrich. New York: New York University Press. 1972. Online version: *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anar

chist_Archives/kropotkin/ muta idcontents.html.

ক্রপোৎকিন ১৯৮৬

Pierre Kropotkin (1886). *Law and Authority: An Anarchist Essay*. London: International Publishing Co.

ক্রপোৎকিন ১৯১৯

Peter Kropotkin (1919). "The Russian Revolution and the Soviet Government", Letter to the Workers of Western Europe, Letter dated: Dmitrov, Russia, April 28, 1919, First Published in English: Labour Leader of July 22, 1920, Online Version from Peter Kropotkin, *Kropotkin's Revolutionary Pamphlets*, Roger N. Baldwin (editor), Vangaurd Press, Inc. 1927, http://www.marxists.org/reference/archive/kropotkin-peter/1910s/19_04_28.htm (MIA: Reference Archives: Peter Kropotkin).

ক্রপোৎকিন ১৯২৪

Peter Kropotkin. *Ethics: Origin and Development*. Original Russian edition was edited with an introduction by N. Lebedev and was published in 1922. Translated English edition was published in 1924. Translated by Louis S. Friedland and Joseph R. Piroshnikoff. New York: Lincoln MacVeagh (The Dial Press). Online version: *The Anarchist Library*. http://theanarchist library.org/HTML/Petr_Kropotkin__Ethics__Origin_and_Development.html.

ক্রিস ম্যানজাপারা, ২০১০

Kris Manjapra. *M. N. Roy: Marxism and Colonial Cosmopo-litanism*. Delhi: Routledge India, 2010.

গুস্তাভ ল্যান্ডার ১৯১০

Gustav Landaur (1910), "Schwache Stattsmanner, Schwacheres Volk!", *Der Sozialist*, June; included in his 2010 book *Revolution and Other Writings: A Political Reader*; Edited and translated by Gabriel Kuhn; Oakland, CA: PM Press.

গ্রাহাম পারচেজ ২০০৩

Graham Purchase (2003). *Peter Kropotkin: Ecologist, Philosopher and Revolutionary*. A thesis submitted to the School of Philosophy, the University of New South Walse, Sydney, Australia in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy.

জুলাইবিব আইয়ুব ২০১২

Julaybib Ayoub (2012). *The Tasneem Project: A Muslim Anarchist Handbook*. Online: http://www.steampunkshariah.info/ (The site was accessed on 12th December 2012).

জেমস ব্রাউন ২০০৯

James Brown (2009), "The Zen of Anarchy: Japanese Exceptionalism and the Anarchist Roots of the San Francisco Poetry Renaissance", Religion and American Culture: A Journal of Interpretation , Vol. 19, No. 2 (Summer), pp. 207-242, URL: http://www.jstor.org/stable/10.1525/rac.2009.19.2.207.

জোশ ফাত্তাল ২০০৬

Josh Fattal, "Was Gandhi An Anarchist?", *Peace Power* (Berkeley's Journal of Nonviolence & Conflict Transformation), Volume 2, Number 1, Winter 2006, http://www.calpeacepower.org/ 0201/gandhi_anar chist.htm.

টিম ক্যাভানো ২০০৩

Tim Cavanaugh (2003), "Revealed Libertarianism: Minaret of Freedom tries to square the Quran with the free market", A Reason Interview, July 28, 2003, http://reason.com/archives/2003/07/ 28/revealed-libertarianism/singlepage.

ডেভিড গ্রেইবার ২০০২

David Graeber, "The New Anarchists", *New Left Review*, Vol. 13, January-February 2002, http://newleftreview.org/II/13/david-grae ber-the-new-anarchists (accessed on 14 January 2012).

ডেভিড গ্রেইবার ২০১১-ক

David Graeber, "Occupy Wall Street's Anarchist Roots", *Al Jazeera*, 'Opinion' section, 30 Nov 2011, http://www.aljazeera.com /indepth/opinion/2011/11/2011112872835904508.html (accessed on 12 January 2012).

ডেভিড গ্রেইবার ২০১১-খ

Dabid Graeber, "Situating Occupy", *Adbusters*, 2 Dec 2011, http://www.adbusters.org/magazine/99/world-revolution-2011.h tml (accessed on 12 January 2012).

ডেভিড গ্রেইবার ২০১২

David Graeber, "The 'Cancer' In Occupy? An Anarchist Reponds",

The Occupied Wall Street Journal, 3 June 2012, http://occu piedmedia.us/2012/03/the-cancer-in-occupy-an-anarchist-repond s/ (accessed on 12 January 2012).

ডেভিড বার্কার ২০১২

Davi Barker (2012), "Anarchy And Islam", *The Daily Anarchist*, January 11, http://dailyanarchist.com/2012/01/11/anarchy-and-islam/.

ডেভিড স্টিফেন্স ১৯৯০

Leo Tolstoy (1990). *Government is Violence: Essays on Anarchism and Pacifism*. Edited by David Stephens. London: Phoenix Press.

ড্যানিয়েল গুয়েরিন ২০০৫

Daniel Guerin (2005), *No Gods, No Masters* [Complete unabridged edition: this edition consists of the first complete English translation of the four volume French edition (original French title, English translation: *Neither God Nor Master*) published in 1980 by Franyois Maspero], Translated by Paul Sharkey; Oakland, CA: AK Press.

তলস্তয় ১৯০০-ক

Leo Tolstoy (1900). "Patriotism and Government". *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tol stoy/patriotismandgovt.html.

তলস্তয় ১৯০০-খ

Leo Tolstoy (1900). "Thou Shalt Not Kill". *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tolstoy/n otkill.html.

তলস্তয় ১৯০০-গ

Leo Tolstoy (1900). "On Anarchy". *The Anarchist Librry* http://theanarchistlibrary.org/HTML/Leo_Tolstoy_On_Anarchy.html.

তলস্তয় ১৯০১

Leo Tolstoy (1901). "To the Tsar and His Assistants". *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tol stoy/tsar.html.

তলস্তয় ১৯০২

Leo Tolstoy (1902). "To the Working People". *The Complete Works*

of Count Tolstoy. Vol XXIV. Dana Estes & Co. 1905 (pp. 131-169). Online version: *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Ar chives/bright/tolstoy/tsar.html.

তলস্তয় ১৯১০

Leo Tolstoy (1910). "Gandhi Letters". *Recollections & Essays by Leo Tolstoy*. Oxford University Press: London, New York, Toronto: 1937. (pp. 433-439). Online version: *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tolstoy/lettertogandhi.html.

তলস্তয় ১৮৯৬

Leo Tolstoy (1896). "A Letter to Russian Liberals". *Anarchy Archives*. http://dwardmac.pitzer.edu/Anarchist_Archives/bright/tol stoy/liberals.html.

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-ক

লোকায়ত দর্শন। প্রথম খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, ২০০০-খ

লোকায়ত দর্শন। দ্বিতীয় খণ্ড। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা: নিউ এজ পাবলিশার্স।

নিক জিয়ার ২০০৬

Nicholas F. Gier (2006), "Was Gandhi a Tantric?", First presented at the annual meeting of the Society for Asian and Comparative Philosophy, Asilomar Conference Center, Monterey, California, June, 2006. Online: http://www.class.uidaho.edu/ngier/gandtantric .htm (accessed 23 November 2012).

নীহাররঞ্জন রায় ১৪০২ বঙ্গাব্দ

বাঙ্গালীর ইতিহাস: আদি পর্ব। দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

নোম চমস্কি ১৯৭০

Noam Chomsky, "Government in the Future", Talk given at the Poetry Center, New York City, 16th February 1970, Audio file: http://www.chomsky.info/audionvideo/19700216.mp3, Transcript: http://tangibleinfo.blogspot.com/2006/11/noam-chomsky-lecture-fr om-1970-full.html. (সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক প্রণীত বাংলা অনুবাদের জন্য দ্রষ্টব্য: নোম চমস্কি, "ভবিষ্যতের সরকার", *মাওরুম*, সংখ্যা ১৫, বর্ষ ৬, মে ২০০৯, ঢাকা: হিল রিসার্চ এন্ড প্রোটেকশন ফোরাম।)

নোম চমস্কি ২০০৫

Noam Chomsky. *Chomsky on Anarchism*, Selected and edited be Barry Pateman. Edinburgh, Oakland and West Virginia: AK Press.

নোম চমস্কি ২০০৬

Noam Chomsky, "Science in the Dock", Discussion with Noam Chomsky, Lawrence Krauss & Sean M. Carroll, Science & Technology News, March 1, 2006, http://www.chomsky.info/de bates/20060301.htm.

নোম চমস্কি ২০১০

Noam Chomsky, "Q&A: Noam Chomsky", Noam Chomsky interviewed by David Samuels, Tablet: A New Read on Jewish Life, November 12, 2010, http://www.chomsky.info/interviews/20 101112.htm.

নোম চমস্কি, ২০১১-ক

Noam Chomsky, "Science, Religion and Human Nature" (Part I), Chomsky interviewed by Michael Albert, ZCommunications, Sunday, September 18, 2011, http://www.zcommunications. org/the-chomsky-sessions-ii-science-religion-and-human-nature-part-i-by-noam-chomsky. [Transcript of Z Video DVD Chomsky Sessions II, Science, Religion and Human Nature, an Interview with Noam Chomsky and Michael Albert (http://www.zcommunica tions.org/zstore/products/114). Transcribed by Anton G.]

নোম চমস্কি, ২০১১-খ

Noam Chomsky, "Science, Religion and Human Nature" (Part II), Chomsky interviewed by Michael Albert, ZCommunications, Sunday, September 24, 2011, http://www.zcommunications. org/the-chomsky-sessions-ii-science-religion-and-human-nature-part-ii-by-noam-chomsky. [Transcript of Z Video DVD Chomsky Sessions II, Science, Religion and Human Nature, an Interview with Noam Chomsky and Michael Albert (http://www.zcommunica tions.org/zstore/products/114). Transcribed by Anton G.]

পল অ্যাভ্রিচ ১৯৭০

Michael Bakunin. *God and the State*. Canada: Dover Publications, Inc. This Dover edition, first published in 1970, is an unabridged and unaltered republication of the edition published in 1916 by Mother Earth Publishing Association, New York. A new Introduction and Index of Persons, prepared by Paul Avrich,

Professor of history, Queens College, have been added.

পল ম্যাকললিন ২০০২

Paul McLaughlin (2002). *Mikhail Bakunin: The Philosophical Basis of His Anarchism*. New York: Algora Publishing.

পিওতর আর্চিনভ ১৯২৬

Wilhelm von Humboldt (1792). *The Sphere and Duties of Government* (*The Limits of State Action*). Translated from the German of Baron Wilhelm von Humboldt by Joseph Coulthard. London: John Chapman, 1854.

পিটার মার্শাল ২০০৮

Peter Marshall (2008). *Demanding the Impossible: A History of Anarchism*. London, New York, Toronto and Sydney: Harper Perennial.

পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন ২০০৯

Peter Lamborn Wilson (2009), "Interview with Peter Lamborn Wilson: Part 1 of 2: On Islam", *Affinity Project*, from *The Anarchist Library* (Retrieved on December 21, 2009 from affinityproject.org), Online: http://theanarchistlibrary.org/library/affinity-project-interview-with-peter-lamborn-wilson (accessed on 12th December 2012).

পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন ১৯৯৩

Peter Lamborn Wilson (1995), *Sacred Drift: Essays on the Margins of Islam*. Illustrated Edition. Columbus Avenue at Broadway, San Francisco, CA: City Lights Books.

পিটার ল্যাম্বর্ন উইলসন ১৯৯৫

Peter Lamborn Wilson (1995), "Islam and the Internet: Net-religion, a War in Heaven", Lecture at Networking Conference Budapest,October 6, 1995 (MetaForum II, No Borders, Budapest) Online: http://hermetic.com/bey/pw-islam.html (This lecture was accessed on 12th December 2012).

প্রমোদ কুমার চট্টোপাধ্যায় ১৯৮৩

তন্ত্রাভিলাষীর সাধুসঙ্গ। তিন খণ্ড একত্রে অখণ্ড সংস্করণ। কলকাতা: বিশ্ববাণী প্রকাশনী।

ফার্নান্দ পেলুতিয়ের ১৮৯৫

Fernand Pelloutier (1895), "Anarchism and the Workers' Union", written on 20 October 1895, printed in *Les Temps nouveaux*, 2–8 November 1895, pp. 409–415 in Daniel Guerin, 2005: 409–415.

ফিউয়েরস্টেইন ১৯৯৮

Georg Feuerstein (1998). *Tantra: The Path of Ecstasy*. Boston &London: Shambhala.

ফিলিপ তোশিও সুডো ২০০০

Philip Toshio Sudo (2000). *Zen Sex: The Way of Making Love*. HarperCollins E-Books. This Adobe Acrobat eBook Reader edition was published in September 2008. ISBN 978-0-06-177228-3. Author Contact: psudo@zencomputer.com. Website: www.zensex.org.

ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস ১৮৭২

Frederick Engels, "On Authority", Written: 1872; Published: 1874 in the Italian, Almanacco Republicano; Source: Marx-Engels Reader, New York: W. W. Norton and Co., 2nd edition, 1978 (first edition, 1972), pp 730-733.; Translated: Robert C. Tucker. Online: http://www.marxists.org/archive/marx/works/1872/10/authority.htm (accessed on 6 December 2012).

বাকুনিন ১৮৬৭

Mikhail Bakunin. "Federalism, Socialism, Anti-Theologism", Presented by Bakunin as a Reasoned Proposal to the Central Committee of the League for Peace and Freedom, at the League's first congress held in Geneva, September 1867.

বাকুনিন, ১৮৬৯–১৯৭০

M. A. Bakunin, *Les Endormeurs* (*The Lullers*) (1869), *Le Socialisme libertaire*, p. 101; *Intrigi Gospadina Utina* (*The Intrigues of Mr Utin*) (1870), *Archives Bakounine*, V, p. 142] (পল ম্যাকললিন, ২০০২: ৪৫, ৯৭; ৪৬ নম্বর পাদটীকায় উল্লেখিত)।

বাকুনিন ১৮৯৫–১৯১৩

M. A. Bakunin, *Oeuvres*, 6 vols. (Paris, 1895-1913), II, 399; Steklov, Mikhail Aleksandrovich Bakunin, I, 189 (পল অ্যাভ্রিচ, ১৯৭০: vi এ উল্লেখিত)।

বাকুনিন ১৯৫০

Mikhail Bakunin (1950). *Marxism Freedom and the State*. Translated and Edited with a Biographical Sketch by K. J. Kenafick. London: Freedom Press.

বাকুনিন ১৯৭০

Michael Bakunin (1970). *God and The State* (With a new introduction and index of persons by Paul Avrich, Professor of History, Queens College). New York: Dover Publications.

বাকুনিন ১৯৭১

Bakunin on Anarchy (Selected works by the activist-founder of world anarchism). Edited, translated and with an introduction by by Sam Dolgoff. New York: Vintage Books. 1971.

বার্ট্রান্ড রাসেল ১৯২০

Bertrand Russell (1920). *The Practice and Theory of Bolshevism*. London: George Allen & Unwin Ltd.

ভিক্টর সার্জ ১৯৩০

Victor Serge. Year One of Russian Revolution. Translated and edited by Peter Sedgwick. First published as *L'An I de la revolution russe* in 1930. English translation 1972. Chicago, New York, San Fransisco: Halt, Rinehart and Winston.

ভি. বি. কার্নিক ১৯৭৮

V. B. Karnik. *M. N. Roy: Political Biography*. Bombay: Nav Jagriti Samaj.

মহাভারত ২০০১

বেদব্যাস বিরচিত কালীপ্রসন্ন সিংহ অনূদিত *মহাভারত*। রাজ সংস্করণ। দ্বিতীয় খণ্ড। কলকাতা: তুলিকলম।

মার্টিন বুবার ১৯৪৯

Martin buber (1949). *Paths in Utopia*. Translated by R. F. C. Hull. Boston: Beacon Press, 1958.

মুহম্মদ আনোয়ার ১৩৬৭ বঙ্গাব্দ

"ইসলামে চিন্তার মুক্তি", *পূর্বমেঘ*, প্রথম বর্ষ চতুর্থ সংখ্যা, পৃষ্ঠা ৩৯-৩৪৫।

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯০৮

Mohandas Karamchand Gandhi (1908). "What is Just?" (Published in *Indian Opinion*, 18-7-1908). *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, 98 Volumes. Volume 8: 14 December 1907 — 22 July 1908, pp 455-460.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯২৮

Mohandas Karamchand Gandhi (1928). "Interview to Alice Schalek", 20 March 1928, *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes. Volume 41: 3 December 1927 — 1 May 1928.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯৩৪-ক

Mohandas Karamchand Gandhi (1934). "Interview to Nirmal Kumar Bose" (Interviewed: November 9/10, 1934). (Published first in *The Modem Review* and then reproduced in *The Hindustan Times*, 17-10-1935). *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes. Volume 65: 16 September 1934 — 15 December 1934, pp 316-320.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯৩৪-খ

Mohandas Karamchand Gandhi (1934). "Speech at A.I.C.C. Meeting, PatnaÎI". (Published in *The Bombay Chronicle*, 20-5-1934 and 21-5-1934). *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes. Volume 63: 18 January 1934 — 19 May 1934, pp 506-511.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯৪৬

Mohandas Karamchand Gandhi (1946). "Congress Ministries and Ahimsa", *Harijan Sevak*, 15-9-1946. (A translation of this was also published in Harijan, 15-9-1946). *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes. Volume 92: 9 August 1946 — 6 November 1946, pp 128-320.

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৯৯৯

Mohandas Karamchand Gandhi (1999). *The Collected Works of Mahatma Gandhi* (Electronic Book), New Delhi, Publications

Division of Government of India, 1999, in 98 Volumes.

মোহামেদ জঁ ভেনুজ ২০০৯

Mohamed Jean Veneuse (2009), "Anarca-Islam", A Thesis Submitted to the Department of Sociology, Queen's University Kingston, Ontario, Canada (August, 2009), Online: http://theanarchistlibrary.org/library/Mohamed_Jean_Veneuse_Anarca-Islam.html (accessed 8 April 2012).

মোহামেদ জঁ ভেনুজ ২০১০

Mohamed Jean Veneuse (2010), "The Body of the Condemned Sally: Paths to Queering Anarca-Islam", *Anarchist Developments in Cultural Studies*, Volume 2010 (1), Online: http://theanarchistlibrary.org/library/mohamed-jean-veneuse-the-body-of-the-condemned-sally-paths-to-queering-anarca-islam (accessed 8 April 2012).

মোহামেদ জঁ ভেনুজ ২০১৩

Mohamed Jean Veneuse (2013). *Islam & Anarchism: Relationships and Resonances.* (Upcoming.) Published by Minor Compositions (Contact: minorcompositions@gmail.com). Distributed by Oakland, CA: AK Press.

মোহামেদ যুহদি জেসার ২০০৬

M. Zuhdi Jasser (2006), "The Synergy of Libertarianism and Islam", Vital Speeches of the Day, 6 May 2006, (An address by M. Zuhdi Jasser, Chairman of the American Islamic Forum for Democracy, Delivered to the Economics Discussion Group of Phoenix, Phoenix, Arizona, October 19, 2005) , Ameriacan Islamic Forum for Democracy: http://www.aifdemocracy.org/news.php?id=2253 (accessed on 24 October 2011)

ম্যাক্স ক্যাফার্ড ২০০৬

Max Cafard (2006), "Zen Anarchy", Retrieved on August 14, 2009 from raforum.info, The Anarchist Library, http://theanarchistlibrary.org/library/max-cafard-zen-anarchy (accessed on 15 January 2013).

ম্যাক্সিমফ ০০০০

G.P. Maximoff. *Syndicalists in the Russian Revolution*. Direct Action Pamphlets No. 11. London: Syndicalist Workers' Federation. এই পুস্তিকাটির আদি সংস্করণের গায়ে কোনো তারিখ ছিল না।

ম্যাক্সিমফ ১৯৩৫

G. Maximov. *Bolshevism: Promises and Reality* (An Appraisal of the Results of the Marxist Dictatorship over Russia). Published By: The Free Society Group of Chicago. http://www.marxists.org/archive/luxemburg/1904/questions-rsd/index.htm.

ম্যাক্সিমফ ১৯৪০

G.P. Maximoff. *The Guillotine at Work: Twenty Years of Terror in Russia*. Chicago: Alexander Berkman Fund. http://flag.blackened.net/revolt/russia/cp/maximof_terror1940.html.

রজার হোয়াইট ২০০৪

Roger White (2004). *Post Colonial Anarchism: Essays on race, repression and culture in communities of color 1999-2004*. Oakland California: Jailbreak Press.

রবার্ট ইয়োহানসেন ১৯৯৭

Robert C. Johansen (1997), "Radical Islam and Nonviolence: A Case Study of Religious Empowerment and Constraint among Pashtuns," *Journal of Peace Research*, Vol. 34 No.1, pp. 53-71.

রবার্ট গ্রাহাম ২০০৫

Robert Graham (2005). Anarchism: A Documentary History of Libertarian Ideas. Vol. 1. From Anarchy to Anarchism (300 CE To 1939). Montreal/New York/london: Black Rose Books.

রবি চক্রবর্তী ২০০২

Ravi Chakravarti (2002). *India Rediscovered*. Kolkata.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৬

১৯১৬ সালে প্রকাশিত *বলাকা* কাব্যগ্রন্থের ৩৭ নম্বর কবিতা। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। রবীন্দ্র-রচনাবলীর বৈদ্যুতিন সংস্করণ। পশ্চিবঙ্গ সরকারের তথ্য ও প্রযুক্তি বিভাগ প্রতিষ্ঠিত ভাষা প্রযুক্তি ও গবেষণা পরিষদ কর্তৃক নির্মিত ওয়েবসাইট। ©2009 SNLTR (Society for Natural Language Technology Research). অনলাইন-হদিস: http://www.rabindra-rachanabali.nltr.org/node/12424 (accessed on 2 December 2012)।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৮

Rabindranath Tagore, *Das Postamt* [*The Post Office*]. With Hedwig Lachmann. Leipzig: Kurt Wolff, 1918.

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৮

Rabindranath Tagore, *Der König der dunklen Kammer [The King of the* *ark Chamber*]. With Hedwig Lachmann. Leipzig: Kurt Wolff, 191 .

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৪০২ বঙ্গাব্দ

রাশিয়ার চিঠি। *রবীন্দ্র-রচনাবলী*। ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ। ১০ম খণ্ড। কলিকাতা: বিশ্বভারতী।

রমেন্দ্র নাথ ২০১১

Ramendra Nath, "M. N. Roy (1887-1954)", Internet Encyclopedia of Philosophy (IEP): A peer-reviewed academic resource, http://www.iep.utm. edu/roy_mn/, Originally published: April 22, 2011.

রাজমোহন গান্ধী ২০০৪

Rajmohan Gandhi (2004), *Ghaffar Khan: Nonviolent Badshah of the Pakhtuns*. London: Penguin.

রোজা লুক্সেমবার্গ ১৯০৪

Rosa Luxemburg. "Organizational Questions of the Russian Social Democracy" (Different Title: "Leninism or Marxism?"), Written: 1904, First Published: 1904 in Iskra and Neue Zeit, Source: Revolutionary Socialist Organization by Rosa Luxemburg, Publisher: Integer Press, 1934, Online Version: marxists.org, 1999, Transcription/Markup: A. Lehrer/Brian Basgen, http://infomo tions.com/etexts/gutenberg/dirs/1/7/3/5/17350/17350.htm.

লেনিন ১৯১৯

V. I. Lenin (1919), "Greetings To Italian, French and German Communists", Written: 10 October, 1919; First Published in October 1919; Published according to the manuscript; Source: Lenin's Collected Works, 4th English Edition, Progress Publishers, Moscow, 1965, Volume 30, pages 52-62; Translated: George Hanna; Transcription/HTML Markup: David Walters & Robert Cymbala; Copyleft: V. I. Lenin Internet Archive (www.marx.org) 2002.

শহীদ ইকবাল ২০১১

নয়নে তোমার বিশ্বছবি: শহীদ হবিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ। ১৪ই ডিসেম্বর। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়: শহীদ হবিবুর রহমান হল। এই গ্রন্থটি শিশিরকুমার ভট্টাচার্য কর্তৃক সম্পাদিত, ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত, *শহীদ হবিবুর রহমান স্মারকগ্রন্থ* এর 'পরিমার্জিত

ও পরিবর্ধিত সংস্করণ'।

শিবনারায়ন রায় (সম্পা.) ১৯৯৫

Shibnarayan Ray (ed). *M. N. Roy: Phisopher-Revolutionary*. Delhi: Ajanta Publications.

শিবপুরাণ ১৪১২ বঙ্গাব্দ

ভগবান বেদব্যাস প্রণীত বৃহৎ শিবপুরাণ। অখণ্ড সংস্করণ। পণ্ডিত-প্রবর শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিদ্যারত্ন কর্তৃক পদ্যচ্ছন্দে অনুবাদিত। কলকাতা: তারা লাইব্রেরী।

শামসুজ্জোহা মানিক এবং শামসুল আলম চঞ্চল ২০০৩

আর্যজন ও সিন্ধুসভ্যতা। ঢাকা: বদ্বীপ প্রকাশন।

সুধীন দত্ত ১১৯৭

সুধীন দত্তের কাব্যসংগ্রহ। প্রথম প্রকাশ: ১৯৬২। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

সেলিনা জেসমিন, ২০০৯

আজ আমাদের ছুটি: রবীন্দ্র-রচনার কিশোর সঞ্চয়ন। সংকলন ও সম্পাদনা ড. সেলিনা জেসমিন। ভূমিকা: মোর্শেদ শফিউল হাসান। বাংলাবাজার, ঢাকা: শোভা প্রকাশ।

সেলিম ২০০৪

Salim (2004), "Toward an Anti-Authoritarian Islam (Natural Islam)", *Infoshop News*, Sorel Prison, Quebec, September 2004, Online: http://news.infoshop.org/article.php?story=04/12/22/53 21600 (accessed on 4 April 2012).

সেলিম রেজা নিউটন ২০০২

চিররঞ্জন পাল এবং রাজেশ দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত *যুদ্ধ ইসলাম প্রতিরোধ* (কোলকাতা: র‍্যাডিক্যাল, ২০০৪) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধ "পশ্চিমা প্রচারণামাধ্যমে মুসলমানের মুখ: শ্বেতাঙ্গ-খ্রিস্টান-সমাজে 'সংখ্যালঘু' অপর-এর সামাজিক পরিচয় তৈয়ার করার কায়দাকানুন", পৃষ্ঠা ১২৬-১৪৭।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৩-ক

"মানুষ-এর কথা: প্রতিরোধ মহাপ্রভু স্বয়ং", সেলিম রেজা নিউটন কর্তৃক সম্পাদিত *মানুষ*, পৃষ্ঠা ix–x, ঢাকা: সমাবেশ।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৩-খ

"বাজারের যুগে সাহিত্য ও সাংবাদিকতার আম্মু-আব্বু-সমাচার অথবা বাংলাদেশে

বিদ্যমান মহাজনী মুদ্রণের পলিটিক্যাল ইকোনমি", কামরুল হাসান মঞ্জু কর্তৃক সম্পাদিত *জনপরিসরে গণমাধ্যম ও অন্যান্য প্রসঙ্গ* গ্রন্থে মুদ্রিত, পৃষ্ঠা ৪৬৭–৫১২, ঢাকা: ম্যাস্-লাইন মিডিয়া সেন্টার।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৪

"বাদশাহী বিশ্ববিদ্যালয়", *প্রথম আলো* (শুক্রবারের সাময়িকী), সম্ভবত নভেম্বর কি ডিসেম্বর মাসের কোনো একটা শুক্রবারের সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতাটা, হাতের কাছে পত্রিকাটা পাচ্ছি না বলে আপাতত তারিখটা জোগাড় করা গেল না।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৬

"নৈরাজ্যের বাংলা প্রতিশব্দ প্রসঙ্গে: খসড়া খাতা থেকে একটি নোট", ফেসবুক নোট, বুধবার ১৬ই জানুয়ারি ২০১৩ দুপুর ১২:০৮, https://www.facebook.com/notes/salim-reza-newton/নৈরাজ্যের-বাংলা-প্রতিশব্দ-প্রসঙ্গে/10151263769487912।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৭-ক

বাংলাদেশ কর্তৃত্ব রাষ্ট্র স্বাধীনতা গ্রন্থের প্রকাশিতব্য পাণ্ডুলিপি। ২০০৭ সালের মে মাসে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পত্রিকা *অভীপসা*-র কর্মী-সম্পাদকদের ১১ ঘন্টার রেকর্ডকৃত কথোপকথনের অনুলিপির ভিত্তিতে এই পাণ্ডুলিপিটি তৈরী করা হয়েছে। পাণ্ডুলিপিটি এখনও সার্বিক পরিমার্জনা ও নানাবিধ কারিগরি কাজের অপেক্ষায় রয়েছে।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৭-খ

"পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কার: প্রসঙ্গ শিক্ষক ও ছাত্র রাজনীতি", *যোগাযোগ*, সংখ্যা ১০, জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা: ৯–৬৪, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। আদতে এটি ছিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে 'মানুষ নেটওয়ার্ক' আয়োজিত একটি সেমিনারের অডিও-অনুলিপি। সেমিনারটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল রাবি-কর্তৃপক্ষের অনুমতি ব্যতিরেকেই, তখনও টাটকা ও মহান 'জরুরি আইন' লঙ্ঘন করে, ২০০৭ সালের ২০শে মে, গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের ১২৩ নং কক্ষে।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৮

সেলিম রেজা নিউটনের কলাম: সাত, "অক্টোবর-মহাসংকট: মাৎস্যন্যায়-পর্ব", *ইউকেবেঙ্গলি*, http://www.ukbengali.com/Columns/Col-2008/Col-0806/Col-080613-Selim-Reza-Newton-on-October-Crisis-Bangladesh.htm (accessed on 6 December 20012)

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৯-ক

"মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট: কর্তৃত্বপরায়ন সমাজতন্ত্রের প্রচ্ছন্ন রূপকল্প", *সমবীক্ষণ*, ২১

ফেব্রুয়ারি ২০০৯, চট্টগ্রাম: সমাজ সমীক্ষা সঙ্ঘ।

সেলিম রেজা নিউটন ২০০৯-খ
"বাংলাদেশে ইউরো-মার্কিন নৈরাজ্যবাদের প্রাসঙ্গিকতা", ফেসবুক-নোট, সোমবার, ১১ই মে, রাত ৮:১৬, https://www.facebook.com/note.php?note_id=75487567911।

সেলিম রেজা নিউটন ২০১০
বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়। ঢাকা: যেহেতু বর্ষা।

সেলিম রেজা নিউটন ২০১১-ক
"আড়িয়াল বিল, প্রত্যক্ষ তৎপরতা, অরাজপন্থা এবং একুশে ফেব্রুয়ারি", ফেসবুক-নোট, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, সকাল ৯:৩০, https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150095377627912।

সেলিম রেজা নিউটন ২০১১-খ
Salim Reza Newton (2011), "Breaking News: On Anarchy and Anarchism", Facebook Note, Wednesday, July 27, 2011 at 5:28 pm, https://www.facebook.com/notes/salim-reza-newton/breaking-news-on-anarchy-an d-anarchism/10150251242612912.

সেলিম রেজা নিউটন ২০১১-গ
Salim Reza Newton (2011), "A Note on Sumon Rahman's Query on My "Breaking News: On Anarchy and Anarchism"", Facebook Note, Wednesday, July 27, 2011 at 9:19 pm, https://www. facebook.com/notes/salim-reza-newton/a-note-on-sumon-rahmans-query-on-my-breaking-news-on-anarchy-and-anarchism/10150251371782912.

সেলিম রেজা নিউটন ২০১১-ঘ
Salim Reza Newton (2011), "A Third Note on "On Anarchy and Anarchism" (to Answer Sumon Rahman's Queries)", Facebook Note, Saturday, July 30, 2011 at 10:29 pm, https://www.facebook.com/notes/salim-reza-newton/a-third-note-on-on-anarchy-and-anarchism-to-answer-sumon-rahmans-queries/10150253838132912.

সেলিম রেজা নিউটন ২০১১-ঙ
"নৈরাজ্য, নীতিবোধ, রাজনীতি", ফেসবুক-নোট, মঙ্গলবার, ৮ই নভেম্বর, বেলা ১১:৪৯, https://www.facebook.com/note.php?note_id=10150363504172912।

স্বামী সত্যানন্দ সরস্বতী ০০০০

Swami Satyananda Saraswati (0000). *Kundalini Tantra*. Online: http:// www.eng.vedanta.ru/library/kundalini_tantra/contents.php. The date of publication or the publisher was not found in this 409 (A4 sized) pages book.

স্যার জন উড্রোফে ১৯১৩

Sir John Woodroffe (1913). *Introduction to Tantra Śāstra*. Celephaïs Press Ulthar – Sarkomand – Inquanok – Leeds. This edition published in 2008. Originally published as the Introduction to *Mahānirvāṇa Tantra* (Tantra of the Great Liberation), 1913. First issued as an independent work, Madras: Ganesh & co., 1952. Many later printings. This electronic text produced by Celephaïs Press, Leeds, in the year 2008.

স্যার শঙ্করন নায়ার ১৯২২

Sir C. Shankaran Nair (1922). *Gandhi and Anarchy*. 2nd edition. Madras: Tagore & Co.

হরিচরণ ১৯৯৬-ক

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। প্রথম খণ্ড। চতুর্থ মুদ্রণ। দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি।

হরিচরণ ১৯৯৬-খ

হরিচরণ বন্দোপাধ্যায়। *বঙ্গীয় শব্দকোষ*। দ্বিতীয় খণ্ড। চতুর্থ মুদ্রণ। দিল্লী: সাহিত্য অকাদেমি।

হাকিম বে ১৯৯৭

Hakim Bey (1997), "Islam and Eugenics", from *The Hermetic Library*. Online: http://hermetic.com/bey/islamandeugenics.html (accessed on 12th December 2012).

হাকিম বে ২০০৪

Hakim Bey (2004), "Jihad Revisted", *16 Beaver Articles*, http://www.16beavergroup.org/mtarchive/archives/001033.php. The article was posted on 6 August 2004. (Accessed on 18th December 2012).

হাকিম বে ২০০৬

Hakim Bey (2006), *Hakim Bey and Ontological Anarchy*. From *The Hermetic Library* (Created in 2006). Online: http://hermetic.com/

bey/index.html (accessed on 12th December 2012).

হাগ বি. আরবান ২০০১

Hugh B. Urban (2001). *The Economics of Ecstasy: Tantra, Secrecy, and Power in Colonial Bengal.* Oxford University Press.

হাগ বি. আরবান ২০০৩

Hugh B. Urban (2003). *Tantra: Sex, Secrecy, Politics, and Power in the Study of Religion.* Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press.

হাসান মাহমুদ ০০০০

হাসান মাহমুদ (ডিরেক্টর, শরিয়া অ্যান্ড ইসলামিক ল, মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেস), "ইসলাম ধর্মে শরিয়া রাষ্ট্রের ধারণা নেই", দৈনিক *সমকাল*, 'ইসলাম ও সমাজ' পাতা, (তারিখটি আপাতত উল্লেখ করা গেল না, পত্রিকাটা হাতের কাছে না পাওয়ায়, পরে নিশ্চয়ই পাওয়া যাবে), ঢাকা।

হাসান মাহমুদ ২০০৭

হাসান মাহমুদ (ডিরেক্টর, শরিয়া অ্যান্ড ইসলামিক ল, মুসলিম কানাডিয়ান কংগ্রেস)। *শারিয়া কি বলে, আমরা কি করি*। (*ইসলাম ও শারিয়া* গ্রন্থের নতুন সংস্করণ।) বর্ণ বিন্যাস : এ. এস. মণ্ডল, টরন্টো, অন্টারিও, ক্যানাডা। ওয়েবসাইট: http://www.BanglarIslam.com। যোগাযোগ: hasan.mahmud@hotmail.com।

হুডল্ফ হকার ১৯২০

Rudolf Rocker, "The Soviet System or the Dictatorship of the Proletariat", http://flag.blackened.net/rocker/soviet.htm. The original article "Le systeme des soviets ou la dictature du proletariat?" appeared in *Les anarchistes Russes, les soviets et l'autogestion*, translated and edited by Alexandre Skirda. This article apparently appeared first in the *Freie Arbeiter Stimme* in 1920 (www.anarchosyndicalism.net/rocker/biblio.htm).

হুডল্ফ হকার ১৯৩৮

Rudolf Rocker. *Anarcho-Syndicalism*. London: Martin Secker and Warburg Ltd. www.spunk.org/library/writers/rocker/sp001495/rocker_as1.html.

হুডল্ফ হকার ২০১১

"নৈরাজ্যবাদ: এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য", হকারের *অ্যানার্কোসিন্ডিক্যালিজম* গ্রন্থের প্রথম

অধ্যায়ের অনুবাদ, তরজমা: সেলিম রেজা নিউটন, *বাউণ্ডুলে* (রাসেল মাহমুদ সম্পাদিত), খুলনা, ফেব্রুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা ৪৭-৬৩। (এই অনুবাদ করার সময় পর্যন্ত 'গুগল ট্রান্সলেট' এর আমার দেখা হয় নি বলে 'হুডল্ফ হকার' এর নামের উচ্চারণ করেছিলাম 'রুডল্ফ রকার'।)

হোমবল্ট ১৭৯২

Wilhelm von Humboldt (1792). *The Sphere and Duties of Government* (*The Limits of State Action*). Translated from the German of Baron Wilhelm von Humboldt by Joseph Coulthard. London: John Chapman, 1854.

মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা
অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ প্রসঙ্গে

আমরা যাঁরা ২০০৩ সালে 'মানুষ' পত্রিকা বের করেছিলাম, তাঁরা এবার 'মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা' হিসেবে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। সারা বছর ধরে আমরা এই গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত একটি সিরিজের অংশ হিসেবে বেশ কয়েকটি বই প্রস্তুত করব। এ ছাড়া পরে অন্যান্য সিরিজের বইও করা হবে। নানা কারণে 'মানুষ' পত্রিকা আকারে আমরা আর কাজ করছি না।

'অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ' এর যে কয়েকটা বই এবার আমাদের 'মানুষ নেটওয়ার্ক' এর তরফ থেকে করার পরিকল্পনা আছে বর্তমান গ্রন্থটি সেই সিরিজের প্রথম গ্রন্থ। আপাতত অন্য যেসব বই এই সিরিজের অন্তর্ভুক্ত থাকছে যেগুলো হচ্ছে: সেলিম রেজা নিউটন: *বিদ্রোহের সপ্তস্বর: বিডিআর থেকে বিশ্ববিদ্যালয়* (মার্কিন দূতাবাসের উইকিলিকস-তারবার্তা, সরকারী-বেসরকারী তদন্ত-রিপোর্ট, হিউম্যান রাইটস ওয়াচের রিপোর্টসহ আরো নানান পরিশিষ্ট সংযুক্ত পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত ২য় সংস্করণ); জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জ: *সাইফারপাঙ্কস: সমাজ স্বাধীনতা ইন্টারনেট* (অনুবাদ ও সম্পাদনা: সেলিম রেজা নিউটন); নোম চমস্কি: অকুপাই (অনুবাদ: বদরে মুনীর); ডেভিড গ্রেইবার: *অকুপাই ও অ্যানার্কি* (সম্পাদনা: বখতিয়ার আহমেদ); অরুন্ধতী রায়: *অকুপাই ওয়াল স্ট্রিট* (অনুবাদ ও সম্পাদনা: সুস্মিতা চক্রবর্তী); এবং সেলিম রেজা নিউটন: *নৈরাজ্য-সংহিতা*। পরে আমরা আরো বিভিন্ন বইও করব অন্যান্য সিরিজের অংশ হিসেবে কিংবা স্বতন্ত্র বই হিসেবে।

বর্তমান বইটির দিকে তাকালে বোঝা যাবে এ বইটি 'অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি সিরিজ' এর 'অ্যানার্কি' অংশের বই। এ বই এক অর্থে 'অকুপাই' সংক্রান্তও বটে: কীভাবে ইতিহাসের ধ্যানধারণাগুলোকে অকুপাই করা যেতে পারে তার একটি নমুনা এ বই। এ বই অ্যানার্কি বিষয়ক কোনো 'সঠিক' গ্রন্থ নয়। এ বইয়ে অ্যানার্কি সম্পর্কে বিশেষ একটি দৃষ্টিভঙ্গি উঠে এসেছে। অ্যানার্কিকে আরো হাজারো নামে ও প্রকারে অবলোকন করা সম্ভব।

সিরিজের সবগুলো বইয়ের মধ্যে সিরিজ-সাজুয্য বজায় রাখার প্রলোভনে সবগুলো বইয়ের মলাটের মূল বিন্যাসটি মোটের ওপর একই রকম রাখতে চেয়েছি। শুধু বইগুলোর নাম-ধাম বদলাবে আর মলাটের মূল ছবিটি বদলে যাবে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে মলাটের সব মূল ছবির মধ্যেও সাযুজ্য বজায় রাখতে চেয়েছি। এ কাজে বেছে নিয়েছি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিও-এক্সপ্রেশনিস্ট/প্রিমিটিভিস্ট ধারার উজ্জ্বলতম শিল্পী জন-মিশেল বাসকিয়াতকে তাঁর ব্যক্তিবোধ, স্বাধীনতাস্পৃহা, যৌথশিল্প, সমাজ-সমালোচনা এবং আদিমতার উত্তুঙ্গ রূপে তন্ময় হয়ে গিয়ে। বর্তমান গ্রন্থের মলাটে বাসকিয়াতের যে ছবিটি আছে, সেটি হচ্ছে তাঁর 'লা অ্যানিমালাদা' (www.artexpertswebsite.com/pages /artists/basquiat.php)।

এই সিরিজভুক্ত অন্যসব বইতেও বাসকিয়াতেরই অন্য কিছু চিত্রকর্ম ব্যবহৃত হবে। সে কারণে এখানে বাসকিয়াত সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করতে আমরা আগ্রহীএ (বাসকিয়াত সংক্রান্ত এই আলোচনার পুরোটাই প্রায় নেওয়া হয়েছে উইকিপিডিয়া এবং

artexpertswebsite.com থেকে।)। জন-মিশেল বাস্‌কিয়াতের জন্ম মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক শহরের ব্রুকলিনে ১৯৬০ সালের ২২শে ডিসেম্বরে। মারা গেছেন তিনি ১৯৮৮ সালের ১২ই আগস্ট ঐ শহরেরই ম্যানহাটানে, মাত্র ২৭ বছর বয়সে— এবং তার আগেই রীতিমতো কিংবদন্তীতে পরিণত হয়েছিলেন তিনি তাঁর জীবনযাপন, এবং শিল্পকর্মের জন্য। কৃষ্ণাঙ্গ এই চিত্রকরের মা ছিলেন পুয়েরতো রিকো'র মানুষ। আর বাবা হাইতি'র— তিনি সেখানকার ইন্টেরিওর-মিনিস্টারও ছিলেন। আমি নিশ্চিত নই, ইংরেজভাষীরা তাঁকে সম্ভবত, 'গুগল ট্রান্সলেট' এর অডিও-উচ্চারণ অনুযায়ী, 'বাস্আঁসকিউট' হিসেবে ডাকেন। আমি এ-ও জানি না, খোঁজ নেওয়ার সুযোগ এখনও পাই নি, তাঁর নিজের ভাষা কী ছিল। জন্মসূত্রে এবং জীবনযাপনসূত্রে মার্কিনী যেহেতু, ইংরেজি তো বলতেনই নিশ্চয়, সাথে খেয়াল করতে হয় যে পুয়েরতো রিকোর ভাষা স্প্যানিশ, আর হাইতির ভাষা স্প্যানিশ ও ফ্রেঞ্চ। 'গুগল ট্রান্সলেট' অনুযায়ী তাঁর নামের স্প্যানিশ ও ফরাসি উভয় উচ্চারণই 'বাস্‌কিয়াত'। এই উচ্চারণটাই আমি গ্রহণ করেছি এই আন্দাজ থেকে যে পরিবারে তিনি নিশ্চয় এই আওয়াজেই উচ্চারিত হতেন।

পেইন্টিং তো করতেনই বাস্‌কিয়াত। সেই কোন ছোট বেলাতেই আর্টের প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতা দেখে উৎসাহ দিতেন মা। আর তিনি তার বাল্য-কৈশোর-তারুণ্য ভ'রে ম্যানহাটানের শহরতলিতে বস্তির রঙচটা সব দালানে দালানে আঁকতেন 'স্প্রে-পেইন্টিং গ্রাফিতি'— কখনো একা, কখনো বন্ধু আল দায়াজের সাথে মিলে, যৌথভাবে। এ ছাড়া কবিতা লিখতেন, গান বানাতেন, অডিও-ভিজুয়াল কিছু কাজও করেছেন। গ্রাজুয়েট হওয়ার আগের বছর স্কুল ছেড়ে ও বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে পড়েন বাস্‌কিয়াত, ১৭-১৮ বছর বয়সে, ১৯৭৮-এর দিকে। শহরতলি ছেড়ে প্রবেশ করেন নিউ ইয়র্ক শহরে। জীবিকা নির্বাহ করতে শুরু করেন শহরের রাস্তায় রাস্তায় বন্ধুদের সাথে পোস্টকার্ড আর টি-শার্ট বেচে বেচে। বছর খানেকের মধ্যেই সুযোগ পেতে থাকেন লাইভ কেবল-শো আর টিভি-পার্টিগুলোতে। বানান গানের দল 'গ্রে'। ক্লাবে ক্লাবে গান গাইতে থাকে তাঁর ব্যান্ড। অভিনয় করেন 'ডাউনটাউন একাশি' ওরফে 'নিউ ইয়র্ক বিট মুভি' নামের সিনেমায়। সেই সিনেমার সাউন্ডট্র্যাকে বাজানো হয় তাঁরই দলের গান। 'র‍্যাপচার' নামের একটা ভিডিওতেও কাজ করেন এই সময়।

বাস্‌কিয়াতের চিত্রশিল্পের স্বাতন্ত্র্য ছিল খুবই স্পষ্ট। ব্যক্তির একান্ত গভীর বোধের সমাজ-সমালোচনামূলক ভাষা রচনা করতেন তিনি। পেইন্টিঙের সাথে ব্যবহার করতেন টেক্সট, ঐতিহাসিক তথ্য, আর গ্রাফিক্স। বিমূর্ত ইমেজের সাথে জুড়ে দিতেন ফিগারেটিভ অভিপ্রকাশ। রাগী এই ছেলের আক্রমণের লক্ষ্য ছিল ক্ষমতাকাঠামো আর বর্ণবিদ্বেষের পচে যাওয়া সিস্টেম। আর তাঁর কবিতা ছিল প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক— উপনিবেশের সমালোচনা আর শ্রেণীসংগ্রামের প্রতি সমর্থনে ভরা। গ্রাফিতি বা দেওয়ালচিত্র এঁকেই তিনি জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। এবং সেটা সত্তরের দশক ফুরানোর আগেই। আর তারপর আশির দশকে তো তিনি সুবিখ্যাত পেইন্টার।

বৃহত্তর পরিসরে আর্টিস্ট হিসেবে প্রথম নাম কামান ১৯৮১ সালে, 'দ্য টাইম স্কয়ার শো' নামের এক বহু-শিল্পী-সমবায়ে আয়োজিত চিত্র-প্রদর্শনীতে অংশ নিয়ে। ১৯৮১-তেই *আর্টফোরাম* ম্যাগাজিনে তাঁকে নিয়ে 'দ্য র‍্যাডিয়ান্ট চাইল্ড' নামে লেখা প্রকাশ করেন বিখ্যাত কবি, চিত্র-সমালোচক এবং সংস্কৃতি-কর্মী রেনে রিকার্ড। বাস্‌কিয়াত উঠে আসেন চিত্রশিল্পের আন্তর্জাতিক দৃশ্যপটে। পরের বছরগুলোতে নিউ ইয়র্কে এবং অন্যান্য দেশে

নানান চিত্র-প্রদর্শনীতে তাঁর ছবি অংশ নিতে থাকে অন্যসব বিখ্যাত শিল্পীদের আঁকা ছবির সাথে। বিখ্যাত গ্যালারিগুলোতেও ঠাঁই পায় তাঁর চিত্রকর্ম। অচিরেই, ১৯৮২ থেকেই, আরো সব শিল্পীর সাথে মিলে গড়ে ওঠে তাঁর চিত্র-আন্দোলন, 'নয়া-অভিপ্রকাশবাদ'। ১৯৮৪ সাল থেকেই বাস্কিয়াতের বন্ধুরা বিচলিত হয়ে পড়েন তাঁর অতিরিক্ত মাদক-ব্যবহারের কারণে। প্যারানয়া'র লক্ষণ দেখা দিতে থাকে তাঁর আচার-আচরণে। ক্রমবর্ধমান হারে হেরোইনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। নিউ ইয়র্কের আন্ডারগ্রাউন্ডে আরো সব পথশিল্পীদের সাথে একত্রে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন তিনি এসবে। ১৯৮৫ সালের ১০ই ফেব্রুয়ারির *নিউ ইয়র্ক টাইমস* ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে আবির্ভূত হন বাস্কিয়াত। তাঁকে নিয়ে তাতে লেখা ফিচারের নাম ছিল "নিউ আর্ট, নিউ মানি: দ্য মার্কেটিং অফ অ্যান অ্যামেরিকান আর্ট"। তাঁর আন্তর্জাতিক সফলতা উন্নীত হতে থাকে আরো উঁচুতে। ইউরোপের প্রধান প্রধান সব রাজধানী-শহরে অনুষ্ঠিত হতে থাকে তাঁর একক চিত্র-প্রদর্শনী। ১৯৮৮ সালের আগস্টে তিনি তাঁর নিজের স্টুডিওতে মারা যান হেরোইন আর কোকেনের সংমিশ্রণে বানানো 'স্পিডবলিং' নামে পরিচিত এক মাদকের বিষাক্ত ছোবলে। মৃত্যুর পর তাঁর জীবন নিয়ে *বাস্কিয়াত* নামের সিনেমা বানান জুলিয়ান শ্ন্যাবেল।

বাস্কিয়াতের আর্ট-ক্যারিয়ারকে তিনটা মোটা দাগের স্টাইল দিয়ে চিহ্নিত করা চলে। আদি-পর্বে, ১৯৮০ থেকে ১৯৮২ সময়পর্বে, তিনি ক্যানভাসে পেইন্টিং-জাতীয় ইঙ্গিত দিতে শুরু করেন। প্রায়শই আঁকতে থাকেন কঙ্কাল ধরনের ফিগার এবং মুখোশ-টাইপের সব মুখচ্ছবি। ঘুরেফিরে উঠে আসে গাড়ি, দালান, পুলিশ, রাস্তার পাশে বাচ্চাদের খেলাধুলা, গ্রাফিতি প্রভৃতি রূপকল্প। মধ্য-পর্বে, ১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সময়কালে, মাল্টি-প্যানেল পেইন্টিং আর একক ক্যানভাসে তিনি চিত্রায়িত করতে থাকেন নানা ধরনের স্ট্রেচার-বার— উপরিতল ঘন হয়ে ওঠে আঁকিবুকি সব লেখায়-অক্ষরে-কোলাজে আর আপাত-অসংলগ্ন যত রূপকল্প দিয়ে। এই কাজগুলোতে প্রবলভাবে প্রকাশিত হয় তাঁর কৃষ্ণাঙ্গ পরিচয়। নিজেকে তিনি মিলিয়ে দিতে থাকেন ঐতিহাসিক ও সমকালীন আর-সব কৃষ্ণাঙ্গ ব্যক্তিত্ব ও ঘটনাক্রমের সাথে। চূড়ান্ত পর্বে, ১৯৮৬ থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত সময়ে, তিনি হাজির করতে থাকেন নতুন এক ধরনের ফিগারেটিভ চিত্রায়ন— বিভিন্ন ধরনের নতুন সব উৎস থেকে আহরিত নানা রকম প্রতীক ও বিষয়বস্তু দিয়ে গড়া নতুন একটা স্টাইলে। তাঁর এই পর্বের কাজ তাঁর গুণমুগ্ধ শিল্পীদের কাজের ওপর বিপুল প্রভাব ফেলে। ১৯৯৮ সালে বাস্কিয়াতের মূল একটা ছবি সর্বোচ্চ প্রায় সাড়ে তিন মিলিয়ন ডলারে বিক্রি হয়েছে। ২০০২ সালে হেভি-মেটাল ব্যান্ড 'মেটালিকা'র মালিকানায় থাকা তাঁর 'প্রফিট ১' ছবিটি বিক্রি হয় সাড়ে পাঁচ মিলিয়ন ডলারে। ২০০৭ সালে তাঁর শিরোনামহীন একটি চিত্রকর্ম বিক্রি হয় সাড়ে চৌদ্দ মিলিয়ন ডলারে।

রূপকথার মতো শিল্পজীবনের অধিকারী এই জন-মিশেল বাসকিয়াতকে কীভাবে আমরা 'অকুপাই-উইকিলিকস-অ্যানার্কি'র সাথে মেলাতে পেরেছি তা এতক্ষণে অনুপলব্ধ থাকার কথা হয়ত না।

'মানুষ নেটওয়ার্ক গ্রন্থমালা' সম্পর্কে পাঠকের পরামর্শ/সমালোচনা আমাদের কাজে আসবে। এ কাজে ব্যবহার্য ইমেইল-ঠিকানা: manooshnetwork@gmail.com।